প্রতিরক্ষা বিদ্যা

তৃতীয় পত্র



প্রিয়দর্শন সেনশর্মা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

প্রতিরক্ষা বিদ্যা

(তৃতীয় পত্র ঃ ব্যবহারিক)

সামরিক ভূগোল, সামরিক ইতিহাস
এবং কয়েকটি অস্ত্র ও অস্ত্রবাহক

COMPLIMENTARY

প্রিয়দর্শন সেনশর্মা
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

PRATIRAKSHA BIDYA

[Defence Study—III paper]

Priyadarsan Sensarma

প্রকাশকাল : মে, ১৯৯০/বি

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যান্‌সন্‌, নবম তল

৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানোদয় প্রেস

৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি

কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

চিত্র এবং প্রচ্ছদ :

দুর্গা রায়

মূল্য : ত্রিশ টাকা

Published by Sri Sibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

স্বর্গীয়া মাতৃদেবী

৺অমিয়াদেবীর

স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য

মুখবন্ধ

দেরীতে হলেও 'প্রতিরক্ষা বিদ্যা—তৃতীয় পত্র'টি প্রকাশিত হওয়াতে প্রতিরক্ষা বিদ্যার ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভাব মিটবে। যদিও বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুসারে লেখা হয়েছে, আশা রাখি প্রতিরক্ষা বিষয়ে আগ্রহী সাধারণ নাগরিকদেরও অনেক কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে এই ছোট্ট গ্রন্থটি। কয়েকটি অতি পরিচিত হাতিয়ার, কয়েক প্রকারের ট্যাংক, বিমান এবং ডুবোজাহাজ সম্পর্কে কিছু কারিগরী তথ্য এই বইটিতে দেওয়া হয়েছে। কারিগরী উপাত্ত সুখপাঠ্য বা সকলের কাছে সহজবোধ্য নয়, কিন্তু বিষয়গুলো বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সব কথা মনে রেখে বেশ কিছু সহায়ক, প্রামাণ্য অথচ সহজ ছবি সংযোজিত হয়েছে। সম্ভাব্য-ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বর্ণনার সঙ্গেই ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ছবি অনিবার্যকারণে বইটির শেষ অংশে দিতে হয়েছে ; এতে অবশ্য পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রসঙ্গত নিবেদন করা প্রয়োজন যে, এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় এখন পর্যন্ত বিশেষ গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই প্রথম পর্যায়ের পদক্ষেপে যেমন গৌরব আছে, তেমনি লেখককে অনেক অসুবিধারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয় কারিগরী শব্দ ও পদগুলো নিয়ে। অস্ত্র-শস্ত্র বা অস্ত্রবাহকগুলো কোন একটি বিশেষ দেশ বা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এগুলোর চরিত্র আন্তর্জাতিক। ভারতে এইসব সম্বন্ধে আলোচনা হয় অন্যতম (হয়ত প্রধানতম) আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজিতে। ভারতের প্রতিরক্ষামহলে ঐ সব টেকনিক্যাল শব্দ ও পদগুলো ইংরাজি নামেই মোটামুটি প্রচলিত ; অবশ্য কিছু কিছু হিন্দী পরিভাষাও চালু হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে ইংরাজি শব্দগুলো রাখা হয়েছে—অবশ্যই লেখা হয়েছে বাংলা বর্ণে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দের সঙ্গে ইংরাজি শব্দটিও রাখা হয়েছে। বিবেচনা করি এতে পাঠকদের সুবিধা হবে।

এই গ্রন্থটির বক্তব্য সুচারু এবং নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন সুহৃদপ্রবর অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয়। বর্তমান যুগের

সদাব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে সময় বের করে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন তিনি ; —এমন কি কয়েকটি ছবির নক্সাও তিনি এঁকে দিয়েছেন। যে শুভার্থী আন্তরিক আগ্রহে এত পরিশ্রম করেছেন তাঁকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ধন্যবাদ জানাতে সঙ্কোচ বোধ করছি। তবে এই কথা অকপটে স্বীকার করছি যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে এবং কিছু কিছু মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীচন্দ্রমোহন মুখার্জি ; আমার সকল কাজে সাহায্য করেন শ্রীমতী ইরা দেবী, এবং কল্যাণীয়া সুশ্রীমা ও সুস্মিতা —আমি তাদের ঋণও স্বীকার করছি। বইটি ছাত্র ছাত্রীদের চাহিদা মেটাতে পারলেই অবশ্য সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে।

বইটির প্রকাশন এবং মুদ্রণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, অন্যান্য কর্মীবৃন্দ বিশেষতঃ ঐ সংগঠনের প্রোডাকসন অফিসার শ্রীঅশোক এ্যন্টনি বিশ্বাস মহাশয়, এবং জ্ঞানোদয় প্রেস দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। কেবল-মাত্র পদাধিকারজনিত কর্তব্য করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বইটিকে সুন্দর করার জন্য আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। চিত্রশিল্পী শ্রীদুর্গা রায় ছবিগুলোকে সহজ ও পরিষ্কারভাবে এঁকে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

২৫শে বৈশাখ ১৩৯৭ — শ্রীপ্রিয়দর্শন সেনশর্মা
কলকাতা

॥ সূচীপত্র ॥

সামরিক ভূগোল

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানচিত্র
(Map)

সামরিক ভূগোল একটি বিশাল বিষয়। ঐ বিষয়ের প্রথম পাঠ হচ্ছে মানচিত্র সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ মানচিত্র কি এবং কেমনভাবে তা পাঠ করতে হয়।

যেমন যুদ্ধের কালে তেমনি শান্তির সময়েও প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থা করতে হয়। শান্তির সময় প্রতিটি রাষ্ট্রকেই করতে হয় সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণ থেকে স্বরাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা, এবং ঐ শত্রুর পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রহণ করতে হয় বাস্তব কর্মসূচী। এই পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গৃহীত হয় রাষ্ট্রের উচ্চতম প্রতিরক্ষা দপ্তরে। কর্মসূচীর প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সীমান্তে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সৈন্য-বাহিনী পাঠানো ও প্রতিরক্ষার ব্যূহ গড়ে তোলা। নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোতে প্রতিরক্ষাবাহিনী পৌঁছে গেলে প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ঐ বিশেষ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সামরিক কম্যাণ্ডারের উপর। তিনি প্রতিরক্ষার মূল কর্মসূচী অনুসরণ করে তাঁর দায়িত্বাধীন অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় প্রতি-রক্ষার ব্যবস্থা ঠিক করে ছড়িয়ে দেন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনীকে। আবার প্রতিটি এলাকার ভারপ্রাপ্ত সামরিক কম্যাণ্ডাররা তাঁদের সৈন্য-বাহিনীকে পাঠিয়ে দেন নানা উপ-এলাকায় ও কেন্দ্রে। এমনিভাবে উচ্চতম পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা ও সেই অনুযায়ী কর্মসূচীর রূপায়ণ হতে থাকে। আবার শুধু বিভিন্ন অঞ্চল, এলাকা, উপ-এলাকা বা কেন্দ্রে সৈন্য মোতায়েন করলেই ত সব হয় না, সৈন্যদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ঐসব জায়গায় হাতিয়ার, গোলা-গুলী, রসদ, ওষুধ, ইত্যাদি বহুবিধ জিনিস নিরন্তর সরবরাহ করতে হয়।

আবার যুদ্ধ বেঁধে গেলে যুদ্ধের অঞ্চলে প্রায়ই সৈন্যদের এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরে যেতে হয় অতি দ্রুতগতিতে। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই প্রতিরক্ষার বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক অধিকরণকে জানতে হয় কোন জায়গায় কোন সৈন্যদল রয়েছে, এবং ঐ সৈন্যদলটির পরবর্তী সম্ভাব্য ঘাঁটি কোথায় কোথায় হতে পারে।

পরিকল্পনা তৈরী করা থেকে শুরু করে যুদ্ধকালে সৈন্যদলের অবস্থিতি ও চলাচল করতে প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রটির বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক তথ্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের। কিন্তু কোন দেশেরই সকল অংশের ভূ-প্রকৃতি, বনানী, ঋতুবৈচিত্র্য বা জনবসতি একরকম হয় না; আর ভারতের মত বিশাল দেশ এবং বিভিন্নতায় সমৃদ্ধ সমাজে ত সমরূপতার কথা ভাবাই যায় না। অথচ বিস্তীর্ণ এই দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখে ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করা বা ঘুরে দেখে একটি অঞ্চলের সব তথ্য মনে রাখা উচ্চতম পর্যায়ের পরিকল্পনা রচয়িতার পক্ষে শুধু নয় নিম্নতম স্তরের অধিনায়কের পক্ষেও অসম্ভব। এই প্রয়োজন মেটাতে তাই দরকার হয় প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিচ্ছবির বা নক্সার—ঐ প্রতিচ্ছবি বা নক্সাতে অবশ্যই রূপায়িত জায়গাটির সকল প্রকার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও জনবসতির সংবাদ থাকা চাই। কোন অঞ্চলের এই রকম ভৌগোলিক তথ্যবাহী পরিমাণসূচক প্রতিচ্ছবি বা নক্সাকেই সাধারণতঃ 'মানচিত্র বা ম্যাপ (Map)' বলে।

মানচিত্র সাধারণতঃ কতকগুলো রেখা ও সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে আঁকা হয়। এইজন্য মানচিত্রকে ভূ-পৃষ্ঠের কোন একটি অঞ্চলের লৈখিক চিত্র বা লেখচিত্র বা রেখাচিত্র বলা হয়।

মানচিত্র আঁকা হয় সাধারণতঃ কোন সমতল কাগজে বা কাপড়ে। যেহেতু ভূ-পৃষ্ঠের যে অঞ্চলের মানচিত্র আঁকা হয় কাগজ বা কাপড়ের আয়তন তার থেকে অনেক ছোট, সেহেতু ভূ-পৃষ্ঠের উপর দুটি জিনিসের বাস্তব দূরত্বকে মানচিত্রের কাগজে বা কাপড়ে একটি নির্ধারিত অনুপাতে ছোট করে নিতে হয়; যেমন ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্বকে অনেক মানচিত্রে এক ইঞ্চি দেখান হয়। ভৌগোলিক দূরত্বের সঙ্গে মানচিত্রের দূরত্বের অনুপাতকে একটি মানচিত্রের সর্বত্র অপরিবর্তিত রাখতে হয়। তাই মানচিত্রকে বলা হয় ভূ-পৃষ্ঠের কোন একটি অঞ্চলের আনুপাতিক [নির্দিষ্ট একটি অনুপাতে আঁকা] পরিমাণসূচক লৈখিক চিত্র বা রেখাচিত্র। আঁকা ছবির চাইতে মানচিত্র সরল, কিন্তু অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত।

সাধারণতঃ যে-অঞ্চলের মানচিত্র আঁকা হয়, সে অঞ্চলের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ—অর্থাৎ নদ-নদী-খাল চড়াই-উৎরাই গাছ-বন ইত্যাদি—এবং মানুষের তৈরী রাস্তা-ঘাট-পুল-বাড়ী-গ্রাম-শহর-বিল-পুকুর-কুঁয়ো-ক্ষেত সব ঐ মানচিত্রটিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের ঐ অঞ্চলটিকে মানচিত্রে

ছোট করে দেখানো হয় বলে ভূ-পৃষ্ঠের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি হয়ত অনেক সময় মানচিত্রে পাওয়া নাও যেতে পারে। আবার একদিকে প্রকৃতি যেমন নিরন্তর কর্মময়ী, তেমনি মানুষও তার নিজস্ব চাহিদা মেটাবার জন্য শুধু ভূ-পৃষ্ঠে নয় ভূগর্ভেও নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ড করে। একটি অঞ্চলের মানচিত্র তৈরী করার পর ঐ অঞ্চলটি অপরিবর্তিত থাকে না, ফলে মানচিত্র তৈরী হবার কয়েক বছর পর ঐ অঞ্চলটির রূপের সঙ্গে মানচিত্র হুবহু মিলতে পারে না—তবুও যে-কোন মানচিত্র থেকেই মানচিত্রে রূপায়িত অঞ্চলটি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। তাই কোন সামরিক কাজে মানচিত্রকে অন্ধের মত অনুসরণ না করে সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে মানচিত্রের ব্যাখ্যা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত সকলকেই মানচিত্র পাঠ করতে জানতে হয়। কারণ, মানচিত্রের সাহায্যেই স্বরাষ্ট্রের এবং শত্রুরাষ্ট্রের ভূ-প্রাকৃতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। ঠিকমত মানচিত্র পাঠ করতে পারলে নীচে লেখা কাজগুলো সহজে এবং ভালোভাবে করা যায়ঃ

(ক) ভূ-পৃষ্ঠের কোথায় নিজস্ব অবস্থিতি নিরূপণ,

(খ) ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত কোন একটি বিশেষ জিনিস থেকে অন্য একটি বস্তু কোন দিকে এবং কতদূরে অবস্থিত তা নির্ধারণ,

(গ) ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত বিবিধ জিনিসের আকৃতি ও আয়তন পরিমাপ,

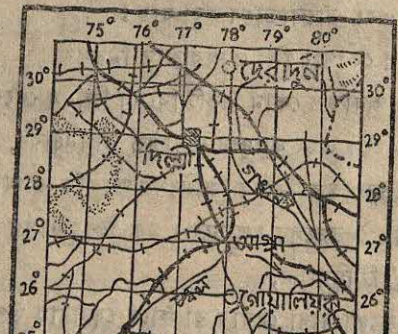
(ঘ) স্বপক্ষীয় সৈন্যদলের চলাচলের জন্য উপযুক্ত পথ এবং অবস্থিতির জন্য ঘাঁটি নির্বাচন,

এবং (ঙ) শত্রুসৈন্যদের বাধা দেবার বা ফাঁদে ফেলবার উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত-করণ।

মানচিত্র পাঠের শিক্ষাকে আকর্ষক ও কার্যকর করার জন্য মানচিত্র পাঠের পদ্ধতির কোন একটি বিষয় ভালো করে ব্যাখ্যা করার পর ঐ বিষয়টির উপর বাস্তবক্ষেত্রে অনুশীলন করাতে হয়। যেমন আগেই বলা হয়েছে যে মানচিত্র একটি জায়গার পরিমাণসূচক আনুপাতিক লৈখিক চিত্র, অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্বকে মানচিত্রে এক ইঞ্চি দেখানো যেতে পারে। এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের ভালো করে বোঝাবার পর ঘরের এক ফুট দূরত্বকে মানচিত্রে এক ইঞ্চি দেখিয়ে ঘরের মানচিত্র আঁকতে বলা যেতে পারে, অথবা খেলার মাঠের বাস্তব এক গজ দূরত্বকে মানচিত্রে এক ইঞ্চি ধরে খেলার মাঠের

মানচিত্র তৈরী করতে নির্দেশ দেওয়া চলতে পারে। এই রকম ভাবে প্রতিটি পাঠের পর কিছু বাস্তব অনুশীলন করালে মানচিত্র পাঠ বিষয়টি বিদ্যার্থীদের কাছে সহজ ও আকর্ষক হয়।

প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও বহু লোকই মানচিত্র নানা কাজে ব্যবহার করেন। প্রতিরক্ষাবিভাগ যে-সব মানচিত্র ব্যবহার করেন সেগুলোকে বলা হয় সামরিক মানচিত্র, অন্যান্য মানচিত্রগুলোকে বলা হয় অসামরিক মানচিত্র। অসামরিক মানচিত্রগুলোতে দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখা ব্যবহার করা হয়। এই উভয়শ্রেণীর রেখাগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব সূচিত হয় কৌণিক (angular) মাপে, অর্থাৎ ডিগ্রী, মিনিট, সেকেণ্ড-এর সাহায্যে। দ্রাঘিমারেখাগুলো উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে প্রসারিত বলে পরস্পর সমান্তরাল হয় না, ফলে যে-কোন দুটি দ্রাঘিমারেখার কৌণিক দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রৈখিক দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র এক নয়। যে-কোন মেরুর কাছে যে-কোন দুটো দ্রাঘিমার রৈখিক



চিত্র : 1·1

দূরত্ব কম থাকে, কিন্তু যতই বিষুবরেখার কাছাকাছি যাওয়া যায় দ্রাঘিমা দুটোর রৈখিক দূরত্ব বেড়ে যায়। অন্যদিকে অক্ষরেখাগুলো পরস্পর সমান্তরাল। তার ফলে যে-কোন দুটো অক্ষরেখার কৌণিক দূরত্ব যেমন অপরিবর্তনীয়, তাদের রৈখিক দূরত্বও তেমনি সর্বত্রই অপরিবর্তিত থাকে।

সামরিক মানচিত্রগুলোতে কিন্তু দ্রাঘিমা এবং অক্ষরেখা ছাড়াও অন্য

আরেক ধরনের রেখা থাকে—তাদের নাম 'গ্রিড্ (Grid)' রেখা বা ঝাঝরি বা জালি রেখা। মানচিত্রে এই রেখাগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সমান্তরালভাবে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে সমান্তরালভাবে আঁকা থাকে। এই সমান্তরাল রেখাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক রৈখিক দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকে। এই রেখাগুলো আঁকার ফলে গোটা মানচিত্রটিতে অনেকগুলো বর্গক্ষেত্র তৈরী হয়। প্রতিটি গ্রিড্ বা জালিরেখা বা ঝাঝরিরেখাকে দুই অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়, যেমন 08, 09, 10, 11, ইত্যাদি। যে-গ্রিড্রেখাগুলো উত্তর-দক্ষিণ বরাবর আঁকা হয় তাদের ক্রমিক নম্বর পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে বাড়তে থাকে, তাই তাদের বলা হয় 'ইষ্টিং (Easting)'। আর যে-সব গ্রিড্রেখা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর আঁকা থাকে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র তাদের ক্রমিক নম্বর দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বেড়ে যায়, তাই এদের নাম 'নর্থিং (Northing)'। ইষ্টিং এবং নর্থিং রেখাগুলো মানচিত্রের উপর যে জাল তৈরী করে তাকে বলা হয় 'গ্রিড্ নেট (Grid net) বা গ্রিড্ জাল'। গ্রিড্ জালের উপস্থিতি সামরিক মানচিত্রগুলোর এক অভিনব বৈশিষ্ট্য।

সামরিক মানচিত্রগুলোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এগুলো সাধারণতঃই ত্রিমাত্রিক বা 'ষ্টেরিওগ্রাফিক অভিক্ষেপ (Stereographic Projection)' পদ্ধতিতে আঁকা হয়। সমতল ভূমির বা কাগজের উপর ঘনবস্তুর প্রকাশের ভঙ্গিকে ষ্টেরিওগ্রাফি বলে। অসামরিক মানচিত্রে অনেক সময় ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতা বা বিভিন্ন উচ্চতা দেখাবার জন্য 'উচ্চাবচ মানচিত্র (Relief Map)' আঁকা হয়, কখনও বা বিভিন্ন রঙের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতা বা উষ্ণতা দেখানো হয়। সামরিক মানচিত্রকে সহজপাঠ্য করার জন্য সকল প্রকার উচ্চতা বা বন্ধুরতা দেখানো হয় কেবল মাত্র রেখা বা বৃত্তাকৃতির সাহায্যে।

ভারতে সাধারণতঃ সকল প্রকার মানচিত্র তৈরী করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে 'দ্য সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (The Survey of India)' সংস্থাটির উপর। তবে স্থলবাহিনীর 'কোর অব ইঞ্জিনীয়ার্স (Corps of Engineers)' সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনমত কিছু কিছু মানচিত্র তৈরী করেন। বর্তমানে বিশেষ বিশেষ মানচিত্র তৈরী করার দায়িত্ব ভারত সরকার আরও কতকগুলো সংস্থাকে দিয়েছেন, যেমন 'ন্যাশন্যাল থিম্যাটিক ম্যাপিং অর্গানিজেশন (National Thematic Mapping Organization)', 'জিওলজিক্যাল

সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (Geological Survey of India)', ইত্যাদি।

আগেই বলা হয়েছে যে ভূ-পৃষ্ঠের সকল প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গাছ, বন, খাল, নদী, বাড়ী, রাস্তা, রেলপথ, ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানচিত্রে দেখানো হয়, অথচ মানচিত্র কোন শিল্পীর আঁকা ছবি নয়। তাহলে অত রকমের সব জিনিস মানচিত্রে দেখানো হয় কি ভাবে? 'দ্য সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' প্রতিটি জিনিসের জন্য এক একটি বিশেষ 'সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা কনভেনশনাল সাইন (Conventional sign)' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই চিহ্নগুলো সহজ সরল এবং রেখার সাহায্যেই আঁকা যায়। মূল বিষয়টির চেহারার সঙ্গে কিন্তু সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোর আকারগত সাদৃশ্য থাকে। দ্য সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অবশ্যই কেবলমাত্র অসামরিক জিনিসগুলোর জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন ঠিক করেন, আর সামরিক জিনিসগুলোর সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে সামরিক বাহিনীর প্রধান কার্যালয় অর্থাৎ 'আর্মি হেডকোয়ার্টার্স (Army Headquarters)'-এর উপর। সামরিক বাহিনী যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য এবং যুদ্ধের কাজে ব্যবহারের জন্য মানচিত্রের উপর প্রয়োজনীয় সামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো বসিয়ে নেয়। অসামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো সচরাচর পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু সংবাদের গোপনীয়তা রাখার উদ্দেশ্যে সামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোকে মাঝে মাঝেই বদলাতে হয়। এই পরিবর্তন করার দায়িত্ব স্বাভাবিক কারণেই সামরিক বাহিনীর।

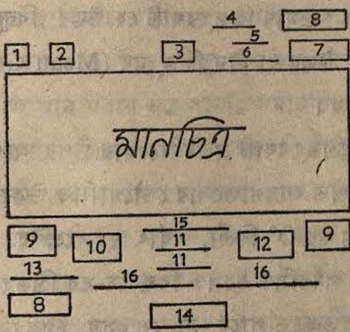
প্রান্তিয় তথ্য (Marginal information)

ভারতে ব্যবহৃত মানচিত্রগুলোতে উপরের ও নীচের সীমারেখাগুলোর উপরে এবং নীচে কতকগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু কিছু তথ্য দেওয়া থাকে। ঐ তথ্যগুলোর সাহায্যে ঐ বিশেষ মানচিত্রটি পাঠ করতে এবং ঐ মানচিত্রটি সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ জানতে সুবিধা হয়। একটি মানচিত্রে সাধারণতঃ যে-সব প্রান্তিয় তথ্য থাকে পরপৃষ্ঠায় দেওয়া (চিত্র : 1·2) নক্সাটির সাহায্যে সেগুলো বলা হচ্ছে।

নক্সাটিতে ষোলটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। কোন জায়গায় কি তথ্য দেওয়া থাকে এবারে তা বলা হচ্ছে :

1. মানচিত্রটিতে যে-সব জিলার অংশ দেখানো হয়েছে সে-সব জিলার

নাম; যদি মানচিত্রটিতে কেবলমাত্র একটি জিলার অংশ দেখানো থাকে তবে শুধু সেই জিলাটির নাম।



চিত্র : 1·2

2. সমীক্ষা বর্ষ বা জরিপ বর্ষ—অর্থাৎ যে-বছরের জরিপ বা সমীক্ষার ভিত্তিতে মানচিত্রটি তৈরী হয়েছে সেই বছরটি এখানে লেখা থাকে। জরিপ বর্ষটি দেখে বোঝা যায় যে মানচিত্রটি কতদিনের পুরানো তথ্য বহন করছে।

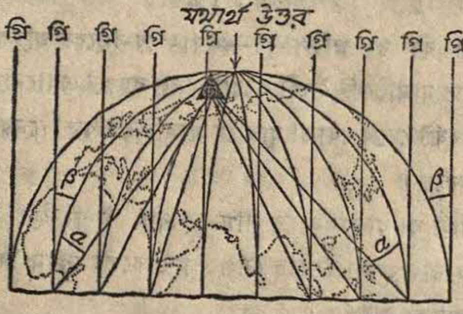
3. অঙ্গরাজ্য বা রাজ্যসমূহের নাম—অর্থাৎ 1 চিহ্নিত স্থানে যে-সব জিলার নাম লেখা হয়েছে সেগুলো ভারতের কোন বিশেষ রাজ্য বা রাজ্যসমূহের অন্তর্গত।

4. মানচিত্রটির সংস্করণ—অর্থাৎ মুদ্রিত মানচিত্রটি প্রথম, দ্বিতীয় বা কোন সংস্করণ।

5. মধ্য গ্রিড্ উত্তর (Mean Grid North)—আগেই বলা হয়েছে যে সামরিক মানচিত্রগুলোতে দ্রাঘিমারেখা এবং অক্ষরেখা যেমন থাকে তেমনি থাকে গ্রিডরেখা। পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রমান্বয়ে চিহ্নিত গ্রিড্ রেখাগুলো সমান্তরাল এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। রেখাগুলো সমান্তরাল হওয়ার ফলে সকলেই যথার্থ ভৌগোলিক উত্তরবিন্দুর দিক সূচিত করে না—স্থানীয় ভৌগোলিক উত্তরবিন্দুর দিক্-নির্দেশক রেখা থেকে প্রতিটি ইষ্টিংরেখার কৌণিক দূরত্ব ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতার জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। ঐ সব সমস্যার ব্যাপকতা কমাবার জন্য প্রতিটি মানচিত্রের কেন্দ্রীয় উত্তর-দক্ষিণ অক্ষে যে গ্রিড্ রেখাটি থাকে তাকে 'প্রমাণ (Standard)'

গ্রিড্ রেখা ধরা হয়। সাধারণতঃ চেষ্টা করা হয় যে প্রমাণ গ্রিড্-রেখাটি যেন একটি দ্রাঘিমরেখায় আপতিত হয়ে তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি মিলে যায়। প্রমাণ গ্রিড্ রেখাটি যে উত্তর বিন্দুর প্রতি ধাবিত হয় তাই 'মধ্য উত্তর বা মীন গ্রিড্ নর্থ (Mean Grid North)' নামে অভিহিত হয়।

প্রমাণ গ্রিড্ রেখাটি দ্রাঘিমারেখার উপর আপতিত হয় বলে এই রেখায় অবস্থিত জায়গাগুলোর ভৌগোলিক উত্তর এবং গ্রিড উত্তরের মধ্যে পার্থক্য হয় 0° ডিগ্রী, অর্থাৎ দুই শ্রেণীর উত্তরবিন্দুই এখানে এক বিন্দুতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু যে-সব গ্রিড্ রেখা দ্রাঘিমারেখার সঙ্গে আপতিত হতে পারে না সে সব গ্রিড্ রেখাগুলো দ্রাঘিমা-



চিত্র : 1·3

রেখার সঙ্গে কোণের সৃষ্টি করে। উপরের ছবিটিতে (চিত্র : 1·3) দেখা যাচ্ছে যে মাঝের রেখাটির ক্ষেত্রে গ্রিড্ উত্তর (গ্রি. উ.) এবং ভৌগোলিক উত্তর বা যথার্থ উত্তর এক হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ রেখাটির থেকে যত বাঁ দিকে যাওয়া যাচ্ছে তত ভৌগোলিক উত্তর থেকে গ্রিড উত্তর পশ্চিমদিকে সরে যাচ্ছে, আবার মধ্যরেখাটির থেকে ডানদিকে গেলে দেখা যাচ্ছে ভৌগোলিক উত্তর থেকে গ্রিড্ উত্তর ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে গ্রিড্ রেখা এবং দ্রাঘিমা-রেখার সংযোগস্থলে একটি কোণ উৎপন্ন হচ্ছে। এই কোণের নাম 'অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স (Angle of convergence)' (ছবিতে β)।

অনেক সময় দ্রাঘিমারেখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যে গ্রিড্ রেখাটি মিলিত

হয়, সেই গ্রিড্‌রেখাটি হয়ত মানচিত্রের মাঝবরাবর না হয়ে কোন একটি পাশে অবস্থিত হয়ে যায়। আবার অনেক মানচিত্রে কোন গ্রিড্‌রেখাই হয়ত দ্রাঘিমারেখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি আপতিত হতে পারে না। এই সব কারণেও কিছু কিছু মুশকিল দেখা যায়। এই ধরনের মুশকিল আশান করার জন্য সামরিক মানচিত্রে উপরের দিকে ঐ মানচিত্রের প্রমাণ গ্রিড্‌রেখাটিতে কত ডিগ্রীর 'অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স' তৈরী হয় তা লেখা থাকে; এবং বাস্তব কাজের জন্য ধরে নেওয়া হয় যে ঐ বিশেষ মানচিত্রটিতে প্রতিটি গ্রিড্‌রেখাতেই ঐ একই মাপের অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স তৈরী হয়। অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স থেকে বোঝা যায় যে ঐ মানচিত্রটিতে গ্রিড্ উত্তর ভৌগোলিক উত্তর থেকে কত ডিগ্রী পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত। মীন গ্রিড্ নর্থ বা মধ্য গ্রিড্ উত্তর আসলে প্রমাণ গ্রিড্‌রেখাটিতে উৎপন্ন অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স নির্দেশ করে।

6. চৌম্বক পরিবর্তন (Magnetic variation)—এই বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

7. পৃষ্ঠা নম্বর (Sheet Number)—মানচিত্র তৈরী হয়ে গেলে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রতিটি মানচিত্রকে একটি বিশেষ 'পৃষ্ঠা নম্বর (Sheet Number)' দিয়ে সূচীত করা হয়। প্রতিটি মানচিত্রের শরীরে সেই পৃষ্ঠা নম্বর মুদ্রিত থাকে।

8. পৃষ্ঠা উল্লেখ (Sheet reference)—প্রতিটি সামরিক মানচিত্রে 'পৃষ্ঠা উল্লেখ (Sheet reference)'-সূচক একটি সংখ্যা দেওয়া থাকে। কোন একটি বিশেষ মানচিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার থাকলে ঐ বিশেষ মানচিত্রটির পৃষ্ঠা উল্লেখসূচক সংখ্যাটি নির্দেশ করেই আলোচনা করতে হয়। পৃষ্ঠা উল্লেখসূচক সংখ্যাটির সাহায্যে অনেক মানচিত্রের মধ্য থেকে বিশেষ মানচিত্রটি খুঁজে বের করাও সহজ হয়।

9. সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Conventional signs)—আগেই বলা হয়েছে যে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম জিনিসগুলোকে বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে মানচিত্রে দেখানো হয়। কোন একটি মানচিত্রে যে-সব সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র

সেগুলোই ঐ মানচিত্রটির নীচে আলাদা করে ব্যাখ্যা করা থাকে।

10. পৃষ্ঠার সূচক (Index to sheets)—কোন একটি মানচিত্র দেখতে দেখতে যদি তার আশ-পাশের মানচিত্রগুলো দেখার প্রয়োজন হয়, তখন আবশ্যক মানচিত্রটির পৃষ্ঠা নম্বর জানা দরকার হয়। প্রতিটি মানচিত্রের পাশাপাশি আটটি অঞ্চলের মানচিত্রগুলোর পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া থাকে এই পৃষ্ঠাসূচক জায়গাটিতে। যে-মানচিত্রটিতে পৃষ্ঠার সূচক দেওয়া থাকে সেই মানচিত্রটির নিজস্ব পৃষ্ঠা নম্বর মুদ্রিত থাকে পৃষ্ঠাসূচকের ঠিক কেন্দ্রস্থলে। ধরা যাক্ একটি মানচিত্রের পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে $47\frac{F}{7}$, তাহলে সেই মানচিত্রটিতে দেওয়া পৃষ্ঠার সূচকটি হবে নিম্নরূপ (চিত্র : 1·4)।

$47\frac{F}{2}$	$47\frac{F}{6}$	$47\frac{F}{10}$
$47\frac{F}{3}$	$47\frac{F}{7}$	$47\frac{F}{11}$
$47\frac{F}{4}$	$47\frac{F}{8}$	$47\frac{F}{12}$

চিত্র : 1·4

11. দুটি স্কেল রেখা (Scale lines)—তৃতীয় পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

12. কিছু প্রশাসনিক জ্ঞাতব্য তথ্য।

13. প্রথম সংস্করণ ও পরবর্তী সংস্করণগুলোর তারিখসমূহ।

14. গ্রিড্ বাহুর দৈর্ঘ্য—ইষ্টিং গ্রিড্ রেখাগুলো যেমন পরস্পর সমান্তরাল, তেমনি নর্দিং গ্রিড্ রেখাগুলোও পরস্পর সমান্তরাল। আবার পাশাপাশি দুটো ইষ্টিং গ্রিড্ রেখার মধ্যে যে-দূরত্ব থাকে, ঠিক সেই দূরত্বই থাকে দুটি পাশাপাশি নর্দিং গ্রিড্ রেখার মধ্যে। ফলে ইষ্টিং ও নর্দিং গ্রিড্ রেখাগুলো পরস্পরকে ছেদ করে মানচিত্রের উপর অনেকগুলো সমান আয়তনের বর্গক্ষেত্র তৈরি করে। এই

সব বর্গক্ষেত্রের যে-কোন একটি বাহুর দৈর্ঘ্যকে 'গ্রিড্ বাহুর দৈর্ঘ্য' বলে।

15. প্রধান জরীপকারীর নাম অর্থাৎ আলোচ্য মানচিত্রটি তৈরী করার কাজে যে জরীপকারী দলটি ছিলেন তাঁদের পরিচালকের নাম।

16. কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ—মানচিত্রে সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে কোন একটি অঞ্চলকে শস্যক্ষেত্র রূপে দেখান হল, কিন্তু ঐ শস্যক্ষেত্রে বছরের কোন সময় কী শস্য হয় তা ত সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে দেখানো সম্ভব হয় না, অথচ প্রতিরক্ষামূলক কাজে কোন শস্য-ক্ষেত্রে শস্য আছে কি না, থাকলে সেই শস্যের উচ্চতা ও ঘনত্ব কতটা সে-সব জানা বিশেষ দরকার। তাই এই ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য মানচিত্রের নীচে লিখে দেওয়া হয়।

মানচিত্রের সীমাবদ্ধতা (Limitations of a map)

সকল প্রকার প্রযত্ন সত্ত্বেও কিন্তু কোন মানচিত্রই কোন একটি অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য বহন করতে পারে না। আগেই বলা হয়েছে যে সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সব অঞ্চলেই সব সময়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন হতেই থাকে। আবার জীবনযুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষও তার প্রয়োজনে ভূ-গর্ভে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বহু কাজ করে যে-কোন একটি অঞ্চলের রূপ বদলে দেয়। তাই কোন একটি অঞ্চল জরিপ করার পর মানচিত্র তৈরী করতে করতেই জরিপ করা অঞ্চলটির রূপ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

ভূ-পৃষ্ঠের একটি বড় অঞ্চলকে ছোট করে মানচিত্রে প্রতিফলিত করতে হয়। তাই ভূ-পৃষ্ঠের অনেক ছোট ছোট বিষয় মানচিত্রে দেখানো যায় না। এই সব সীমাবদ্ধতার জন্যই মানচিত্র কোন একটি অঞ্চল সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবাদ পরিবেশন করলেও সম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পৃষ্ঠার সূচক
(Index to sheet)

প্রথম পরিচ্ছেদে মানচিত্রে দেওয়া প্রান্তিয় তথ্যগুলো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার সময় 'পৃষ্ঠার স্থচক (Index to sheet)' বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে পৃষ্ঠার স্থচক তৈরী হয় ? এই প্রশ্নটির উত্তর সরাসরিভাবে দেবার আগে 'ভৌগোলিক উল্লেখ পদ্ধতি (Geographical reference system) বা জিওরেফ (Georef)' সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

জিওরেফ্ পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গৃহিত পদ্ধতি। অনেক বড় এলাকা জুড়ে যখন কোন সামরিক প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় তখন সাধারণতঃই এই পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়। তা ছাড়া সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা, নৌবহর ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত প্রয়াস, এবং বিমান-বাহিনীর সামরিক ব্যায়ামে এই পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ভূ-পৃষ্ঠের দশ মাইল বা ততোধিক দূরত্বকে যে-সব মানচিত্রে এক ইঞ্চি দেখানো হয় সে-সব মানচিত্রে গ্রিড্ বা ঝাঝরিরেখা আঁকা সাধারণতঃ হয় না। যে-মানচিত্রের এক ইঞ্চি দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের দশ মাইলের কম দূরত্বের প্রতিনিধিত্ব করে সেই সব মান-চিত্রেই গ্রিড্ বা ঝাঝরি রেখা আঁকা হয়।

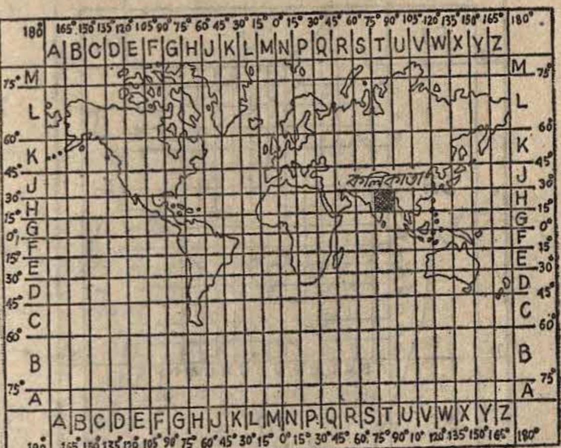
দ্রাঘিমারেখা এবং অক্ষরেখাগুলোকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে জিওরেফ্ পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠকে কয়েকটি চতুর্ভুজে ভাগ করা হয়েছে। দ্রাঘিমারেখা এবং অক্ষরেখার অংশ দিয়ে তৈরি হয়েছে ঐ চতুর্ভুজ-গুলোর বাহুগুলো। প্রতিটি চতুর্ভুজকে বিশেষ বিশেষ অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জিওরেফ পদ্ধতিটির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো অতি সংক্ষেপে নীচে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(ক) 180° ডিগ্রী দ্রাঘিমারেখা থেকে শুরু করে 360° ডিগ্রী বা 0° ডিগ্রী দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের উভয়তলকে 24টি সমান লম্বা অংশে ভাগ

করা হয়েছে—প্রতিটি অংশের প্রস্থ হচ্ছে 15°ডিগ্রী (সময়ের ব্যবধান এক ঘণ্টা)। প্রতিটি অংশের জন্য ইংরাজি বর্ণমালার এক একটি বর্ণ (I এবং O বাদে) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রথম অংশটির জন্য নির্ধারিত হয়েছে A বর্ণটি, তারপর ক্রমাগত পূর্বদিকের অংশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে B, C, D, প্রভৃতি বর্ণ দিয়ে।

দক্ষিণ মেরু থেকে শুরু করে 150° ডিগ্রি অন্তর অন্তর উত্তর মেরু পর্যন্ত 12টি বলয় টানা যায়। এই বলয়গুলোকেও ইংরাজি বর্ণমালার A বর্ণ থেকে শুরু করে M বর্ণ পর্যন্ত (বাদ দেওয়া হয়েছে I বর্ণ) বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটে প্রথম বলয়টিকে বলা হয় A বলয় – সেখান থেকে ক্রমাগত উত্তর মেরু পর্যন্ত একে একে চলে গেছে M বলয়। এইভাবে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে তৈরী হয়েছে মোট 288টি 'পনেরো ডিগ্রী চতুর্ভুজ (fifteen degree quadrangle)'। প্রতিটি চতুর্ভুজ সূচিত করা হয় দুটো

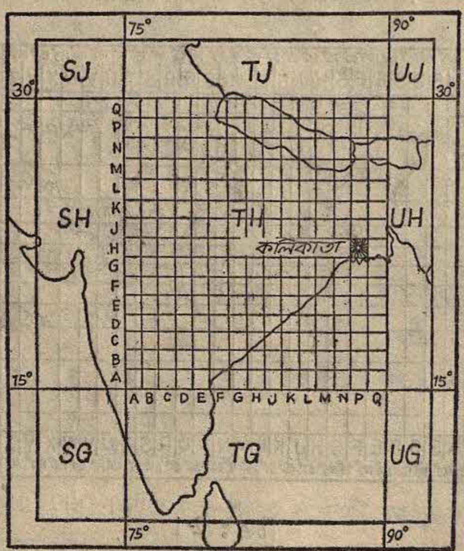


চিত্র : 2·1

বর্ণ দিয়ে—প্রথমে বর্ণটি দ্রাঘিমারেখাভিত্তিক বর্ণ, আর দ্বিতীয়টি অক্ষবলয়-ভিত্তিক। কলকাতা যে পনেরো ডিগ্রী চতুর্ভুজটিতে অবস্থিত তাকে সূচিত করা হয় TH বলে (2·1 চিত্র দ্রষ্টব্য)। এখানে—T দ্রাঘিমারেখাভিত্তিক বর্ণ, আর H হচ্ছে অক্ষবলয়ভিত্তিক।

(খ) প্রতিটি পনেরো ডিগ্রী চতুর্ভুজের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকে পনেরোটি

করে অংশে বিভাজিত করা হয়েছে। এইভাবে প্রত্যেকটি পনেরো ডিগ্রী চতুর্ভুজ পনেরোটি এক ডিগ্রী চতুর্ভুজে বিভক্ত হয়। একটি পনেরো ডিগ্রী চতুর্ভুজের দৈর্ঘ্যকে পনেরটি খণ্ড বিভক্ত করা হলে তাদের চিহ্নিত করা হয় ইংরাজি বর্ণমালার A বর্ণ থেকে Q পর্যন্ত বর্ণ দিয়ে (এখানেও I এবং O বর্ণ দুটোকে বাদ দেওয়া হয়)। একই পদ্ধতিতে প্রস্থের পনেরোটি খণ্ডেরও সূচক বর্ণ নির্দিষ্ট হয়। এই পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠের যে-কোন এক ডিগ্রী চতুর্ভুজকে সনাক্ত করা যায় চারটি বর্ণের সাহায্যে, যেমন কলকাতা যে এক ডিগ্রী চতুর্ভুজটিতে অবস্থিত তাকে বলা হয় THPH—এখানে TH বোঝায় পনেরো ডিগ্রী চতুর্ভুজটিকে, আর P বোঝায় এক ডিগ্রী চতুর্ভুজের বাম বাহুকে এবং দ্বিতীয় Hটি চিহ্নিত করে এক ডিগ্রী চতুর্ভুজটির ভূমিরেখাকে (2·2 চিত্র দ্রষ্টব্য)।



চিত্র : 2·2

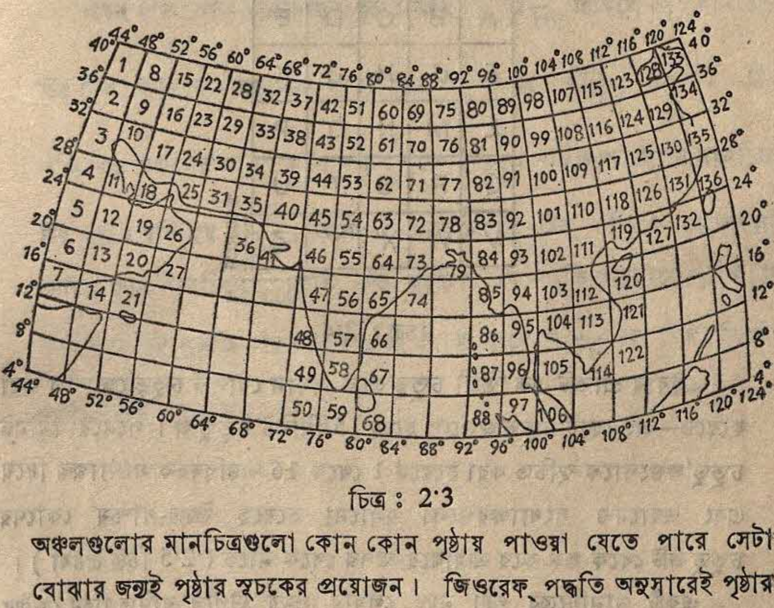
(গ) প্রতিটি এক ডিগ্রী চতুর্ভুজকে আবার ভাগ করা হয়েছে মিনিটে। যেহেতু 60 মিনিটে এক ডিগ্রী সেহেতু এক ডিগ্রী চতুর্ভুজের প্রতিটি বাহুকে 60টি সমান অংশে ভাগ করা হয়। এই বিভাজন সূচিত করা হয় অঙ্ক-বিষয়ক সংখ্যাক্ষর (numerical digit) দিয়ে। প্রতিটি মিনিটের রেখার জন্য দুটি

করে সংখ্যাক্ষর ব্যবহার করা হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, যে এক ডিগ্রী চতুর্ভুজটিতে কলকাতা অবস্থিত জিওরেফ্ পদ্ধতিতে তাকে বলা হয় THPH। এইবার এই চতুর্ভুজকে 60টি এক মিনিট চতুর্ভুজে বিভাজিত করায় কলকাতায় অবস্থিত যে-কোন বড় বিষয়কে সহজে সনাক্ত করা যেতে পারে। হাওড়ার পুল কলকাতায় অবস্থিত। এক ডিগ্রী চতুর্ভুজ পদ্ধতি অনুযায়ী এটিও THPH চতুর্ভুজে অবস্থিত। কিন্তু THPH চতুর্ভুজটির মধ্যে হাওড়ার পুল ছাড়াও ফোর্ট-উইলিয়াম, রজভবন, শহীদ মিনার, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। কাজেই যদি কেবল মাত্র হাওড়ার পুলটিকেই চিহ্নিত করতে হয় তাহলে শুধু THPH বললে হবে না। তখন এক মিনিট চতুর্ভুজের সাহায্য নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে হাওড়ার পুলকে চিহ্নিত করতে হলে লিখতে হবে THPH 2135। এখানে 21 সংখ্যাটি হাওড়ার পুলের দ্রাঘিমা, আর 35 বোঝায় তার অক্ষাংশ।

পৃষ্ঠার সূচক

যে বিশেষ অঞ্চলের মানচিত্র দেখা হচ্ছে প্রয়োজন হলে তার প্রতিবেশী



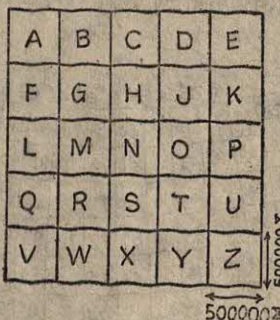
চিত্র : 2·3

অঞ্চলগুলোর মানচিত্রগুলো কোন কোন পৃষ্ঠায় পাওয়া যেতে পারে সেটা বোঝার জন্যই পৃষ্ঠার স্থচকের প্রয়োজন। জিওরেফ্ পদ্ধতি অনুসারেই পৃষ্ঠার

সূচক তৈরী হয়।

2·3 চিত্রটিতে এশিয়া মহাদেশকে কতকগুলো সমান চতুর্ভুজে ভাগকরা হয়েছে। এই চতুর্ভুজগুলোকে চার ডিগ্রী চতুর্ভুজ বলে, কেন না এই চতুর্ভুজগুলোর প্রতিটি বাহু চার ডিগ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই চতুর্ভুজগুলো অঙ্কবিষয়ক সংখ্যাক্ষর দিয়ে চিহ্নিত। এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণের চতুর্ভুজটিকে 1 সংখ্যাক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর বাঁদিকের লম্বা সারি ধরে উপর থেকে নীচে ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে যে চতুর্ভুজটির ভিতরে কোন দ্বীপ নেই সেই চতুর্ভুজটিতে কোন সংখ্যাক্ষর দেওয়া হয়নি।

প্রতিটি চার ডিগ্রী চতুর্ভুজকে আবার 16টি সমায়তনের চতুর্ভুজে ভাগ করা হয়েছে—এই ছোট চতুর্ভুজগুলো এক ডিগ্রী চতুর্ভুজ। এই এক ডিগ্রী চতুর্ভুজগুলোকে ইংরাজি বর্ণমালা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। চার ডিগ্রী চতুর্ভুজের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম কোণে যে এক ডিগ্রী চতুর্ভুজটি অবস্থিত তাকে সূচিত করা হয়েছে A বর্ণ দিয়ে। তারপর ক্রমান্বয়ে বর্ণ বসানো হয়েছে (2·4 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

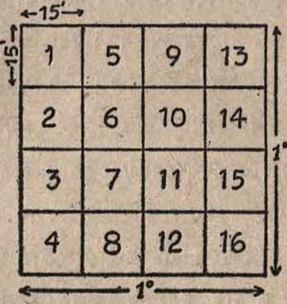


চিত্র : 2·4

এইবার প্রতিটি এক ডিগ্রী চতুর্ভুজকে সমান ষোলটি চতুর্ভুজে ভাগ করা হয়েছে—এই ছোট চতুর্ভুজগুলো হচ্ছে 15 মিনিট চতুর্ভুজ। পনেরো মিনিট চতুর্ভুজগুলোকে সূচিত করা হয়েছে 1 থেকে 16 অঙ্কবিষয়ক সংখ্যাক্ষর দিয়ে এবং এখানেও সংখ্যাক্ষরগুলো বসানো হয়েছে উত্তর-পশ্চিম কোণের চতুর্ভুজটি থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে উপর থেকে নীচে (2·5 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

একটি মানচিত্রের পৃষ্ঠা নম্বর লেখার সময় উপরে বর্ণিত তিন শ্রেণীর

চতুর্ভুজেরই সাহায্য নেওয়া। যে-কোন একটি মানচিত্রের পৃষ্ঠাসূচক সংখ্যায় একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং একটি ভগ্নাংশ থাকে, যেমন $47\frac{F}{15}$, $65\frac{A}{8}$, $73\frac{B}{6}$, ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যাটি (অর্থাৎ 47, 65, 73, ইত্যাদি) চার ডিগ্রী চতুর্ভুজটি সূচিত করে। ভগ্নাংশের ইংরাজি বর্ণটি এক ডিগ্রী



চিত্র : 2·5

চতুর্ভুজটিকে বোঝায়; আর ইংরাজি বর্ণের নীচের সংখ্যাক্ষরটি 15 মিনিট চতুর্ভুজটিকে বোঝায়।

এখন যদি কোন মানচিত্রের পৃষ্ঠার নম্বর হয় $47\frac{F}{10}$, তাহলে সেই মানচিত্রটির ঠিক উত্তরের অঞ্চলের মানচিত্রের পৃষ্ঠাঙ্ক হবে $47\frac{F}{9}$, তেমনি ঠিক দক্ষিণের অঞ্চলের মানচিত্রটির পৃষ্ঠাঙ্ক হবে $47\frac{F}{11}$। কিন্তু আলোচ্য মানচিত্রটির পৃষ্ঠাঙ্ক যদি হয় $47\frac{F}{16}$, তবে ঐ মানচিত্রটির ঠিক দক্ষিণে যে অঞ্চলটি আছে তার মানচিত্রের পৃষ্ঠাঙ্ক কত হবে? যে পদ্ধতি অনুসারে পৃষ্ঠাঙ্ক ঠিক করা হয় সেই পদ্ধতি অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে $47\frac{F}{16}$ এর ঠিক দক্ষিণের মানচিত্রটির পৃষ্ঠাঙ্ক হবে $47\frac{G}{13}$।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কেল

(Scale)

ভূ-পৃষ্ঠের কোন একটি অঞ্চলের মানচিত্র তৈরী করার সময় ঐ অঞ্চলটির রূপরেখাকে একটি বিশেষ অনুপাতে ছোট করে মানচিত্রটি আঁকা হয়, যেমন ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত বিশেষ দুটি গাছের অন্তর্বর্তী দূরত্ব যদি হয় এক মাইল, মানচিত্রে সেই দূরত্বকে দেখানো হল এক ইঞ্চি। ঐ বিশেষ মানচিত্রটিতে ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্ব সব সময়ই এক ইঞ্চি দেখানো হবে। ভূ-পৃষ্ঠের বাস্তব দূরত্বের সঙ্গে মানচিত্রে দেখানো দূরত্বের অনুপাত প্রতিটি মানচিত্রে নির্দিষ্ট থাকে, এবং এই অনুপাতটিকেই বলা হয় 'স্কেল (Scale)'। অন্যভাবে বলা চলে যে, মানচিত্রে প্রদর্শিত যে-কোন দুটি বিন্দুর দূরত্বের সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত ঐ বিন্দু দুটোর দূরত্বের অনুপাতকে স্কেল বলে। স্থান-বিবরণ (Topography) সম্বন্ধীয় মানচিত্রগুলোকে সাধারণতঃ স্কেল অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়, এবং সেই অনুসারে অভিহিত করা হয়, যথা 'এক ইঞ্চি মানচিত্র'। এক ইঞ্চি মানচিত্র বললেই বোঝা যায় যে ঐ মানচিত্রটির এক ইঞ্চি দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্বকে দেখাচ্ছে। প্রতিটি মানচিত্রেই স্কেলের উল্লেখ থাকে।

সাধারণতঃ প্রতিটি মানচিত্রের নীচে স্কেল অনুযায়ী দুটি সরলরেখা আঁকা থাকে এবং সেই রেখাগুলো কয়েকটি অংশে ভাগ করা থাকে—যাতে করে ঐ রেখাগুলোর বা তার অংশ বিশেষের সাহায্যে মানচিত্রটিতে দেখানো যে-কোন দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দূরত্ব মাপা সহজ হয়। এই রেখাদুটোকে বলা হয় 'স্কেল লাইন (Scale line)', অবশ্য চলতি কথায় এদেরও স্কেল বলা হয়।

'স্কেল' প্রকাশের পদ্ধতি

সামরিক মানচিত্রগুলোতে স্কেল বোঝাবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতি তিনটির প্রচলন আছে :—

(i) বিবরণের সাহায্যে (by statement),

(ii) প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশের সাহায্যে (by representative fraction),

এবং (iii) রৈখিক স্কেলের সাহায্যে (by graphic scale)।

এই পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

(i) বিবরণের সাহায্যে

স্কেল প্রকাশের এটি সহজতম পন্থা। এই পদ্ধতিতে মানচিত্রে ব্যবহৃত স্কেলটির বিবরণ সহজ ভাষায় বিবৃত করা থাকে, যেমন—"এক ইঞ্চি মানে এক মাইল (1″ inch to a mile)", "চার ইঞ্চি মানে এক মাইল (4″ inches to a mile)", প্রভৃতি। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে মানচিত্রটিতে প্রদর্শিত এক ইঞ্চি দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্বের সমান।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ্য যে, যে-সব মানচিত্রে এক ইঞ্চি দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের এক বা একাধিক মাইল বোঝায় সে-সব মানচিত্রকে 'ছোট স্কেলের মানচিত্র (Small Scale Map)' বলে ; আবার যে-সব মানচিত্রে ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্ব বোঝাবার জন্য এক ইঞ্চির চাইতে বড় দূরত্বের প্রয়োজন হয় তাদের 'বড় স্কেলের মানচিত্র (Large Scale Map)' বলে।

বিবরণের সাহায্যে স্কেল প্রকাশের পদ্ধতিতে দুটি বড় ত্রুটি দেখা যায় ঃ মানচিত্রে যদি কোন দুটি বিন্দুর দূরত্ব এক ইঞ্চির চাইতে কম হয়, অথবা বিন্দু দুটোর দূরত্ব প্রকাশ করতে ইঞ্চির ভগ্নাংশ ব্যবহার করতে হয়—যেমন $1\frac{1}{4}''$, $2\frac{3}{4}''$—তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ঐ বিন্দু দুটোর বাস্তব দূরত্ব বোঝার জন্য কিছু অঙ্ক কষতে হয়। ঐ সব অঙ্ক কষা সাধারণ সিপাইদের পক্ষে বেশ জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে সব কাজ করতে হয় তাড়াতাড়ি, সেখানে অত অঙ্ক কষার সুযোগ কোথায়?

এই পদ্ধতির আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে যে এটি সর্বদেশীয় করা যায় না, কেন না কোন কোন দেশে যেমন দূরত্ব মাপা হয় ইঞ্চি-ফুট-গজ-মাইল ইত্যাদি এককের সাহায্যে, তেমনি অনেক দেশে সেন্টিমিটার-ডেসিমিটার-মিটার প্রভৃতি এককের সাহায্যে দূরত্ব মাপা হয়। কাজেই যে দেশে দৈর্ঘ্য মাপার একক মিটার সে দেশে "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" বিবরণীটি তাৎপর্যহীন, আবার যদি স্কেলের বিবরণে বলা হয় "এক সে.মি. মানে এক মিটার" তবে যে-সব দেশে এফ. পি. এস. (F. P. S.) পদ্ধতির একক ব্যবহার করা হয় সে-সব দেশে ঐ বিবরণীটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(ii) প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশের সাহায্যে

স্কেল প্রকাশের এই পদ্ধতিটি পৃথিবীর সব দেশেই সমানভাবে কার্যকর হতে পারে। এই পদ্ধতিটিতে স্কেল প্রকাশ করা হয় একটি ভগ্নাংশের

সাহায্যে। ধরা যাক মানচিত্রটির এক ইঞ্চি দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্বকে বোঝায়। এই পদ্ধতিতে "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" না লিখে একটি ভগ্নাংশ তৈরী করা হবে যার লব সব সময় হবে 1। 63,360 ইঞ্চিতে এক মাইল হয়, এখন "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলটিকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হলে লিখতে হবে $\frac{1}{৬৩৩৬০}$। এই ভগ্নাংশটি দেখলে বোঝা যাবে যে মানচিত্রের 1 একক দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের 63,360 একক দূরত্ব বোঝাচ্ছে। অন্যভাবে বলা চলে যে প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশটি তৈরী করার সময় মানচিত্রে প্রদর্শিত যে কোন দুটি বিন্দুর দূরত্ব তৈরী করবে ভগ্নাংশটির লব, আর ভূ-পৃষ্ঠের উপর ঐ দুটি বিন্দুর বাস্তব দূরত্ব হবে ভগ্নাংশের হর, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে লব যেন সব সময় 1 হয় এবং লব ও হরের একক যেন এক হয়, অর্থাৎ লবটি ইঞ্চি হলে হরও ইঞ্চিতে প্রকাশিত হবে।

$$\text{প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ} = \frac{\text{মানচিত্রে দুটি বিন্দুর দূরত্ব}}{\text{ভূ-পৃষ্ঠে ঐ দুটি বিন্দুর দূরত্ব}}$$

এফ. পি. এস. (F. P. S.) পদ্ধতি বা সি. জি. এস (C. G. S.) পদ্ধতিতেই দূরত্ব মাপা হোক না কেন, প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশের যে অনুপাতটি দেখানো হয় সেটি অপরিবর্তিতই থেকে যায়। এই সুবিধার জন্য এই পদ্ধতিটি সহজেই সব দেশে চলতে পারে। ধরা যাক্ কোন একটি মানচিত্রে স্কেল বোঝাতে ব্যবহার করা হল $\frac{1}{100,000}$ ভগ্নাংশটি। যে-দেশে এফ. পি. এস. পদ্ধতি চলিত আছে সে-দেশে ভগ্নাংশটির লব 1 বোঝাবে মানচিত্রটির দুটি বিন্দুর দূরত্ব 1″ ইঞ্চি হলে, ভূ-পৃষ্ঠে ঐ বিন্দু দুটির দূরত্ব হবে 100,000 ইঞ্চি, অর্থাৎ 1·58 মাইল। আর যে-দেশে সি. জি. এস. পদ্ধতিতে দূরত্ব মাপা হয় সে দেশে বোঝাবে মানচিত্রস্থিত দুটো বিন্দুর দূরত্ব যদি 1 সেন্টিমিটার হয়, তবে ভূ-পৃষ্ঠে ঐ বিন্দু দুটোর দূরত্ব হবে 100,000 সেন্টিমিটার বা 1 কিলোমিটার।

বিবরণের সাহায্যে প্রকাশিত স্কেলকে অতি সহজেই প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করা যায়। যদি স্কেলের বিবরণে বলা হয় "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল", তাহলে তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করতে হলে লিখতে হবে $\frac{\text{1 ইঞ্চি}}{\text{1 মাইল}}$; এবার ভগ্নাংশটির লব ও হরকে একই

একককে নিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ,

$$\frac{1 \text{ ইঞ্চি}}{1 \text{ মাইল}} = \frac{1 \text{ ইঞ্চি}}{1 \times 1760 \times 3 \times 12 \text{ ইঞ্চি}} = \frac{1}{63,360}$$

আবার প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ থেকেও স্কেলের বিবরণ পাওয়া যায়। ধরা যাক্ একটি মানচিত্রের স্কেল দেখানো হয়েছে $\frac{1}{100000}$ ভগ্নাংশটি দিয়ে। এবার বিবরণের সাহায্যে স্কেলটি প্রকাশ করতে গেলে লিখতে হবে "1 ইঞ্চি মানে 100,000 ইঞ্চি"— কিন্তু যেহেতু 100,000 ইঞ্চি লেখার রীতি প্রচলিত নেই, সেহেতু 100,000 ইঞ্চিকে যথাক্রমে 12, 3, এবং 1760 দিয়ে ভাগ করে মাইলে রূপান্তরিত করতে হবে। তাহলে স্কেলের বিবরণ দাঁড়াবে "1 ইঞ্চি মানে 1·58 মাইল"।

আগেই বলা হয়েছে যে প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশে লব সব সময় 1 হবে, এখন যদি কোন স্কেলের বিবরণীতে লেখা থাকে "3 ইঞ্চি মানে 1 মাইল", তাহলে তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশে কী ভাবে রূপান্তরিত করা হবে? নিয়ম অনুসারে মানচিত্রের দূরত্ব হবে লব, আর ভূ-পৃষ্ঠের দূরত্ব হবে হর। তাহলে ভগ্নাংশটি দাঁড়াবে $\frac{3 \text{ ইঞ্চি}}{1 \text{ মাইল}}$। এবার লব ও হরকে একই এককে আনতে হবে, অর্থাৎ $\frac{3 \text{ ইঞ্চি}}{1 \text{ মাইল}} = \frac{3 \text{ ইঞ্চি}}{1 \times 1760 \times 3 \times 12 \text{ ইঞ্চি}} = \frac{3}{63,360}$।

এবার লবকে 1 করতে হবে, অর্থাৎ লবকে 3 দিয়ে ভাগ করতে হবে— আবার যদি লবকে 3 দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে লব এবং হরের অনুপাত ঠিক রাখার জন্য হরকেও 3 দিয়ে ভাগ করতে হবে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে,

$$\frac{3}{63,360} = \frac{1}{21,120}।$$

এইবার এই মানচিত্রটির স্কেল প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশে দাঁড়াল $\frac{1}{21,120}$।

প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশকে ইংরাজিতে বলা হয় 'Representative Fraction', তার থেকে সংক্ষেপ করা হয়েছে 'R. F.'। সাধারণতঃ চলতি ভাষাতে তাই স্কেল প্রকাশের এই পদ্ধতিকে বলা হয় "আর. এফ. পদ্ধতি (R. F. System)"।

(iii) রৈখিক স্কেল (Graphic Scale)

সাধারণতঃ সব মানচিত্রেই প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ এবং বিবরণের সাহায্যে স্কেলের বর্ণনা দেওয়া থাকে। তা ছাড়াও সব মানচিত্রেই নীচের দিকে দুটি সরলরেখা আঁকা থাকে—এই রেখাদুটোর মাধ্যমেও মানচিত্রটিতে ব্যবহৃত স্কেল চিত্রিত থাকে। এই রেখাদুটোকে বলা হয় 'রৈখিক (Graphic or Linear) স্কেল' বা 'সাধারণ বা সমতলীয় (Plain) স্কেল'। এই রেখা দুটোকেই 'স্কেল লাইন (Scale Line)' বলা হয়। স্কেল লাইন দুটোর উপরে—সাধারণতঃ বাঁ দিকে—মানচিত্রটিতে ব্যবহৃত স্কেলের প্রতি-নিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ মুদ্রিত থাকে।

স্কেল লাইনের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ 4 ইঞ্চি থেকে 6 ইঞ্চির মধ্যে সীমিত থাকে। তবে 6 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইনই সুবিধাজনক। এই দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করার সময় হিসাব করে দেখতে হয় যে দৈর্ঘ্য মাপার এককের কত দশক, শতক বা সহস্রককে ঐ স্কেল লাইনে দেখানো যেতে পারে। অর্থাৎ যদি এককের শতক বা সহস্রক দেখানোর জন্য 4 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের রেখার প্রয়োজন হয়, তাহলে স্কেল লাইনটি 4 ইঞ্চি দীর্ঘই হবে, কিন্তু যদি দেখা যায় যে 5 ইঞ্চি দীর্ঘ রেখা না হলে এককের শতক বা সহস্রক দেখানো যাবে না তখন স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য হবে 5 ইঞ্চি।

স্কেল লাইনটির বাঁ প্রান্ত থেকে এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ছেড়ে দিয়ে শুরু হয় শূন্য বিন্দু—তারপর সেখান থেকে শুরু করে ডানদিকে বড় বড় অংশে—যেমন প্রতি 500 গজ অথবা 1 মাইল—স্কেল লাইনটিকে ক্রমান্বয়ে বিভাজিত করা থাকে। এই বিভাজনের সময়ও মানচিত্রটিতে ব্যবহৃত স্কেলের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। যদি মানচিত্রটির স্কেল হয় 1/63,360 তাহলে স্কেল লাইনটির প্রতি এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্ব বোঝাবে—তাই স্কেল লাইনটির প্রতি এক ইঞ্চি দূরত্বের ব্যবধানে লেখা হবে এক মাইল, দুই মাইল, ইত্যাদি। স্কেল লাইনটির এই বড় অংশগুলোকে বলা হয় 'প্রাথমিক বিভাজন বা প্রাইমারীজ (Primaries)'। স্কেল লাইনটির 0 বিন্দু থেকে বাঁদিকে এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের যে রেখাংশটি থাকে সেটিকেও ক্রমান্বয়ে সমান দৈর্ঘ্যের ছোট ছোট অংশে বিভাজিত করা হয়। যে মানচিত্রের স্কেল 'এক ইঞ্চি মানে এক মাইল' সেই মানচিত্রটিতে ফার্লং বা 100 গজের দূরত্ব জাহির করার মত করে ছোট অংশগুলো চিহ্নিত করা হয়। স্কেল লাইনের

এই ছোট অংশগুলোকে বলা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভাজন বা সেকেণ্ডারীজ (Secondaries)'।

আগেই বলা হয়েছে যে প্রতি মানচিত্রে সাধারণতঃ দুটি স্কেল লাইন থাকে। একটি স্কেল লাইনকে বিভাজিত করা হয় এফ. পি. এস. পদ্ধতি অনুসারে, আর অন্যটি বিভাজিত থাকে সি. জি. এস. পদ্ধতি অনুযায়ী।

স্কেল লাইনগুলো এইভাবে বিভাজিত থাকার ফলে মানচিত্রে দেখানো যে-কোন দুটো বিন্দুর দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠে কতটা তা বোঝার জন্য কোন অঙ্ক কষতে হয় না। মানচিত্রে দেখানো বিন্দু দুটোর দূরত্ব কোন কাগজ বা সুতো, এমনকি ঘাসের নল দিয়ে মেপে নিয়ে স্কেল লাইনের উপরে ফেললেই ভূ-পৃষ্ঠের উপর ঐ বিন্দু দুটোর দূরত্ব কতটা তা বোঝা যায়। তাই মানচিত্র পাঠ করতে স্কেল লাইনের গুরুত্ব যথেষ্ট।

রৈখিক স্কেল কি করে তৈরী করতে হয় (How to construct a scale line)

উদাহরণ—1

যদি কোন মানচিত্রের স্কেল "এক ইঞ্চি মানে পাঁচ মাইল" হয়, তাহলে তার স্কেল লাইন কিভাবে তৈরী করতে হবে ?

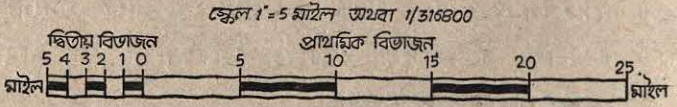
স্কেল লাইনের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ 4 ইঞ্চি থেকে 6 ইঞ্চি হয়।

প্রদত্ত মানচিত্রটির এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের 5 মাইলের সমান, অতএব মানচিত্রের 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের 30 মাইল বোঝাবে।

30 সংখ্যাটি একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং এটিকে সহজেই ছয়টি সমান অংশে ভাগ করা চলে—এই অংশগুলোর প্রতিটির দৈর্ঘ্য 5 মাইল হবে। কাজেই যদি স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য 6 ইঞ্চি হয় তবে কাজের সুবিধা হবে। যদি স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য 4 ইঞ্চি হত তাহলেও তা বোঝাত ভূ-পৃষ্ঠের 20 মাইল। 20 সংখ্যাটিও একটি পূর্ণ সংখ্যা, তবে 4 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইন কেন তৈরী করা হবে না ? কারণ, 6 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইনকে প্রাইমারিজ এবং সেকণ্ডারিজে বিভাজিত করা তুলনামূলক ভাবে 4 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইনের চাইতে সহজ। অতএব 6 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইন আঁকাই বিধেয়।

6 ইঞ্চি দীর্ঘ একটি সরলরেখা টানা হোক। এইবার ঐ সরলরেখাটিকে সমান ছয়টি অংশে ভাগ করা হোক—প্রতিটি অংশের দৈর্ঘ্য হবে এক ইঞ্চি

(অর্থাৎ প্রতিটি অংশ ভূ-পৃষ্ঠের 5 মাইল বোঝাবে)। এই অংশগুলো হল প্রাথমিক বিভাজন বা প্রাইমারিজ। এইবার সবচেয়ে বাঁ দিকে প্রাথমিক বিভাজনটির ডান সীমান্তে বসানো হোক O বিন্দুটি। এইবার O বিন্দুর ডানদিকে থাকবে পাঁচটি অংশ। প্রতিটি অংশের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি বা ভূ-পৃষ্ঠের 5 মাইল। তাই O বিন্দুটির ডানদিকে প্রতিটি অংশকে ক্রমান্বয়ে 5, 10, 15, 20 এবং 25 দিয়ে চিহ্নিত করা হোক। তাহলে এই বিভাজন-গুলোর সাহায্যে 5 থেকে শুরু করে 25 মাইল পর্য্যন্ত দূরত্ব মাপা সহজ হবে।



চিত্র : 3·1

এইবার O বিন্দুটির বাঁদিকের এক ইঞ্চি দীর্ঘ অংশটিকে সমান 5টি ভাগে ভাগ করা হোক। এই ছোট অংশগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় বিভাজন বা সেকেণ্ডা-রীজ। প্রতিটি দ্বিতীয় বিভাজন ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক —অর্থাৎ প্রতিটি দ্বিতীয় বিভাজনের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল বোঝা যাবে [চিত্র 3·1 দ্রষ্টব্য]

উদাহরণ 2

"এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলে একটি মানচিত্র অাঁকা হয়েছে। এই মানচিত্রটির জন্য এমন একটি স্কেল লাইন অাঁকতে হবে যার সাহায্যে 1,000 গজ পর্যন্ত সহজে মাপা যায়।

আলোচ্য মানচিত্রটিতে এক ইঞ্চি দূরত্ব মানে ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল অর্থাৎ 1760 গজ দূরত্ব। তাহলে মানচিত্রের 4 ইঞ্চি দূরত্ব ভূপৃষ্ঠের 4 × 1760 গজ বা 7040 গজ বোঝায় ; এবং মানচিত্রটির 6 ইঞ্চি দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের 6 × 1760 গজ বা 10,560 গজ বোঝায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যদি স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য 4 ইঞ্চি হয়, তাহলে তাকে সমান অংশে বিভাজিত করলে ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় হাজার গজ দূরত্ব জাহির করার মত স্কেল লাইনের অংশ পাওয়া 6 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইনের তুলনায় সহজ হতে পারে। কিন্তু 4 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইনটি থেকেও ভূ-পৃষ্ঠের 1000 গজ দূরত্ব-সূচক কোন অংশ পাওয়া যাবে

না, কেননা মানচিত্রটির 4 ইঞ্চি ত ভূ-পৃষ্ঠের 7040 গজ জাহির করে। কাজটি সহজ হতে পারে যদি এমন একটি দৈর্ঘ্যের স্কেল লাইন তৈরী করা যায় যা ভূ-পৃষ্ঠের 7000 গজ বোঝাবে। স্কেল লাইনের প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য তাহলে কত ? বোঝা যাচ্ছে স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য এখানে 4 ইঞ্চির কম হবে, কিন্তু প্রয়োজনীয় স্কেল লাইনটির সঠিক দৈর্ঘ্য কত হওয়া উচিত ? একটি সহজ সমানুপাতের অঙ্ক কষলেই এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে। অঙ্কটি নীচে করা হল।

কতগজে এক মাইল		স্কেলে প্রয়োজনীয় গজ		মানচিত্রটিতে কত ইঞ্চি দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল বোঝায়		স্কেল লাইনটির জন্য কত ইঞ্চি দৈর্ঘ্য প্রয়োজন
1760	:	7000	::	1	:	X

অথবা $X = \frac{7,000 \times 1}{1760} = 3{\cdot}98$ প্রায় অর্থাৎ X এর দৈর্ঘ্য প্রায় 3·98 ইঞ্চি।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যখন স্কেল লাইনের নির্ভুল দৈর্ঘ্য পেতে হলে দশমিক বিন্দুর ব্যবহার করতে হয় সেখানে এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ইঞ্চির ক্ষেত্রে দশমিক বিন্দুর পর দুই ঘর পর্যন্ত গেলেই চলে, কিন্তু সি. জি. এস. পদ্ধতিতে মিলিমিটারের পর দশমিক বিন্দুর পর মাত্র এক ঘর যেতে হয়।

আমরা দেখেছি আলোচ্য মানচিত্রটির স্কেল অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠের 7000 গজ দূরত্ব বোঝাতে মানচিত্রে প্রায় 3·98 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়। তাই এই ক্ষেত্রে স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য হবে 3·98 ইঞ্চি। এই লাইনটিকে সমান সাতটি অংশে ভাগ করলে প্রতিটি অংশ ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 1,000 গজ দূরত্বের আনুপাতিক হবে।

যদি বলা হত যে স্কেল লাইনটি এমন হওয়া প্রয়োজন যে তার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের 100 গজ পর্য্যন্ত মাপা যাবে, তাহলে স্কেল লাইনটির একেবারে বাঁদিকের প্রাথমিক অংশটিকে সমান দশটি ভাগে বিভাজিত করতে হত।

উদাহরণ 3

একটি মানচিত্রের স্কেল হচ্ছে 1/17,000—মানচিত্রটির জন্য এমন একটি রৈখিক স্কেল তৈরী কর যার সাহায্যে 100 গজ পর্য্যন্ত মাপা যেতে পারে।

মানচিত্রটির স্কেল 1/17000, অর্থাৎ মানচিত্রটিতে যে-দুটি বিন্দুর দূরত্ব 1

ইঞ্চি, ভূ-পৃষ্ঠে ঐ বিন্দু দুটোর দূরত্ব 17000 ইঞ্চি। তাহলে মানচিত্রটির 6 ইঞ্চি দূরত্ব জাহির করবে ভূ-পৃষ্ঠের 17000 × 6 বা 10,2000 ইঞ্চি।

$$10,2000 \text{ ইঞ্চি} = \frac{10,2000}{12 \times 3} \text{ গজ}$$

$$= 2833{\cdot}33 \text{ গজ}$$

এখন 2833·33 সংখ্যাটি একটি পূর্ণসংখ্যা নয়, তাই এটিকে কয়েকটি সমান পূর্ণসংখ্যায় ভাগ করাও চলবে না। 3000 সংখ্যাটি 2833·33 সংখ্যাটির নিকটতম এমন একটি পূর্ণসংখ্যা যাকে সহজেই সমান ছয়টি পূর্ণ-সংখ্যায় ভাগ করা চলে। 3000কে ছয় দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল দাঁড়ায় 500, অর্থাৎ যদি স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠের 3000 গজ দূরত্ব সূচিত করে, তাহলে স্কেল লাইনটির প্রতিটি অংশ 500 গজের আনুপাতিক হবে। 500 গজ সূচক একটি অংশকে সমান পাঁচভাগে বিভাজিত করলে, প্রতিটি অংশ ভূ-পৃষ্ঠের 100 গজ দূরত্ব জাহির করবে। অতএব স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য এমন হওয়া উচিত যা ভূ-পৃষ্ঠের 3000 গজ দূরত্বের আনুপাতিক হবে।

প্রদত্ত মানচিত্রটির স্কেল অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠের 2833·33 গজের আনুপাতিক স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে 6 ইঞ্চি। তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের 3000 গজের আনু-পাতিক স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য কত হওয়া উচিত? একটি সহজ অঙ্কের সাহায্যেই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। অঙ্কটি নীচে করে দেখান হল।

ভূ-পৃষ্ঠের 2833·33 গজ দূরত্বের আনুপাতিক স্কেল লাইনের দৈর্ঘ্য 6 ইঞ্চি

∴ ,, 1 গজ ,, ,, ,, ,, $\frac{6}{2833{\cdot}33}$ ইঞ্চি

∴ ,, 3000 গজ ,, ,, ,, ,, $\frac{6 \times 3000}{2833{\cdot}33}$ ইঞ্চি

= 6·35 ইঞ্চি

অতএব এক্ষেত্রে স্কেল লাইন তৈরী করার জন্য 6·35 ইঞ্চি দীর্ঘ একটি সরলরেখা এঁকে তাকে সমান ছয়টি অংশে বিভাজিত করতে হবে। প্রথম অংশটির ডান প্রান্তে বসবে 0 বিন্দু, তারপর ডানদিকের অংশগুলো ক্রমান্বয়ে 500, 1000, 1500, 2000 এবং 2500 দ্বারা চিহ্নিত হবে।

বাঁদিকের প্রথম অংশটিকে আবার সমান পাঁচটি অংশে বিভাজিত করতে

হবে। এই দ্বিতীয় বিভাজনের প্রতিটি অংশ ভূ-পৃষ্ঠের 100 গজের আনুপাতিক হবে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে উদাহরণ 2-এর ক্ষেত্রে স্কেল লাইনটি 3·98 ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল, আবার উদাহরণ 3-এর ক্ষেত্রে স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হল 6·35 ইঞ্চি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যদিও বলা হয় যে স্কেল লাইনের দৈর্ঘ্য 4 ইঞ্চি থেকে 6 ইঞ্চির মধ্যে হওয়া বিধেয়, প্রয়োজন হলে স্কেল লাইনের দৈর্ঘ্যে কিছু তারতম্য করাও চলে। অবশ্য স্কেল লাইনটি 6 ইঞ্চি দীর্ঘ হলেই ব্যবহারিক সুবিধা বেশী।

উদাহরণ 4

একটি মানচিত্রের স্কেল 1/100,000—এই মানচিত্রটির জন্য এমন একটি স্কেল লাইন তৈরী কর যাতে 1 ফার্লং দূরত্বও জাহির করা যায়।

প্রদত্ত মানচিত্রটির স্কেল 1/100,000।

অতএব মানচিত্রটির 1 ইঞ্চি : ভূ-পৃষ্ঠের 100,000 ইঞ্চি

$$= \frac{100,000}{12 \times 3 \times 1760} \text{ মাইল}$$

$$= 1·578 \text{ মাইল}$$

তাহলে মানচিত্রটির 6 ইঞ্চি : ভূ-পৃষ্ঠের 1·578 মাইল × 6 = 9·468 বা প্রায় 9·46 মাইল।

এখন স্কেল লাইনটি যদি 6 ইঞ্চি দীর্ঘ হয়, তাহলে মানচিত্রটির স্কেল অনুযায়ী সেটি ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 9·46 মাইলের আনুপাতিক হবে। 9·46 সংখ্যাটি পূর্ণসংখ্যা নয়, আর এই সংখ্যাটিকে সমান কয়েকটি পূর্ণসংখ্যায় ভাগ করাও চলবে না। 9 সংখ্যাটি কিন্তু 9·46 সংখ্যাটির নিকটতম একটি পূর্ণসংখ্যা, এবং এই সংখ্যাটিকে সমান নয়টি পূর্ণসংখ্যায় ভাগ করাও যায়। অতএব স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য এমন হওয়া উচিত যা ভূ-পৃষ্ঠের 9 মাইলের আনুপাতিক। তাহলে প্রয়োজনীয় স্কেল লাইনটি কত দীর্ঘ হওয়া উচিত?

ভূপৃষ্ঠের 9·46 মাইলের আনুপাতিক স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য 6 ইঞ্চি

∴ " 1 মাইলের " " " $\frac{6}{9·46}$ ইঞ্চি

∴ " 9 মাইলের " " " $\frac{6 \times 9}{9·46}$ ইঞ্চি

$= 5·70$ ইঞ্চি

অতএব 5·70 ইঞ্চি দীর্ঘ একটি স্কেল লাইন আঁকতে হবে। এই

লাইনটিকে সমান নয়টি অংশে বিভক্ত করলে, প্রতিটি অংশ ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইলের আনুপাতিক হবে। স্কেল লাইনের এই নয়টি অংশ হবে প্রাথমিক বিভাজন বা প্রাইমারীজ। সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাইমারিটিকে সমান আটটি ভাগে বিভাজিত করলে যে দ্বিতীয় বিভাজন বা সেকেণ্ডারীজগুলো পাওয়া যাবে তাদের প্রত্যেকটিই এক ফার্লং-এর আনুপাতিক হবে।

উদাহরণ 5

একটি মানচিত্রের স্কেল "4 ইঞ্চি মানে এক মাইল" —এই মানচিত্রটির জন্য এমন একটি স্কেল লাইন তৈরি কর যাতে ভূ-পৃষ্ঠের 100 গজ দূরত্বের আনুপাতিক অংশ থাকবে।

আলোচ্য মানচিত্রটির 4 ইঞ্চি ভূ-পৃষ্ঠের 1 মাইল বা 63,360 ইঞ্চির আনুপাতিক। তাহলে এই মানচিত্রটির স্কেলের প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ দাঁড়াচ্ছে $\frac{4}{63,360}$ বা $\frac{1}{15,840}$।

প্রদত্ত স্কেল অনুযায়ী মানচিত্রটির 4 ইঞ্চি ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল বা 1760 গজের আনুপাতিক, অর্থাৎ স্কেল লাইনটি যদি 4 ইঞ্চি দীর্ঘ হয় তবে সেটি ভূ-পৃষ্ঠের 1760 গজের আনুপাতিক হবে। 1760 সংখ্যাটি একটি পূর্ণসংখ্যা হলেও 4 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইনটিকে এমনভাবে বিভাজিত করা যাবে না যার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের 100 গজের আনুপাতিক কোন প্রাথমিক বা দ্বিতীয় বিভাজন তাতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে স্কেল লাইনটি যদি 6 ইঞ্চি দীর্ঘ হয় তাহলে সেটি হবে ভূ-পৃষ্ঠের 2640 গজের আনুপাতিক। দেখা যাচ্ছে যে 6 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইনটিকেও এমনভাবে বিভাজিত করা যাবে না যার প্রাথমিক বা দ্বিতীয় বিভাজন ভূ-পৃষ্ঠের 100 গজের আনুপাতিক হবে। অপর পক্ষে, ভূ-পৃষ্ঠের 2500 গজ দূরত্বের আনুপাতিক কোন স্কেল লাইন আঁকতে পারলে তাতে ভূ-পৃষ্ঠের 100 গজের আনুপাতিক অংশ পাওয়া সহজ। তাহলে প্রয়োজনীয় স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য কত হওয়া উচিত ?

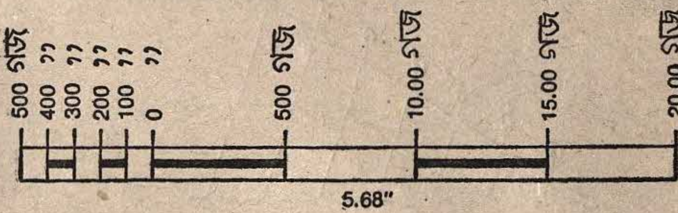
ভূপৃষ্ঠের 2640 গজ দূরত্বের অনুপাতিক স্কেল লাইন 6 ইঞ্চি দীর্ঘ

∴ " 1 " " " " $\frac{6}{2640}$ ইঞ্চি "

∴ " 2500 গজ " " " " $\frac{6 \times 2500}{2640}$ ইঞ্চি "

$= 5{\cdot}68$ ইঞ্চি দীর্ঘ

এবার 5·68 ইঞ্চি দীর্ঘ একটি সরল রেখা আঁকতে হবে। এই সরল-রেখাটিকে সমান পাঁচটি প্রাথমিক অংশে ভাগ করতে হবে—এই প্রাথমিক



চিত্র : 3·2

অংশগুলোর প্রত্যেকটি ভূ-পৃষ্ঠের 500 গজ দূরত্বের আনুপাতিক। এখন সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক অংশটিকে আবার সমান পাঁচটি অংশে বিভক্ত করতে হবে। এই দ্বিতীয় বিভাজনের প্রতিটি অংশই ভূ-পষ্ঠের 100 গজ দূরত্বের আনুপাতিক হবে (চিত্র 3·2 দ্রষ্টব্য)।

একটি সরলরেখাকে কী ভাবে কতকগুলো সমান অংশে ভাগ করা যায়

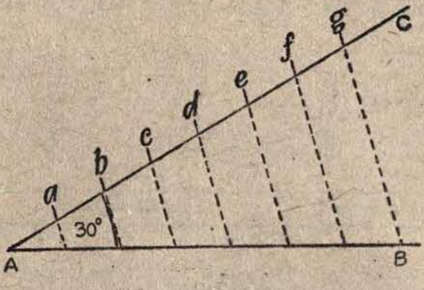
স্কেল লাইন তৈরী করতে হলেই একটি সরলরেখাকে নির্দিষ্ট কতকগুলো সমান অংশে ভাগ করতে হয়। তাই যে-কোন সরলরেখাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশে কী করে সমানভাবে ভাগ করা যায় তা নিয়ে একটু আলোচনা করা উচিত।

দুটো সহজ পদ্ধতিতে এই কাজটি করা যায়—(i) ডিভাইডারের সাহায্যে, এবং (ii) জ্যামিতিক পন্থায়।

(i) ডিভাইডারের সাহায্যে ভাগ করার পদ্ধতি

ধরা যাক AB সরলরেখাটিকে (চিত্র নং 3·3) সমান সাতটি অংশে ভাগ করতে হবে। এবার AB সরলরেখার A বিন্দুটিতে একটি সহজ কোণ (সাধারণতঃ 20 ডিগ্রী বা 30 ডিগ্রী) আঁকতে হবে। কোণ তৈরী করার জন্য A বিন্দু থেকে AC সরলরেখাটি আঁকতে হবে। AC সরলরেখাটির দৈর্ঘ্য যেন AB রেখাটির সমান বা তার চাইতে কিছু বেশী হয়। এবার ডিভাইডারের সাহায্যে AC রেখাটিতে A বিন্দু থেকে শুরু করে সমান দূরত্বে a, b, c, d, e, f, g বিন্দু সাতটির জায়গা ঠিক করতে হবে। এখন g

বিন্দুটিকে AB রেখার B বিন্দুটির সঙ্গে যুক্ত করে একটি সরলরেখা টানতে



চিত্র : 3·3

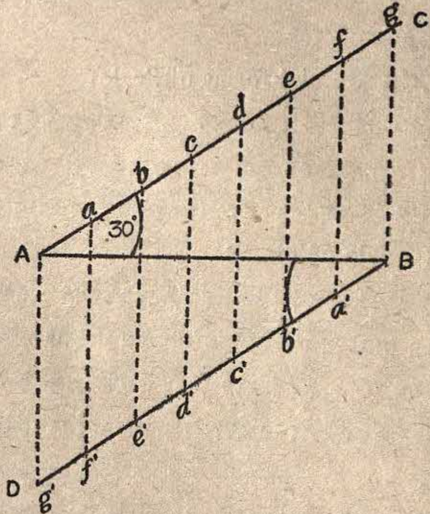
হবে। এবার gB রেখাটির সমান্তরাল করে AC রেখার f, e, d, c, b এবং a বিন্দু থেকে AB রেখার উপর ছয়টি রেখা টানতে হবে—তাহলেই AB রেখাটি সমান সাতটি অংশে বিভাজিত হবে। যদি এই বিভাজনগুলো AB রেখার প্রাথমিক বিভাজন হয়, তবে একই পদ্ধতিতে AB রেখার সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক বিভাজনটিকে দ্বিতীয় বিভাজনে অর্থাৎ সেকেণ্ডারীজে ভাগ করা যায়।

(ii) জ্যামিতিক পন্থায় ভাগ করার পদ্ধতি

জ্যামিতিক পন্থাটিতে আগের পদ্ধতিটির চাইতে অনেক বেশী যথাযথ-ভাবে একটি সরলরেখাকে সমান কয়েকটি অংশে ভাগ করা চলে। তবে এই পদ্ধতিটি আগের পদ্ধতিটির চাইতে কিছুটা জটিল, এবং এই পদ্ধতিতে একটু বেশী জায়গা লাগে।

আগের পদ্ধতিতে AB সরলরেখাটির A বিন্দুতে একটি সহজ কোণ (30 ডিগ্রী) করে AC সরলরেখাটি অাঁকা হয়েছিল—জ্যামিতিক পন্থাতেও তাই করতে হবে। উপরন্ত B বিন্দুতেও ঐ একই মাপের (অর্থাৎ 30 ডিগ্রী) মাপের একটি কোণ তৈরী করে BD রেখা অাঁকতে হবে—খেয়াল রাখতে হবে যে AB রেখার যেদিকে AC রেখাটি অাঁকা হয়েছে BD রেখাটি হবে তার বিপরীত দিকে (চিত্র 3·4 দ্রষ্টব্য)। তারপর আগের পদ্ধতিটির মতই A বিন্দু থেকে শুরু করে AC রেখাটিতে ক্রমান্বয়ে সমান দূরত্বে a, b, c, d, e, f, g বিন্দু সাতটির জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। তারপর আবার B বিন্দু থেকে শুরু করে ঐ একই মাপে a′, b′, c′, d′, e′, f′ এবং

g′ বিন্দুর জায়গা চিহ্নিত করতে হবে BD রেখাটির উপর। এবার AC রেখার a, b, c, d, e, f, g বিন্দুগুলোর সঙ্গে BD রেখার g′, f′, e′, d′, c′, b′ এবং a′ বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এই সংযোজক রেখাগুলো



চিত্র : 3·4

AB রেখাটিকে সমান সাতটি অংশে ভাগ করে দেবে। AB সরলরেখাটির এই বিভাজনগুলো হবে প্রাথমিক জিভাজন।

দ্বিতীয় বিভাজনের জন্য একই পদ্ধতিতে AB রেখার সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক বিভাজনটিকে ভাগ করতে হবে।

তুলনামূলক স্কেল (Comparative Scale)

যে কোন একটি মানচিত্রের স্কেলের প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশটি এক থাকলেও এফ. পি. এস. পদ্ধতি এবং সি. জি. এস পদ্ধতিতে অাঁকা স্কেল লাইন দুটো দুই রকমের হবে—কেননা তাদের দৈর্ঘ্য মাপার একক ভিন্ন ভিন্ন। তাই অনেক সময় এই দুই পদ্ধতিতে দুটো স্কেল লাইন এঁকে তাদের এমনভাবে পাশাপাশি রাখা হয় যে দুটো স্কেল লাইনের 0 বিন্দু এক জায়গায় থাকে। এই জাতীয় স্কেল লাইনকে বলা হয় 'তুলনামূলক স্কেল বা কম্প্যারাটিভ্ স্কেল (Comparative Scale)'।

তুলনামূলক স্কেল যে কেবলমাত্র এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে এবং সি. জি.

এস. পদ্ধতিতে অাঁকা দুটো স্কেল লাইনের সাহায্যেই তৈরী হয় তা নয়, যে-কোন দুটো ভিন্ন এককে তৈরী স্কেল লাইনের সাহায্যেই তুলনামূলক স্কেল গঠিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সামরিক কাজের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ ধরনের স্কেলের কথা নীচে আলোচনা করা হচ্ছে।

বিশেষ ধরনের স্কেল (Special forms of Scale)

অনেক সময় সামরিক কাজের জন্য দুটি বিন্দুর অন্তর্বর্তী ভৌগোলিক দূরত্বের চাইতে এক বিন্দু থেকে দ্বিতীয় বিন্দুটিতে পৌঁছতে কত সময় লাগে তাই বেশী গুরুত্ব পায়। তখন এক বিশেষ শ্রেণীর স্কেল ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে 'সময়ের স্কেল (Scale of Time)'।

সাধারণতঃ সৈনিকরা যে ছন্দে পদক্ষেপ করে চলে তাতে প্রতি কদমে তারা 30 ইঞ্চি দূরত্ব পার হয়। তাই অনেক সময় ইঞ্চি-ফুট-গজ ইত্যাদির একক না নিয়ে পদক্ষেপকেই একক ধরে নিয়ে একটি স্কেল তৈরী হয়। এই শ্রেণীর স্কেলকে বলা হয় 'পদক্ষেপের স্কেল বা স্কেল অব পেসেস (Scale of Paces)'।

সময়ের স্কেল ঃ ধরা যাক একটি সৈন্যবাহিনী ঘণ্টায় তিন মাইল গতিতে চলতে পারে। এই সৈন্যবাহিনীটির সময়ের স্কেল 'ঘণ্টায় তিন মাইল'।

এই সৈন্যবাহিনীটিকে এমন একটি মানচিত্র দেওয়া হল যার স্কেল দেখানো হয়েছে 1/100,000।

এখন এই দুটো স্কেলকে ভিত্তি করে একটি তুলনামূলক স্কেল লাইন অাঁকা যেতে পারে।

প্রদত্ত তথ্য অনুসারে মানচিত্রটির 1 ইঞ্চি ভূ-পৃষ্ঠের 100,000 ইঞ্চি বা 1·578 মাইলের আনুপাতিক। অতএব মানচিত্রটির 6 ইঞ্চি ভূ-পৃষ্ঠের $1{\cdot}57 \times 6$ বা 9·42 মাইলের আনুপাতিক।

অন্যদিকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সৈন্যদল 9 মাইল চলতে পারে তিন ঘণ্টায়। অতএব 6 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইন অাঁকলে এই দুটো তথ্যকে মিলিয়ে একটি স্কেল লাইন করা যাবে না। তাহলে স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য কত হওয়া উচিত ? স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য এমন হওয়া উচিত যা ভূ-ভৃষ্ঠের 9 মাইলের আনুপাতিক হবে। এই দৈর্ঘ্যটি নীচে লেখা পদ্ধতি অনুসারে

সহজেই বের করা যায়।

ভূ-পৃষ্ঠের 9·42 মাইলের আনুপাতিক স্কেল লাইনের দৈর্ঘ্য 6 ইঞ্চি

∴ ” 1 ” ” ” ” $\frac{6}{9 \cdot 42}$ ইঞ্চি

∴ ” 9 ” ” ” ” $\frac{6}{9 \cdot 42} \times 9$ ইঞ্চি

$= 5 \cdot 7$ ইঞ্চি

এবার 5·7 ইঞ্চি দীর্ঘ একটি সরলরেখা এঁকে তাকে সমান তিনটি অংশে বিভাজিত করতে হবে—প্রতিটি অংশের দৈর্ঘ্য হবে 1·9 ইঞ্চি এবং মানচিত্রের ঐ দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের তিন মাইলের আনুপাতিক, আবার সৈন্যদলটির পক্ষে ঐ দূরত্বটি অতিক্রম করতে সময় লাগবে এক ঘণ্টা।

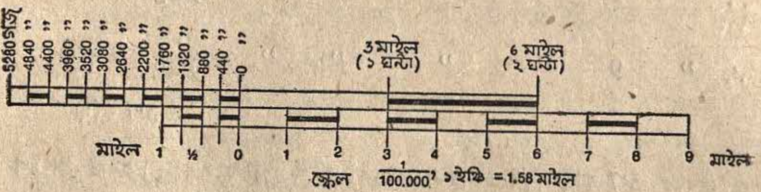
এখন এই স্কেল লাইনটির সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক বিভাজনটি সমান 12টি অংশে ভাগ করলে, প্রতিটি দ্বিতীয় বিভাজন জাহির করবে প্রতি 5 মিনিটে সৈন্যদল কতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে। সৈন্যদল ঘণ্টায় 3 মাইল বা 3 × 1760 গজ অর্থাৎ 5280 গজ যেতে পারে, অতএব 5 মিনিটে যেতে পারে 5280/12 গজ অর্থাৎ 440 গজ। স্কেল লাইনটিতে তিনটি প্রাথমিক বিভাজন করা হয়েছিল—এবার ঐ লাইনটির 0 বিন্দুর বাঁদিকে যথাক্রমে চিহ্নিত করতে হবে 440, 880, 1320, 1760, 2200, 2640, 3080, 3520, 3960, 4400, 4840 এবং 5280 গজ ; আর 0 বিন্দুর ডানদিকে ক্রমান্বয়ে 3 মাইল এবং 6 মাইল চিহ্নিত করতে হবে। প্রত্যেকটি দূরত্বসূচক সংখ্যার পাশে পাশে সময়ের সূচক অর্থাৎ 5 মিনিট, 10 মিনিট ইত্যাদি আবার 1 ঘণ্টা, 2 ঘণ্টা লিখে দিতে হবে। এভাবে যে স্কেল লাইনটি পাওয়া গেল সেটি আঁকা হল সময়ের স্কেল অনুযায়ী।

এবার মানচিত্রের স্কেল অনুযায়ী আরেকটি স্কেল লাইন আঁকতে হবে—তাতে প্রাথমিক বিভাজন করা হবে ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইলের অনুপাতে, এবং দ্বিতীয় বিভাজন করা দরকার $\frac{1}{4}$ মাইল, $\frac{1}{2}$ মাইল, $\frac{3}{4}$ মাইল ও 1 মাইল—এই চারটি ভাগে।

এখন দুটো স্কেল লাইনের 0 বিন্দুটি এক জায়গায় আনলে পাওয়া যাবে তুলনামূলক স্কেলের স্কেল লাইনটি (3·5 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

পদক্ষেপের স্কেল ঃ পদক্ষেপের স্কেল এবং মানচিত্রের স্কেলকে সমন্বিত

করেও তুলনামূলক স্কেল তৈরী করা কখনও কখনও আবশ্যক হয়। তুলনামূলক স্কেল তৈরী করার আগে জানা প্রয়োজন যে মানচিত্রের স্কেল ও পদক্ষেপের স্কেলের ভিত্তিতে কেমন করে পদক্ষেপের স্কেল লাইন আঁকা যায়।



চিত্র : 3·5

ধরা যাক সৈন্যরা প্রতি পদক্ষেপে 30 ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এবার একটি মানচিত্র দেওয়া হল যার স্কেল 1/15,840 ; এবং বলা হল এই দুই তথ্যের ভিত্তিতে একটি পদক্ষেপের স্কেল লাইন তৈরী করতে হবে। তাহলে কীভাবে স্কেল লাইনটি তৈরী করার জন্য এগুতে হবে ?

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মানচিত্রটির স্কেল 1/15,840 অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের 15,840 ইঞ্চি দূরত্ব মানচিত্রটির 1 ইঞ্চি দূরত্বের সমান। তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের 63,360 ইঞ্চি (অর্থাৎ এক মাইল) দূরত্ব মানচিত্রে $\frac{1 \times 63360}{15840}$ ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চির সমান। অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলা চলে যে, মানচিত্রটির স্কেল হচ্ছে “4 ইঞ্চি মানে 1 মাইল”। তাহলে স্কেল লাইনটি 6 ইঞ্চি লম্বা হলে সেটি ভূ-পৃষ্ঠের 2,640 গজ দূরত্ব জাহির করবে।

এবার দেখতে হবে 2,640 গজ সৈনিকদের কয়টি পদক্ষেপের সমতুল্য। আগেই বলা হয়েছে যে,

30 ইঞ্চি দূরত্ব = সৈনিকদের 1টি পদক্ষেপ।

$\therefore$ 2640 গজ দূরত্ব $= \frac{1}{30} \times 2640 \times 36$ ”

= 3,168 পদক্ষেপ।

3168 সংখ্যাটি একটি পূর্ণ সংখ্যা, কিন্তু এই সংখ্যাটিকে প্রয়োজনীয় কতগুলো সমান অংশে ভাগ করা কিছুটা অসুবিধাজনক। কিন্তু এই সংখ্যাটির নিকটতম এবং বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা 3000কে প্রয়োজনমত সমান অংশে ভাগ করা সহজ। তাহলে আলোচ্য স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য কত হবে ?

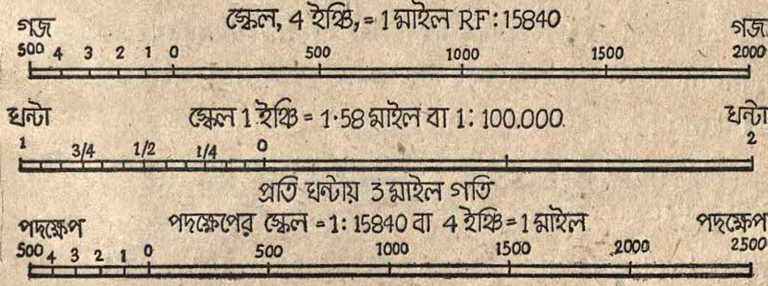
নীচে করে দেওয়া একটি অতি সহজ অঙ্কের সাহায্যে এই দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা চলে।

3168 পদক্ষেপ = মানচিত্রের 6 ইঞ্চি দূরত্ব

$\therefore$ 3000 ,, = ,, $\frac{6}{3168} \times 3000$,, ,,

= 5·68 ইঞ্চি

অতএব স্কেল লাইনটি হবে 5·68 ইঞ্চি দীর্ঘ, আর এই সরল রেখাটিকে সমান 6টি ভাগে বিভাজিত করলে প্রতিটি প্রাথমিক বিভাজন সৈনিকদের 500টি পদক্ষেপের আনুপাতিক হবে। সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক বিভাজন-টিকে সমান 5টি দ্বিতীয় বিভাজনে বিভক্ত করলে প্রতিটি দ্বিতীয় বিভাজন সৈনিকদের 100টি পদক্ষেপের আনুপাতিক হবে। তাই প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে 5·68 ইঞ্চি দীর্ঘ স্কেল লাইন এঁকে তাকে উপরে বর্ণিত প্রাথমিক ও দ্বিতীয় বিভাজনে বিভক্ত করতে হবে (3·6 চিত্র দ্রষ্টব্য)।



চিত্র : 3·6

এবার দেখা যাক পদক্ষেপের স্কেল ও মানচিত্রের স্কেল মিলিয়ে কেমন করে তুলনামূলক স্কেল তৈরী করা যায়।

ধরা যাক একটি সৈন্যদল 250টি পদক্ষেপে ভূ-পৃষ্ঠের 210 গজ দূরত্ব অতিক্রম করে, আবার ভূ-পৃষ্ঠের 210 গজ দূরত্ব প্রদত্ত মানচিত্রটির $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি দূরত্বের আনুপাতিক। এই তথ্যগুলোর ভিত্তিতে একটি তুলনামূলক স্কেল আঁকতে হবে। কেমন করে এটি করতে হবে তা নীচে করে দেখানো হচ্ছে।

(a) মানচিত্রের $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি সৈনিকদের 250 পদক্ষেপের আনুপাতিক

$\therefore$,, 1 ইঞ্চি ,, $\frac{250\times4}{3}$ পদক্ষেপের ,,

$\therefore$,, 6 ইঞ্চি ,, $\frac{250\times4\times6}{3}$ পদক্ষেপের ,,

$=2000$ পদক্ষেপের ,,

2000 সংখ্যাটি একটি পূর্ণসংখ্যা, এবং একে সহজেই প্রয়োজনীয় কয়েকটি সমান অংশে ভাগ করাও চলে।

(b) মানচিত্রের $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি ভূ-পৃষ্ঠের 210 গজের আনুপাতিক

$\therefore$ 1 ইঞ্চি ,, $\frac{210\times4}{3}$ গজের ,,

$\therefore$ 6 ইঞ্চি ,, $\frac{210\times4\times6}{3}$ গজের ,,

$=1680$ গজের ,,

1680 একটি পূর্ণসংখ্যা হলেও একে প্রয়োজনীয় অংশ কয়টিতে সমানভাবে ভাগ করা খুব সুবিধাজনক নয়। এই সংখ্যাটির নিকটতম একটি বৃহৎ পূর্ণসংখ্যা হচ্ছে 1500 যা সহজেই প্রয়োজনীয় কয়টি অংশে সমানভাবে ভাগ করা চলে।

এখন দেখতে হবে ভূ-পৃষ্ঠের 1500 গজের আনুপাতিক স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য কত হবে।

ভূপৃষ্ঠের 1680 গজের আনুপাতিক স্কেল লাইনটি 6 ইঞ্চি দীর্ঘ

$\therefore$,, 1 গজের ,, ,, ,, $\frac{6}{1680}$ ইঞ্চি ,,

$\therefore$,, 1500 গজের ,, ,, ,, $\frac{6\times1500}{1680}$ ইঞ্চি ,,

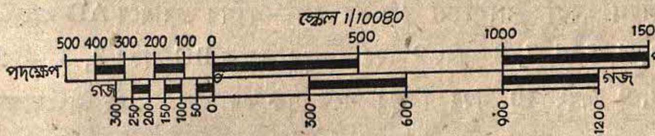
$=5{\cdot}357$ ইঞ্চি ,,

এবার প্রথমে 6 ইঞ্চি দীর্ঘ একটি সরলরেখা এঁকে তাকে সমান 4টি ভাগে খণ্ডিত করতে হবে—এগুলো হল প্রাথমিক বিভাজন। সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক বিভাজনটি আবার সমান 5টি দ্বিতীয় বিভাজনে ভাগ করা হোক। এবার স্কেল লাইনটি 0 বিন্দুটির বাঁদিকে যথাক্রমে 100, 200, 300, 400 এবং 500 চিহ্নিত করা হক, আর 0 বিন্দুটির ডানদিকে 500, 1000 এবং

1500 দিয়ে চিহ্নিত করা হক—এই সব সংখ্যাগুলো সৈনিকদের পদক্ষেপের সংখ্যা সূচিত করছে। অর্থাৎ এই স্কেল লাইনটি হল পদক্ষেপের স্কেল লাইন।

এখন 5·35 ইঞ্চি দীর্ঘ আরেকটি সরল রেখা আঁকতে হবে। এই সরল-রেখাটিকে সমান 5টি প্রাথমিক বিভাজনে বিভক্ত করতে হবে। সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক বিভাজনটির ডান সীমান্তে যথারীতি 0 বিন্দুটি বসবে। এবারে 0 বিন্দুটির ডানদিকে যে 4টি প্রাথমিক বিভাজন আছে সেগুলোকে যথাক্রমে 300, 600, 900 এবং 1200 দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। আর সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক বিভাজনটিকে সমান 6টি দ্বিতীয় বিভাজনে বিভক্ত করতে হবে। 0 বিন্দুটির বাঁদিকে দ্বিতীয় বিভাজনগুলোকে যথাক্রমে 50, 100, 150, 200, 250 এবং 300 দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। এখন যে স্কেল লাইনটি তৈরী হল তার ভিত্তি হচ্ছে মানচিত্রটির স্কেল। এই স্কেল লাইনটির প্রাথমিক ও দ্বিতীয় বিভাজনগুলো ভূ-পৃষ্ঠের গজের এককে দূরত্বের আনুপাতিক।

এখন লক্ষ্য করতে হবে যে পদক্ষেপের স্কেল অনুযায়ী গঠিত স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য আর মানচিত্রের স্কেল অনুসারে গঠিত স্কেল লাইনটির দৈর্ঘ্য এক নয়। তাহলে তুলনামূলক স্কেল কি করে তৈরী হবে? কাজটি একটু



চিত্র : 3·7

জটিল। পদক্ষেপের স্কেল অনুসারে তৈরী লাইনটির ঠিক নীচে মানচিত্রের স্কেল অনুযায়ী তৈরী স্কেল লাইনটিকে এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে দুটো স্কেল লাইনেরই 0 বিন্দু দুটো একই জায়গায় বসে (3·7 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

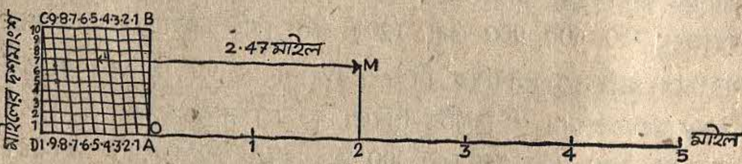
কর্ণমাপনী বা তির্যক স্কেল বা ডায়াগোনাল স্কেল (Diagonal Scale)

এই স্কেলের সাহায্যে এক এককের শতাংশ অর্থাৎ দশমিক বিন্দুর পর দুই ঘর পর্যন্ত মাপা যায়। স্কেল লাইনের দ্বিতীয় বিভাজনকে ছোট ছোট অংশে

ভাগ করে এই মাপনী পেতে হয়।

এই মাপনী তৈরী করার পদ্ধতিটি বিশেষ জটীল নয়। পদ্ধতিটি একটি উদাহরণের সাহায্যে নীচে বোঝান হয়েছে।

ধরা যাক একটি মানচিত্রের স্কেল 1/63,360 অর্থাৎ মানচিত্রটির এই ইঞ্চি দূরত্ব ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্বের আনুপাতিক। এই মানচিত্রটির জন্য যে স্কেল লাইনটি আঁকা হয়েছে সেটি 6 ইঞ্চি দীর্ঘ (3·8 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

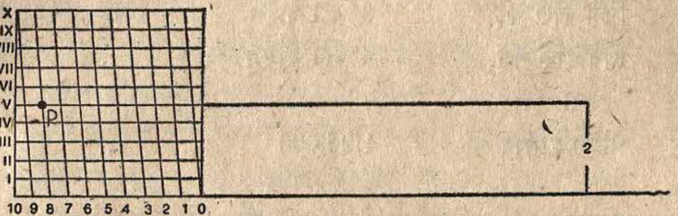


চিত্র : 3·8

স্কেল লাইনটি চারটি প্রাথমিক বিভাজনে ভাগ করা হয়েছে। এখন সবচেয়ে বাঁদিকের প্রাথমিক বিভাজনটির উপর ABCD নামক একটি বর্গক্ষেত্র তৈরী করা হল যার প্রতিটি বাহু প্রাথমিক বিভাজনটির সমান। এই বর্গক্ষেত্রের AD বাহু এবং BC বাহু দুটোকে সমান দশটি অংশে খণ্ডিত করা হল। এবার AD বাহুর O বিন্দুটির সঙ্গে BC বাহুর 1 নম্বর বিন্দুটিকে তেরছাভাবে একটি সরল রেখার সাহায্যে যুক্ত করা হল—এরপর ক্রমান্বয়ে AD বাহুটির 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং 9 নম্বর বিন্দুগুলোকে BC বাহুর 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এবং 10 নম্বর বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করা হল। এই সংযোজক রেখাগুলো যদিও তেরছা কিন্তু তারা পরস্পর সমান্তরাল। এবার AB এবং DC বাহু দুটোকেও সমান দশটি খণ্ডে ভাগ করা হল—এখানে কিন্তু AB রেখার 1 নম্বর বিন্দুটির সঙ্গে DC রেখার 1 নম্বর বিন্দুটিকে একটি সরলরেখার সাহায্যে যুক্ত করতে হবে। তারপর AB এবং DC রেখাদুটোর সমান চিহ্নিত বিন্দুগুলোকে পরস্পর যুক্ত করতে হবে—এই সংযোজক রেখাগুলো পরস্পর সমান্তরাল হবেই, এমনকি স্কেল লাইনটির সঙ্গেও সমান্তরাল হবে।

এখন যদি ·85 ইঞ্চি মাপতে হয় তাহলে AB রেখার 8 নম্বর বিন্দুতে এসে নীচ থেকে উপরের দিকে 5 নম্বর রেখা পর্যন্ত যেতে হবে—চিত্রে দেখানো P বিন্দুটির দূরত্ব স্কেল লাইনটির 0 বিন্দু থেকে ·85 ইঞ্চি (3·9 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এতক্ষণ যদিও সব কথা ইঞ্চির একককে ভিত্তি করে আলোচিত হল, যে-কোন এককের স্কেলেই কিন্তু কর্ণমাপনী এই একই পদ্ধতিতে তৈরী করা যায়,



চিত্র : 3·9

এবং কর্ণমাপনীর সাহায্যে যে কোন এককেই দশমিক বিন্দুর পর দুই ঘর পর্যন্ত অতি সহজেই মাপা চলে।

স্কেলের ভিত্তিতে মানচিত্রের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of maps on the basis of scales)

যে সব মানচিত্রে ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্বকে এক ইঞ্চি বা তার কম দূরত্বে দেখানো হয়, সে সব মানচিত্রকে বলা হয় 'ছোট স্কেলের মানচিত্র (Small Scale Map)'। ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল দূরত্ব বোঝাবার জন্য এক ইঞ্চির বেশী দূরত্ব যে-সব মানচিত্রে ব্যবহৃত হয় সে সব মানচিত্রকে বলা হয় 'বড় স্কেলের মানচিত্র (Large Scale Map)'। ভূ-পৃষ্ঠের যত বিস্তারিত তথ্য বড় স্কেলের মানচিত্রে দেখানো সম্ভব হয়, ছোট স্কেলের মানচিত্রে স্বভাবতঃই ততটা হয় না।

সামরিক বাহিনীতে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কেলের মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যে সব শ্রেণীর মানচিত্র ব্যবহৃত হয় তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হল।

মানচিত্রের সাধারণ নাম	মানচিত্রের স্কেল	মানচিত্রের শ্রেণী
মিলিয়ন শীট্	1/1,000,000	ছোট স্কেল
ডিগ্রী শীট্ বা কোয়ার্টার ইঞ্চি শীট্	1″ = 4 মাইল	,,
আধা ইঞ্চি শীট্	1″ = 2 মাইল	,,

মানচিত্রের সাধারণ নাম	মানচিত্রের স্কেল	মানচিত্রের শ্রেণী
এক ইঞ্চি শীট্	1″=1 মাইল	ছোট স্কেল
তিন ইঞ্চি শীট্	3″=1 মাইল	বড় স্কেল
চার ইঞ্চি শীট্	4″=1 মাইল	,,
বা		
পঁচিশ হাজার শীট্	1/25,000	,,

প্রশিক্ষণ ও পদাতিক বাহিনীর সাধারণ কাজের জন্য এক ইঞ্চি শীটের মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। বাস্তব ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে মানচিত্রের এই স্কেলটিকে প্রমাণ (standard) স্কেল বলা চলে। সিকি ইঞ্চি শীটের মানচিত্র এবং আধা ইঞ্চি শীটের মানচিত্র সাধারণতঃ যোগাযোগ বা সঞ্চার ব্যবস্থা (communication) করতে এবং চলমান যুদ্ধকার্যে (mobile operations) প্রয়োজন হয়। রণকৌশল (strategy) ঠিক করতে, সৈন্যবাহিনীর যাবার পথ স্থির করতেও এই দুই শ্রেণীর মানচিত্র কাজে লাগে। নৌবহর এবং বিমানবাহিনী সাধারণতঃ মিলিয়ন শীটের মানচিত্র ব্যবহার করে। অপর পক্ষে গোলন্দাজ বাহিনী সচরাচর যে-সব মানচিত্র ব্যবহার করে তাদের স্কেল '2·53″=এক মাইল'। বড় স্কেলের মানচিত্রগুলো লাগে কাছাকাছির যুদ্ধে (Close Quarters Battle)।

স্কেলের সাহায্যে দূরত্ব মাপা (Measuring distance with the aid of scales)

এতক্ষণ যে-সব আলোচনা করা হল তাতে বেশ কয়েকরকম স্কেলের কথা জানা গেল। মানচিত্রের উপর দুটো বিন্দুর দূরত্ব স্কেল লাইনের সাহায্যে মাপা যায়। আবার দুটো বিন্দুর মানচিত্রগত দূরত্ব জানা থাকলে, ভূ-পৃষ্ঠের ঐ বিন্দু দুটোর অন্তর্বর্তী দূরত্বও জানা যায়।

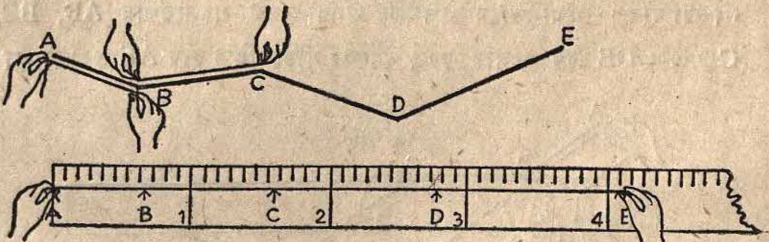
স্কেল লাইনের সাহায্যে মানচিত্রের উপর দুটি বিন্দুর দূরত্ব কীভাবে মাপা যায় তা প্রথমে বলে নেওয়া হচ্ছে।

মানচিত্রের উপর একটি বিন্দু থেকে দ্বিতীয় বিন্দুটিতে যাবার পথ যদি একটি সরলরেখায় হয়, তবে ঐ বিন্দু দুটোর দূরত্ব মাপা খুবই সোজা। যে কোন একটি কাগজকে সোজা করে ভাঁজ করে প্রথম বিন্দু এবং দ্বিতীয় বিন্দুর

পাশে ফেলে কাগজটির ধার বরাবর বিন্দু দুটোর অবস্থিতি চিহ্নিত করতে হবে। এবার দুই বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত সরলরেখাটি স্কেল লাইনের উপর ফেলে বিন্দুদুটোর মানচিত্রগত দূরত্ব মেপে নেওয়া যেতে পারে। যদি হাতের কাছে কাগজ-পেন্সিল না থাকে তা হলে শুধুমাত্র ঘাসের একটি সোজা নল হলেও চলবে—নলটির একটি প্রান্ত প্রথম বিন্দুটিতে স্থির রেখে দ্বিতীয় বিন্দু পর্যন্ত নলটি রাখতে হবে—নলটির বাড়তি অংশ ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এবার ঘাসের নলটিকে স্কেল লাইনে ফেললেই নলটির দৈর্ঘ্য মাপা যাবে; আর নলটির দৈর্ঘ্যই হচ্ছে বিন্দুদুটোর মানচিত্রগত দূরত্ব। তবে কাজটি সবচেয়ে সহজ হয় সঙ্গে একটি ডিভাইডার থাকলে। ডিভাইডারের একটি পা প্রথম বিন্দুটিতে স্থির রেখে দ্বিতীয় পাটি দ্বিতীয় বিন্দু পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে। এইবার ডিভাইডারের পাদুটো স্কেল লাইনের উপর রাখলেই তাদের দূরত্ব, অর্থাৎ মানচিত্রের উপর বিন্দুদুটোর দূরত্ব জানা যাবে।

যদি মানচিত্রের উপর দুটো বিন্দুর সংযোগপথটি সরলরেখার মত না হয়ে আঁকাবাঁকা হয় তাহলে একটি সুতো বা একটি কাগজের সাহায্যে বিন্দু-দুটোর অন্তর্বর্তী দূরত্ব মাপা যায়।

(i) সুতোর সাহায্যে মাপা: বিন্দুদুটোর সংযোগপথের উপর সুতোটিকে এমনভাবে ফেলতে হবে যে সুতোটির একটি প্রান্ত থাকবে প্রথম

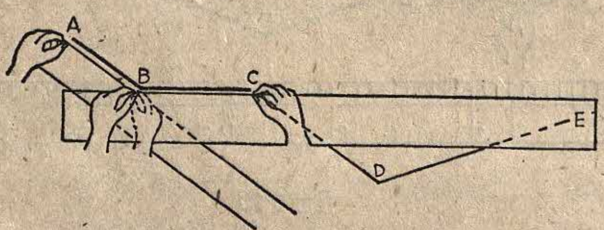


চিত্র 3·10

বিন্দুটিতে এবং আঁকাবাঁকা সংযোগপথটির সমস্ত বাঁক-মোড় সহ গোটা পথটি পেরিয়ে সুতোটি গিয়ে পৌছবে দ্বিতীয় বিন্দুটিতে। সুতোটির বাড়তি কিছু অংশ থাকলে তা কেটে ফেলতে হবে, আর লক্ষ্য রাখতে হবে যে সুতোটির যে অংশটি সংযোগপথের উপর থাকবে তা যেন কোথাও সামান্য কুঁচকে না থাকে—অর্থাৎ সুতোটি থাকবে সংযোগপথের উপর টান টান হয়ে। এবার সুতোটি তুলে নিয়ে স্কেল লাইনের উপর রাখলেই সুতোটির দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ

মানচিত্রস্থ বিন্দু দুটোর মানচিত্রগত দূরত্ব, মাপা যাবে।

(ii) **কাগজের সাহায্যে ঃ** আঁকাবাঁকা সংযোগপথের দূরত্ব কাগজের সাহায্যে মাপতে হলে পথটির সব বাঁক-মোড় ইত্যাদি A, B, C, D ইত্যাদি পৃথক পৃথক নামে চিহ্নিত করতে হবে। ধরা যাক্ মানচিত্রস্থিত দুটো বিন্দুর আঁকাবাঁকা সংযোগপথটি শুরু হয়েছে A বিন্দু থেকে, আর শেষ হয়েছে গিয়ে E বিন্দুতে। পথটির মধ্যে প্রথম বাঁক পাওয়া যাচ্ছে B বিন্দুতে, অর্থাৎ A বিন্দু থেকে B বিন্দু পর্যন্ত একটি সরলরেখা পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী বাঁকগুলোর নাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে C এবং D। AB যেমন একটি সরলরেখা, তেমনি BC, CD এবং DE রেখা তিনটিও সরলরেখা। এবার একটি সরলরেখা বরাবর সোজাভাবে ভাঁজ করা কাগজ ও একটি পেন্সিল নিতে হবে। কাগজটির ভাঁজ করা ধার বরাবর AB সরলরেখার পাশে ফেলে পেন্সেল দিয়ে কাগজটির ভাঁজ করা ধারের উপর যথাক্রমে A এবং B বিন্দুদুটোর অবস্থিতি চিহ্নিত করতে হবে। তারপর কাগজটিকে এমনভাবে ঘোরাতে হবে যেন কাগজের ভাঁজ করা ধারের B বিন্দুটি মানচিত্রের B বিন্দুতেই থাকে, আর কাগজের সোজা দিকটি থাকে মানচিত্রের BC রেখাটির পাশে, লক্ষ্য রাখতে হবে যে কাগজের A বিন্দুটির অবস্থিতি যেন এমন হয় যে কাগজের AB রেখাটিকে সোজা টেনে দিলেই যেন BC রেখা পাওয়া যায়। এমনিভাবে কাগজটির উপর একই সরলরেখায় AB, BC, CD এবং DE রেখাগুলোর দূরত্ব পরস্পর সন্নিবেশিত হয়ে AE একটি সরল-



চিত্র ঃ 3·11

রেখা পাওয়া যায়। এবার কাগজের AE সরলরেখাটিকে মানচিত্রে মুদ্রিত স্কেল লাইনটির পাশে রাখতেই AE রেখার দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ মানচিত্রের A বিন্দু থেকে E বিন্দু পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথটির দৈর্ঘ্য, মাপা যাবে (3·11 চিত্র দ্রষ্টব্য)

এই সব পদ্ধতিতে মানচিত্রস্থিত দুটো বিন্দুর মানচিত্রগত দূরত্ব জানা যায়। দুটোবিন্দুর মানচিত্রগত দূরত্ব মাপা হলে মানচিত্রের স্কেলের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে ঐ বিন্দুদুটোর দূরত্ব বের করা যায়। তারও কয়েকটি সহজ পদ্ধতি আছে—সেগুলো নীচে বলা হল।

(a) **বিবরণের সাহায্যে :** একটি মানচিত্রে স্কেলের বিবরণে দেওয়া আছে "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল"। সেই মানচিত্রটিতে দুটো বিন্দুর দূরত্ব $2\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে বিন্দুদুটোর অন্তর্বর্তী দূরত্ব কত ?

যেহেতু মানচিত্রের 1 ইঞ্চি মানে ভূ-পৃষ্ঠের 1 মাইল,
সেহেতু " $2\frac{1}{2}$ ইঞ্চি " " $1 \times 2{\cdot}5$ মাইল
$= 2{\cdot}5$ মাইল

(b) **প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশের সাহায্যে :** যদি কোন মানচিত্রের স্কেল দেওয়া থাকে 1/126, 720, এবং ঐ মানচিত্রে A বিন্দু থেকে B বিন্দুর দূরত্ব মেপে দেখা গেছে 2·5 ইঞ্চি, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ঐ বিন্দুদুটোর মধ্যেকার দূরত্ব কত ?

প্রদত্ত স্কেল অনুযায়ী মানচিত্রের 1 ইঞ্চি দূরত্ব বোঝায় ভূ-পৃষ্ঠের 126,720 ইঞ্চি দূরত্ব। তাহলে মানচিত্রের 2·5 ইঞ্চি দূরত্ব বোঝাবে ভূ-পৃষ্ঠের

$126{,}720 \times 2{\cdot}5$ ইঞ্চি
$= 316{,}800$ ইঞ্চি
$= \frac{316{,}800}{12 \times 3}$ গজ
$= 8800$ গজ।

উদাহরণ 2

একটি মানচিত্রের স্কেল 1/253440, এবং ঐ মানচিত্রটির দুটো বিন্দুর দূরত্ব 5·3 মিলিমিটার—ভূ-পৃষ্ঠের ঐ বিন্দুদুটোর অন্তর্বর্তী দূরত্ব কত ?

প্রদত্ত স্কেল অনুযায়ী,

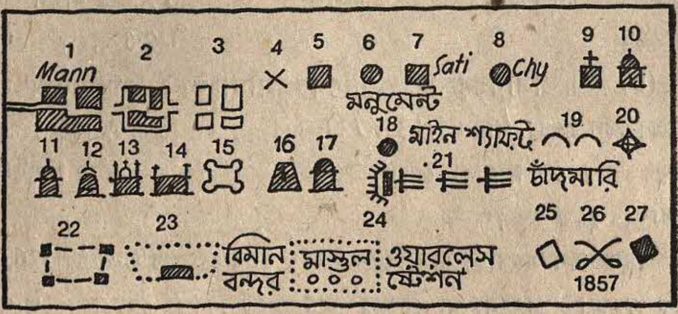
মানচিত্রের 1 মি. মি. ভূ-পৃষ্ঠের 253,440 মি. মি. বোঝায়
∴ " 5·3 মি. মি. " $253440 \times 5{\cdot}3$ মি. মি. "
$= 1343232{\cdot}0$ মি. মি.
$= 1343{\cdot}2322$ মিটার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

(Conventional Signs)

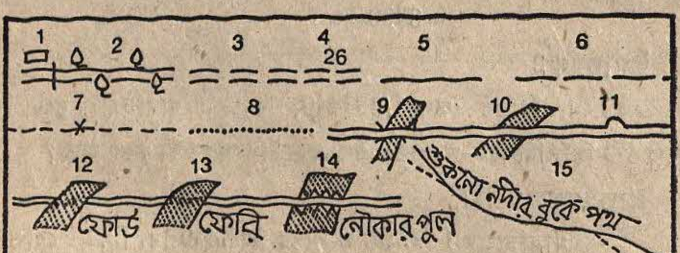
ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশটির স্থানবিবরণ-বিষয়ক মানচিত্র আঁকা হয় সেই অংশের বিবরণ সম্পূর্ণ করার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের সেই অংশটিতে যা কিছু প্রাকৃতিক বিষয়—যেমন গাছ-বন-নদী-ঝর্ণা ইত্যাদি—এবং মানুষের তৈরী বস্তু অর্থাৎ রাস্তা-ঘাট-বাড়ী ইত্যাদি আছে তা সবই মানচিত্রটিতে প্রতিফলিত হওয়া



চিত্র : 4·1

মানুষের তৈরী বিভিন্ন বাড়ী-গ্রাম ইত্যাদি

উচিত। অথচ মানচিত্রের আয়তন সব সময়ই ভূ-পৃষ্ঠের আয়তনের চাইতে অনেক ছোট হয়—তাই ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক এবং মানুষের তৈরী যা কিছু

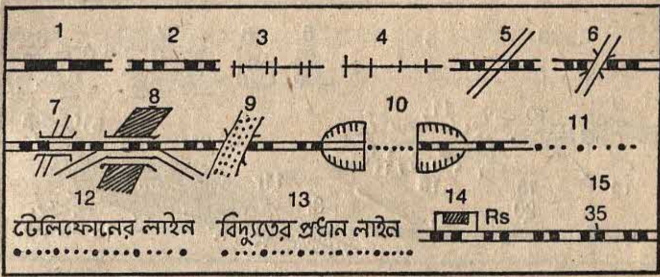


চিত্র : 4·2

বিভিন্ন ধরণের পথ

আছে সব কিছুর ছবি মানচিত্রটির উপর আঁকা সম্ভব হয় না। তাহলে কি

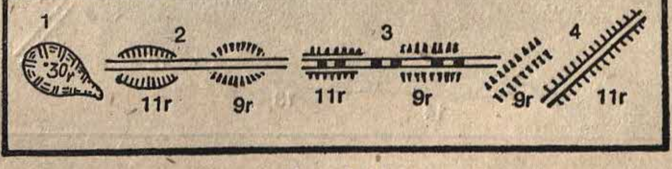
করে একটি মানচিত্রকে ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিনিধিত্বমূলক করে তোলা যায়? এই সমস্যাটির মীমাংসা করার জন্যই সাঙ্কেতিক চিহ্নের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি



চিত্র : 4·3

বিভিন্ন ধরণের রেলপথ এবং যোগাযোগের লাইন

প্রাকৃতিক বিষয় ও মানুষের তৈরী বস্তুর জন্য এক একটি বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু একই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকার নিজ নিজ দেশে বিশেষ কোন সংস্থাকে স্বদেশে ব্যবহারের জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন তৈরী করার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তবে মোটামুটিভাবে সব রাষ্ট্রই সাঙ্কেতিক চিহ্ন তৈরীর ব্যাপারে কতগুলো রীতিনীতি মেনে চলেন। তাই এক দেশের সাঙ্কেতিক চিহ্ন জানা

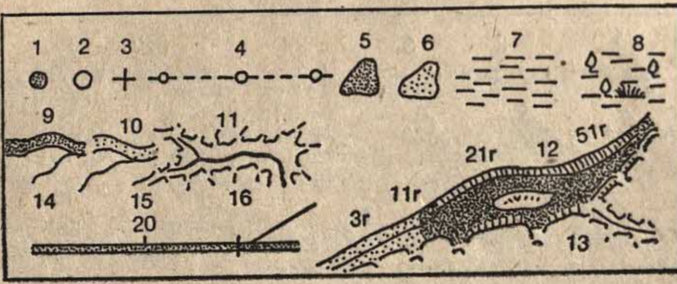


চিত্র : 4·4

পাহাড়ী অঞ্চলে রেলপথ

থাকলে অন্য রাষ্ট্রের সাঙ্কেতিক চিহ্ন—বিশেষতঃ অসামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন অনুধাবন করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভারতে অসামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন তৈরী করার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে 'দ্য সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (The Survey of India)' সংস্থাটির উপর। সামরিক বস্তু বোঝাবার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলো যেসব বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেন সেগুলো তৈরী হয় প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর বিশেষ কার্যালয়ে। নিরাপত্তার

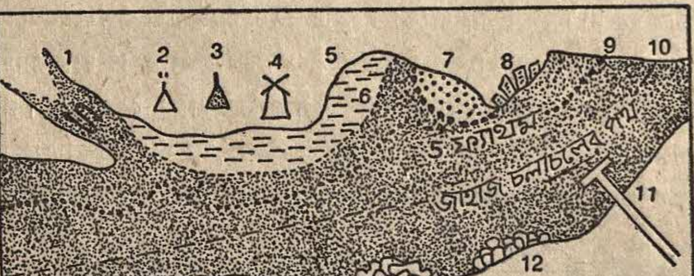
কারণেই সামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হয়। তাই সাধারণতঃ দ্য সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মুদ্রিত মানচিত্রগুলোতে সামরিক সাঙ্কেতিক



চিত্র : 4·5

বিভিন্ন প্রকারের জলাশয়

চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না, কেবল অসামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোর সাহায্যেই স্থানবিবরণ বিষয়ক মানচিত্রগুলো তৈরী হয়। খালি চোখে দেখে মোটামুটি



চিত্র 4·6

সমুদ্রপথ এবং ঐ পথে চলাচলে সাহায্যকারী বিভিন্ন সহায়ক

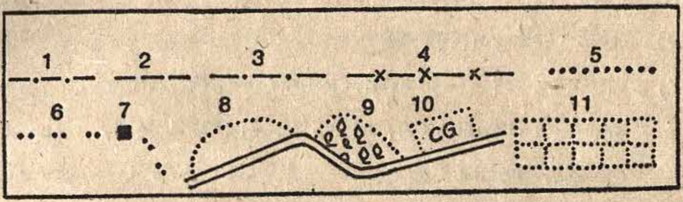
চোখের আন্দাজে কোন জায়গার নক্সা অাঁকতেও সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—

(ক) স্থানবিবরণ বিষয়ক মানচিত্রগুলোতে ব্যবহৃত অসামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন,

(খ) প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর ব্যবহারের জন্য সামরিক বস্তুগুলোর

সামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন,
এবং (গ) নক্সা আঁকার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

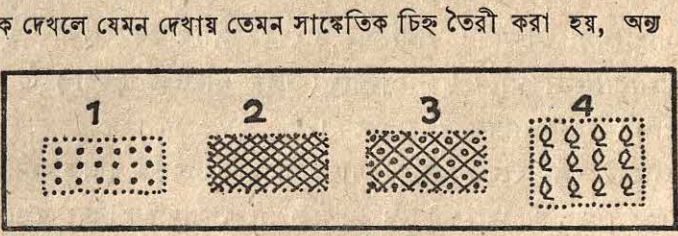
সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো তৈরী করার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখা হয়। যে বস্তুটির জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্নটি তৈরী হচ্ছে সেই বস্তুটির সঙ্গে যেন



চিত্র : 4·7

বিভিন্ন ধরণের সীমারেখা

সাঙ্কেতিক চিহ্নটির নিকট সাদৃশ্য থাকে। সাঙ্কেতিক চিহ্নটি যেন সহজ সরল হয়—অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিই যেন সেই চিহ্নটি আঁকতে পারে। এখানে একটি কথা বলা উচিত যে কেবলমাত্র গাছপালার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে পাশ থেকে দেখলে যেমন দেখায় তেমন সাঙ্কেতিক চিহ্ন তৈরী করা হয়, অন্য সব



চিত্র : 4·8

চার প্রকারের বাগান

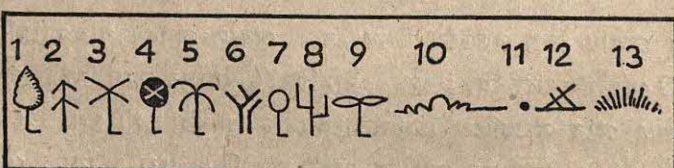
বস্তুর বেলায় কিন্তু বস্তুটিকে উপর থেকে দেখলে যেমন দেখায় সাঙ্কেতিক চিহ্নটি সেইরকম করা হয়। আর মানচিত্রটির স্কেলের সঙ্গে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য রেখে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোকে ছোট বড় করা হয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে একেবারে স্কেল অনুযায়ী সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকতে গেলে সেগুলো এত ছোট হয়ে যাবে যে তা দেখে কিছুই বোঝা যাবে না।

মানচিত্র মুদ্রণের সময় সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোর জন্য বিশেষ বিশেষ রঙের ব্যবহার প্রচলিত আছে ; সেগুলোর ছোট্ট একটি তালিকা পর-পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

বিষয়বস্তু	রঙ
(i) সীমানা—রাষ্ট্রের, অঙ্গরাজ্যের, জিলা, ইত্যাদির জন্য	কালো
(ii) নদী, উপনদী, খাল, বিল, প্রভৃতি জলাশয়ের জন্য	নীল
(iii) ক্ষেত, ফলের বাগান, বন-উপবনের জন্য	সবুজ
(iv) একক বিক্ষিপ্ত গাছের জন্য	সবুজ
(v) মানুষের তৈরী বাসস্থান, গ্রাম, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা—অর্থাৎ উপাসনার স্থান, গুলি চালানো শিক্ষার স্থান, যুদ্ধক্ষেত্র, প্রভৃতির জন্য	লাল
(vi) যে-কোন রকমের রাস্তার জন্য	লাল
(vii) রেলপথ, টেলিগ্রাফের লাইন, বাঁধ, পাহাড়কাটা সড়ক (cutting), ইত্যাদির জন্য	কালো
(ix) পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির জন্য	পিঙ্গল
(x) ত্রিকোণোমিতিক চিহ্নের জন্য	কালো

সাধারণতঃ যে-মুদ্রিত মানচিত্রটিতে যেসব সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সেই মানচিত্রটির নীচে দুটি জায়গায় (প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ঐ সব সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে।

আগেই বলা হয়েছে যে দ্য সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক মুদ্রিত মানচিত্র-গুলোতে কেবল অসামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকে, সামরিক বিষয়বস্তুগুলোর কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকে না। তাই প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোতেও মানচিত্র-পাঠ শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে সামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো দেখানো সম্ভব হয়



চিত্র : 4·9

বিভিন্ন প্রকারের গাছ

না। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্যই সেই চিহ্নগুলোর সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। কাজের প্রয়োজনে মুদ্রিত মানচিত্রগুলোর উপর রঙীন পেন্সিল দিয়ে

সামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো এঁকে নেওয়া হয়। তবে বেশীরভাগ সময় মানচিত্রের উপর চিহ্নগুলো না এঁকে ফ্ল্যাগপিনের সাহায্যে মানচিত্রের উপর সামরিক সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোকে বসিয়ে প্রয়োজন মেটান হয়।

সংক্ষিপ্ত শব্দ (Abbreviation)

অনেক সময় কতকগুলো বস্তুর সাঙ্কেতিক চিহ্ন এক রকম হয়ে যায়—যেমন পুলিশ ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস, ডাকবাংলো, ইত্যাদি। তখন চিহ্নটির পাশে উপযুক্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ বসিয়ে বস্তুটিকে বোঝান হয়। সচরাচর যেসব বস্তুর জন্য বিশেষ বিশেষ সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করা হয় তাদের একটি ছোট্ট তালিকা নীচে দেওয়া হল—
পুলিশ ষ্টেশন : PS ; পোষ্ট অফিস : PO ; টেলিগ্রাফ অফিস : TO ; পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস : PTO ; ডাকবাংলো : DB ; রেস্ট হাউস : RH ; রেলওয়ে ষ্টেশন : RS ; ট্র্যাভেলার্স বাংলো : TB ; ইন্সপেকশন বাংলো : IB ; পেট্রল ডাম্প : PD ; সংরক্ষিত বন (Reserved Forest) : RF ; ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড : CG।

যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপারে যুদ্ধক্ষেত্রের সাঙ্কতিক চিহ্ন এঁকে তার পাশে একটি খ্রীষ্টাব্দ লেখা থাকে—খ্রীষ্টাব্দটি থেকে বোঝা যায় যে ঐ বিশেষ যুদ্ধক্ষেত্রটিতে কোন খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ হয়েছিল (চিত্র 4·1-এর 26 নম্বর ছবি দ্রষ্টব্য)।

1	2	3	4
△212	·212	BM·212	12 r

চিত্র : 4·10

বিক্ষিপ্ত পাহাড়ের উচ্চতা জাহির করার বিভিন্ন পদ্ধতি

সাঙ্কেতিক চিহ্নের ছবি

কতগুলো অতিপ্রচলিত সাঙ্কেতিক চিহ্নের ছবি এই পরিচ্ছেদের বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়েছে (চিত্র 4·1 থেকে চিত্র 4·10)।

এই পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত ছবিগুলির বিস্তারিত সূচী

চিত্র : 4·1

1 : মান নামক গ্রাম ; 2 : প্রাচীর ঘেরা গ্রাম ; 3 : উজাড় হওয়া গ্রাম ; 4 : মনুষ্য-পরিত্যক্ত জায়গা ; 5 : সাময়িকভাবে অধিকৃত ঘর ; 6 : মনুমেন্ট ; 7 : সতীর স্মারক ; 8 : কারখানার চিমনি ; 9 : গির্জা ; 10 : মন্দির ; 11 : সমাধিস্তম্ভ ; 12 : প্যাগোডা ; 13 : মসজিদ ; 14 : ইদ্‌গাহ্ ; 15 : দুর্গ ; 16 : পর্যবেক্ষণের মিনার ; 17 : ছত্রী বা পথের ধারের ছোট মন্দির ; 18 : মাইন শ্যাফ্‌ট্ ; 19 : কবরস্থান ; 20 : তৈলকূপ ; 21 : চাঁদমারি ; 22 : বোমা ফেলার ক্ষেত্র ; 23 : বিমানবন্দর ; 24 : মাস্তুলসহ ওয়ারলেস ষ্টেশন ; 25 : গুহা—যেখানে কেউ বাস করে না ; 26 : যুদ্ধক্ষেত্র—যেখানে 1857 খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ হয়েছিল ; 27 : গুহা—যেখানে কেউ বাস করে।

চিত্র : 4·2

1 : গেট সহ চুঙ্গি কেন্দ্র ; 2 : দুপাশে গাছসহ পাকা রাস্তা ; 3 : কাঁচা রাস্তা ; 4 : মাইলষ্টোনসহ কাঁচা রাস্তা ; 5 : গরুর গাড়ীর রাস্তা ; 6 : উট চলার রাস্তা ; 7 : খচ্চর চলার পথ এবং একটি গিরিপথ ; 8 : পায়ে চলার পথ ; 9 : পুলসহ রাস্তা—নীচে খাল ; 10 : উঁচু বাঁধানো রাস্তা (causeway) ; 11 : গাড়ীর ঘোরার জায়গা (পথের পাশে) ; 12 : নদ্যাদির যে জায়গা দিয়ে হেঁটে পার হওয়া যায় ; 13 : খেয়াঘাট ; 14 : নৌকা দিয়ে তৈরী পুল ; 15 : শুকনো নদীর বুকে পথ।

চিত্র : 4·3

1 : ব্রড গেজ রেললাইন—ডবল ; 2 : ব্রড গেজ রেললাইন—একটি ; 3 : ডবল রেললাইন—অন্য গেজের ; 4 : একটি রেললাইন—অন্য গেজের ; 5 : লেভেল ক্রসিং ; 6 : রেলপথ নীচে, সড়ক উপরে ; 7 : রেলপথ উপরে, সড়ক নীচে ; 8 : জলধারার উপর পুল সহ রেলপথ ; 9 : রেলপথের উপরে জলধারা বা জলধারার নীচে রেলপথ ; 10 : সুড়ঙ্গ মধ্যে রেলপথ ; 11 : টেলিগ্রাফ লাইন ; 12 : টেলিফোন লাইন ; 13 : বিদ্যুতের প্রধান লাইন ; 14 : রেল ষ্টেশন ; 15 : মাইলষ্টোনসহ রেলপথ।

চিত্র : 4·4

1 : প্রস্তরখনি ও তার গভীরতা ; 2 : পাহাড় কেটে রাস্তা—11 এবং 9 পথের প্রস্থ সূচিত করছে ; 3 : উঁচু করে বাঁধানো জায়গায় রেলপথ ; 4 : সুরক্ষিত বাঁধ—পথসহ।

চিত্র : 4·5

1 : পাকা কুঁয়ো ; 2 : কাঁচা কুঁয়ো ; 3 : ঝর্ণা ; 4 : জলের পাইপ লাইন ; 5 : বর্ষজীবী বা চিরস্থায়ী বা খনিত পুকুর ; 6 : অস্থায়ী পুকুর ; 7 : জলকাদা ; 8 : জলাভূমি ; 9 : জলভরা খাল ; 10 : অস্থায়ী খাল ; 11 : ভাঙ্গাজমিতে জলধারা ; 12 : খালের পাকা কিনারা , 13 : খালের কিনারা—যা ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেছে ; 14 : পাকা খাল ; 15 : মাইলষ্টোনসহ পাকাখাল ; 16 : স্লুইস বা স্রোতোদ্বার।

চিত্র : 4·6

1 : তুমুখী বানের জলধারা ; 2 : বন্যা ; 3 : শত্রুর আগমন-সূচনার্থ আলোক বা 'বেকন' ; 4 : আলোক-গৃহ ; 5 : জলের উচ্চতার রেখা (high water line) ; 6 : জলের সর্বনিম্ন উচ্চতার রেখা (low water line) ; 7 : বালি ; 8 : পাথর ; 9 : গভীরতার রেখা ; 10 : জাহাজ চলাচলের পথ ; 11 : জেটী ; 12 : গোলাকার পাথর ; 13 : কিনারাওয়ালা পাথর ; 14 : প্রস্তরের পাত।

চিত্র : 4·7

1 : রাজ্যের সীমারেখা ; 2 : জেলার সীমারেখা ; 3 : চিহ্নিত আন্তর্জাতিক সীমারেখা ; 4 : অচিহ্নিত আন্তর্জাতিক সীমারেখা ; 5 : তালুক বা মহাকুমার সীমারেখা ; 6 : সংরক্ষিত বনভূমির সীমারেখা ; 7 : সীমারেখার থাম ; 8 : আবাদযোগ্য জমির সীমা এবং একটি পাকা রাস্তা ; 9 : পাকা-রাস্তার ধারে বনাঞ্চল ও তার সীমারেখা ; 11 : লবণ তৈরীর জায়গা (salt pan)।

চিত্র : 4·8

1 : চা-বাগান ; 2 : পানের বরজ ; 3 : শাক-সব্জীর বাগান ; 4 : ফলের বাগান।

চিত্র ঃ 4·9

1 : জরীপ করা একটি বড় গাছ ; **2 :** পাইন গাছ ; **3 :** খেজুর গাছ ; **4 :** তাল গাছ ; **5 :** নারকেল গাছ ; **6 :** বাঁশঝাড় ; **7 :** সুপারি গাছ ; **8 :** ক্যাকটাস বা কাঁটা গাছ ; **4 :** কলা গাছ ; **10 :** ছোট ঝোপ ; **11 :** বড় ঝোপ ; **12 :** বেতের ঝোপ ; **13 :** ঘাস।

চিত্র ঃ 4·10

1 : ত্রিকোণোমিতিক ষ্টেশন এবং পাদভূমির উচ্চতা ; **2 :** স্পট হাইট ; **3:** বেঞ্চমার্ক ; **4 :** তুলনামূলক উচ্চতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

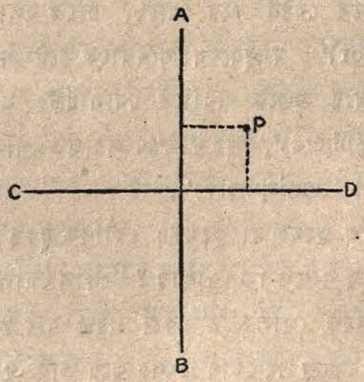
মানচিত্রে অবস্থিতি নির্দেশ

(Map Reference)

মানচিত্রে কোন স্থানের, এমন কি বিন্দুর অবস্থিতি নির্ণয় এবং তা সহজ-বোধ্যভাবে উল্লেখ করা মানচিত্র পাঠের একটি অপরিহার্য বিষয়। সামরিক কাজে এই বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। স্কেল প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় দেখা গেছে যে সামরিক কাজে বেশ কয়েকশ্রেণীর মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। তাই সকল রকম মানচিত্রেই যাতে একই ভাবে যে-কোন বিন্দুর অবস্থিতি নির্ণয় এবং উল্লেখ করা যায় তার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়—এই পরিচ্ছেদে সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

অবস্থিতি নির্ণয় এবং উল্লেখের মূলনীতি (Principle of Reference)

মূলনীতিটি সহজে বোঝার জন্য নীচের ছবিটি (চিত্র 5·1) ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি কোন একটি সমতল কাগজে **P** বিন্দুটির অবস্থিতি নির্ণয়



চিত্র : 5·1

করতে হয়, তাহলে উত্তর-দক্ষিণ অভিসারী AB সরলরেখাটি থেকে এবং পূর্ব-পশ্চিম অভিসারী CD সরলরেখাটি থেকে P বিন্দুটি কোন দিকে ও কতটা দূরত্বে অবস্থিত সে সব তথ্যের সাহায্যে তা করা সম্ভব। অর্থাৎ মানচিত্রে কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করতে হলে উত্তর-দক্ষিণ

এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি পরস্পরচ্ছেদী রেখা দরকার।

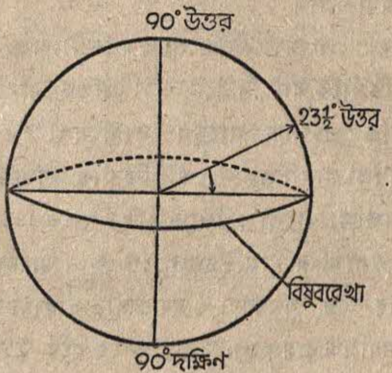
দ্রাঘিমারেখা-অক্ষরেখা পদ্ধতি (Longitude-Latitude Method)

এই পদ্ধতিটি অসামরিক মানচিত্রে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবী বর্তুলাকার, সুতরাং সাধারণভাবে পৃথিবীকে একটি গোলকের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে ত কোন উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রেখা টানা নেই। তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থিতি কি করে নির্ণয় ও নির্দেশ করা যাবে? এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত 'মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা (Meridian of Longitude)' এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত 'অক্ষরেখা (Parallels of Latitude)' কল্পনার সাহায্যে। বর্তুলকার পৃথিবী-পৃষ্ঠে দুটো নির্দিষ্ট বিন্দু রয়েছে। যে কাল্পনিক সরলরেখাকে অক্ষ করে পৃথিবী 24 ঘণ্টায় একবার পাক খেয়ে ঘুরে আসে তার প্রান্ত বিন্দুদ্বয় ভূ-পৃষ্ঠের দুই বিপরীত বিন্দুকে স্পর্শ করেছে। এই প্রান্ত বিন্দুদুটোকে বলা হয় পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরু,—উত্তর প্রান্তেরটি 'সুমেরু বা উত্তর মেরু (North Pole)' এবং দক্ষিণ দিকের প্রান্তবিন্দুটি 'কুমেরু বা দক্ষিণ মেরু (South Pole)'। এই দুটি মেরুবিন্দু থেকে সমদূরবর্তী যে কাল্পনিক রেখা পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে আছে, তাকে বলা হয় 'বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা (Equator)'। বিষুবরেখা পৃথিবীকে দুটো সমান গোলার্ধে ভাগ করেছে—বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত গোলার্ধটির নাম 'উত্তর গোলার্ধ (Northern Hemisphere)', আর দক্ষিণে অবস্থিত গোলার্ধটির নাম 'দক্ষিণ গোলার্ধ (Southern Hemisphere)'।

নিরক্ষরেখার সঙ্গে সুমেরু বা কুমেরুর কৌণিক দূরত্ব এক সমকোণ বা 90°। কৌণিক দূরত্ব বলতে কি বোঝায়? কোন গোলকের পৃষ্ঠদেশের যে-কোন দুটি বিন্দু থেকে গোলকটির কেন্দ্র পর্যন্ত যদি দুটি রেখা টানা যায়, তাহলে ঐ রেখা দুটি কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তাই ঐ দুই বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব। পৃথিবী একটি গোলক, তাই ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় করতে হলে কৌণিক দূরত্বের সাহায্য নিতে হয়।

বিষুবরেখা ও প্রত্যেক মেরুর মধ্যবর্তী 90° ডিগ্রীকে এক এক ডিগ্রীতে ভাগ করে বিষুবরেখা থেকে উত্তরে এবং দক্ষিণে আরও অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এই রেখাগুলো পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে রয়েছে। এইগুলোকে বলা হয় 'অক্ষরেখা'। অক্ষরেখাগুলো বৃত্তাকার

এবং পরস্পর সমান্তরাল। বিষুবরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের 'অক্ষাংশ (Latitude)' বলে। ভূ-পৃষ্ঠের কোন বিন্দু থেকে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত যদি একটি ব্যাসার্ধ টানা হয়, তা হলে ঐ ব্যাসার্ধটি বিষুব-তলের (Equatorial Plane) সঙ্গে একটি কোণ সৃষ্টি করবে, আর ঐ কৌণিক দূরত্বই ঐ বিন্দুটির অক্ষাংশ (5·2 চিত্র দ্রষ্টব্য)।



চিত্র : 5·2

উত্তর মেরু থেকে শুরু করে যে সব কাল্পনিক রেখা বিষুবরেখাকে সমকোণে ছেদ করে দক্ষিণ মেরুতে পরস্পর মিলিত হয়, তাদের 'মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমা-রেখা (Lines of Meridian)' বলে। ভূ-পৃষ্ঠে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় ও নির্দেশ করতে হলে শুধু অক্ষাংশেই ত কুলোবে না—প্রয়োজন হবে নিরক্ষরেখাকে সমকোণে ছেদ করে এমন একটি মধ্যরেখারও। আসলে সব কয়টি মধ্যরেখাই কিন্তু বিষুবরেখাকে সমকোণে ছেদ করে। অক্ষরেখাগুলোর মধ্যে বিষুবরেখা হচ্ছে 0° ডিগ্রী অক্ষরেখা, তাই মধ্যরেখাগুলোর মধ্যেও একটি 0° ডিগ্রী মধ্যরেখা দরকার। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য লণ্ডনের পার্শ্ববর্তী গ্রীনিচ (Greenwich) শহরের উপর দিয়ে যে মধ্যরেখাটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে তাহাকেই 'মূল মধ্যরেখা বা প্রধান মধ্যরেখা (Prime Meridian)' বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, এবং প্রধান মধ্যরেখাটিকেই 0° ডিগ্রী মধ্যরেখা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রধান মধ্যরেখাটি থেকে 1° ডিগ্রী অন্তর অন্তর পূর্ব দিকে এবং পশ্চিম দিকে মধ্য রেখা কল্পনা করা হয়েছে। প্রধান মধ্যরেখাটি থেকে পূর্ব বা পশ্চিম—যে কোন দিকেই 180° ডিগ্রীর

উপরে যাওয়া যায় না। মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত যে কোন বিন্দুর কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের 'দ্রাঘিমা বা দেশান্তর (Longtitude)' বলে। ভূ-পৃষ্ঠের কোন বিন্দুর মধ্যরেখা এবং প্রধান মধ্যরেখাটি থেকে বিষুবতল বরাবর ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত যদি দুটো কাল্পনিক রেখা টানা যায়, তবে ভূ-কেন্দ্রে ঐ রেখাদুটোর সাহায্যে যে কোণ সৃষ্টি হবে তাকেই ঐ বিন্দুর দেশান্তর বা দ্রাঘিমা বলে।

যদিও অক্ষরেখা এবং মধ্যরেখাগুলো এক ডিগ্রী অন্তর অন্তর কল্পনা করা হয়েছে, প্রতিটি ডিগ্রীকে ষাট মিনিটে, এবং প্রতিটি মিনিটকে ষাট সেকেণ্ডে ভাগ করার রীতি প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলে আঁকা মানচিত্রগুলোতে প্রতি পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে অক্ষরেখা ও মধ্যরেখাগুলো কালো কালিতে মুদ্রিত থাকে।

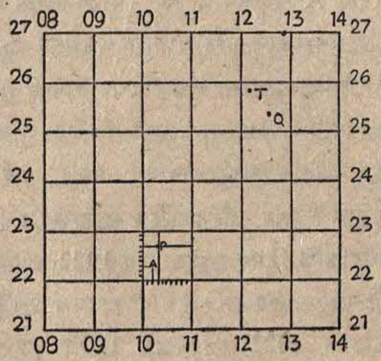
সাধারণতঃ অসামরিক মানচিত্রগুলোতে কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় ও নির্দেশ করার জন্য অক্ষরেখা ও মধ্যরেখার সাহায্য লওয়া হয়। যেমন দিল্লী কোথায় অবস্থিত প্রশ্ন হলে, উত্তরে বলতে হবে 29° উত্তর, 77° পূর্ব। তেমনি আগ্রার অবস্থিতি বোঝাতে গেলে বলতে হবে 27° উত্তর, 78° পূর্ব।

গ্রিড্ রেখার সাহায্যে (With the aid of Grid lines)

অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে কোন বিন্দুর ভৌগোলিক অবস্থিতি নির্ভুলভাবে বোঝানো সম্ভব হলেও, যে-কোন দুইটি বিন্দুর মধ্যে সমতলীয় দূরত্বের কোন আভাস দেওয়া সহজে সম্ভব হয় না। অথচ যে কোন সামরিক কাজে একটি বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুর দূরত্ব জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই সামরিক কাজে সচরাচর দ্রাঘিমারেখা-অক্ষরেখা পদ্ধতিতে মানচিত্রে কোন বিন্দুর অবস্থিতি নির্ণয় বা নির্দেশ করা হয় না। আগেই বলা হয়েছে (প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) যে সামরিক মানচিত্রগুলোতে অক্ষরেখা-মধ্যরেখা ছাড়াও আরেক রকমের রেখা মুদ্রিত থাকে—যাদের নাম 'ঝাঝরি রেখা বা গ্রিড্ (Grid) রেখা'। সামরিক কাজে মানচিত্রে অবস্থিত কোন বিন্দুর অবস্থিতি নির্ণয় ও নির্দেশে এই গ্রিড্ রেখাগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়। গ্রিড্ পদ্ধতিতে মানচিত্রের উপর উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলো সরলরেখা বেগুনী রঙে এমনভাবে মুদ্রিত থাকে যে গোটা মানচিত্রটি অনেকগুলো সমান আয়তনের বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত থাকে। "এক

ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলে মুদ্রিত মানচিত্রগুলোতে ঐসব বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহু ভূ-পৃষ্ঠের 1000 গজ দূরত্ব বোঝায়।

সাধারণতঃ গ্রিড্ রেখাগুলো দুই অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত থাকে—যেমন নীচের ছবিটিতে (চিত্র 5·3) নর্দিং গ্রিড্ রেখাগুলোকে 21, 22,



চিত্র : 5·3

23, 24, 25, 26 এবং 27 দিয়ে, আর ইষ্টিং গ্রিড্ রেখাগুলোকে 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 দিয়ে চিহ্নিত করা আছে।

মানচিত্রে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে হলে প্রথমে বিন্দুটির বাঁদিকের ইষ্টিং রেখাটির নম্বর বলতে হয়, যেমন P বিন্দুটির ক্ষেত্রে 10, আবার Q বিন্দুটির ক্ষেত্রে 12 ; তারপর উল্লেখ করতে হবে বিন্দুটির দক্ষিণ দিক দিয়ে অর্থাৎ বিন্দুটির নীচ দিয়ে যে নর্দিং রেখাটি গেছে তার নম্বর, যেমন P বিন্দুটির ক্ষেত্রে 22 আর Q বিন্দুটির বেলায় 25। অর্থাৎ P এবং Q বিন্দুদুটোর মানচিত্রে অবস্থান নির্দেশ করতে হলে যথাক্রমে বলতে হবে 1022 এবং 1225—দেখা যাচ্ছে প্রতিটি বিন্দুর অবস্থিতি নির্দেশ করতে চারটি সংখ্যা লাগে। তাই এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'চার সংখ্যার পদ্ধতি (Four Figure Reference)'। চার সংখ্যার পদ্ধতিটি কিন্তু একটি বিন্দুকে নির্দিষ্ট করতে পারে না, নির্দেশ করে যে-বর্গক্ষেত্রটিতে ঐ বিশেষ বিন্দুটি অবস্থিত সেই বর্গক্ষেত্রটিকে। "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলে আঁকা মানচিত্রে ঐ বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 1,000 গজ, অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রটির আয়তন (1,000 গজ)^2। কোন বড় বাড়ী বা গ্রাম বা ফলের বাগান প্রভৃতি বিস্তৃত

কোন জিনিস হয়ত ঐ আয়তনটি জুড়ে বিরাজ করতে পারে, কিন্তু ছোট কোন বাড়ী বা পুকুর বা একটি বড় গাছ সাধারণতঃ অতখানি জায়গা জুড়ে থাকতে পারে না। কোন কোন সময় হয়ত একই বর্গক্ষেত্রের মধ্যে একাধিক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থাকতে পারে—যেমন 5·3 ছবিটিতে 1022 বর্গক্ষেত্রটিতে P বিন্দু ছাড়াও রয়েছে A বিন্দুটি। অতএব বোঝা যাচ্ছে বড় কোন জিনিসের অবস্থান নির্ণয় ও নির্দেশ করতে চার সংখ্যার পদ্ধতিটি সুবিধাজনক হলেও, ছোট জিনিসের অবস্থিতি প্রকাশের জন্য বিশেষ কার্যকর নয়।

তাই গ্রিড্ রেখার সাহায্যে ছোট জিনিসের অবস্থিতি নির্ণয় ও নির্দেশের জন্য অন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে নির্ণয় করতে হয় কোন বিশেষ বর্গক্ষেত্রটিতে প্রয়োজনীয় জিনিসটি রয়েছে—যেমন P বিন্দুটির অবস্থিতি নির্ণয় করতে হলে 1022 বর্গক্ষেত্রটি সনাক্ত করতে হবে। তারপর ঐ বর্গক্ষেত্রটির প্রতিটি বাহুকে সমান দশটি করে অংশে ভাগ করতে হবে। তাহলে 1022 বর্গক্ষেত্রটি 100টি ক্ষুদ্রতর বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত হবে, এবং এই বর্গক্ষেত্রগুলোর প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ("এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলে আঁকা মানচিত্রে) দাঁড়াবে একশ গজ। ধরা যাক 1022 বর্গক্ষেত্রটির 22নং নর্দিং রেখাটিকে 10টি ভাগ করা হল—তাহলে 10নং এবং 21নং ইষ্টিং রেখাদুটোর মাঝখানে আরও নয়টি ইষ্টিং রেখার সৃষ্টি হবে—এগুলো ক্রমানুসারে চিহ্নিত হবে 101, 102, 103, 104, ইত্যাদিতে।

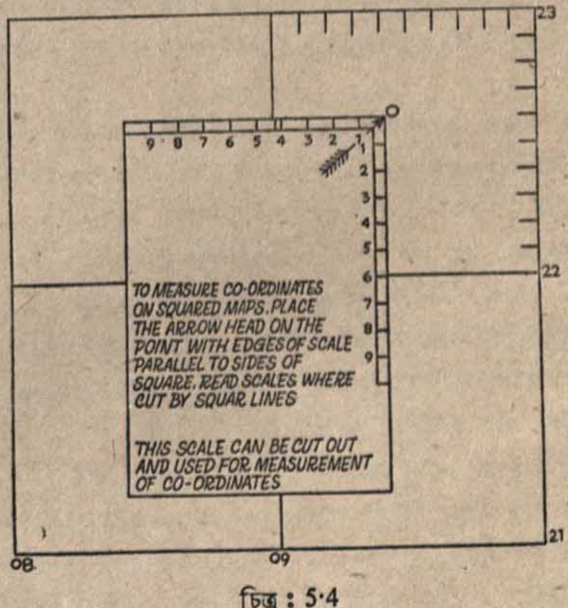
তেমনি 22নং এবং 23নং নার্দিং রেখাদুটোর মধ্যবর্তী 10নং এবং 11নং ইষ্টিং রেখাদুটো সমান দশটি অংশে বিভক্ত হলে ঐ অঞ্চলে তৈরী হবে আরও নয়টি নর্দিং রেখা—তাদেরও যথাক্রমে চিহ্নিত করতে হবে 221, 222, 223, 224, ইত্যাদি সংখ্যায়। এই ইষ্টিং ও নর্দিং রেখাগুলো কিন্তু মানচিত্রে মুদ্রিত থাকে না। প্রয়োজনমত পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে নিতে হয়। তবে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে দাগও দিতে হয় না, চোখের আন্দাজেই সে নির্ণয় করতে পারে।

এবার দেখা যাবে, যে ক্ষুদ্রতর বর্গক্ষেত্রটিতে P বিন্দুটি অবস্থিত তার বাঁদিকের ইষ্টিং রেখাটির নম্বর হচ্ছে 103, এবং নীচের দিকের নর্দিং রেখাটির নম্বর 227—তাহলে ঐ ছোট্ট বর্গক্ষেত্রটিকে প্রকাশ করার জন্য লিখতে হবে 103227, অর্থাৎ ছয়টি সংখ্যার সাহায্য নিতে হবে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় "ছয় সংখ্যার পদ্ধতি (Six Figure Reference)"। বেশীরভাগ সামরিক

কাজে সাধারণতঃ ছয় সংখ্যার পদ্ধতিতেই মানচিত্রে কোন বিন্দুর অবস্থিতি নির্ণয় ও নির্দেশ করা হয়।

ছয় সংখ্যার পদ্ধতিটি সহজ এবং প্রায় যথাযথ, কেননা প্রয়োজনীয় জিনিসটি (100 গজ)² আয়তনের একটি ছোট বর্গক্ষেত্রের মধ্যেই অবস্থিত থাকে।

যদি কোন বিন্দুর অবস্থিতি আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার দরকার হয়, তাহলে ছয় সংখ্যায় চিহ্নিত বর্গক্ষেত্রটিকে আবার উপরে বর্ণিত পন্থায় ক্ষুদ্রতর আয়তনের বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়—এই ক্ষুদ্রতর বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য তখন হবে 10 গজ। এবার ছয় সংখ্যার পরিবর্তে আট সংখ্যার সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিসটির অবস্থিতি প্রকাশিত হবে—জিনিসটির ইষ্টিং সূচিত হবে চারটি সংখ্যায়, আর নর্দিংও চিহ্নিত হবে চারটি সংখ্যায়। এই পদ্ধতিটির নাম "আট সংখ্যার পদ্ধতি (Eight Figure Reference)"।



চিত্র : 5·4

রোমার (Romer)-এর সাহায্যে

রোমার নামক একটি সরল যন্ত্রের সাহায্যে মানচিত্রে কোন বিন্দুর

অবস্থান "ছয় সংখ্যার পদ্ধতি" বা "আট সংখ্যার পদ্ধতি"তে অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়।

রোমার একটি আয়তাকার কার্ডবোর্ড বিশেষ। এই কার্ডবোর্ডটির বাহুগুলো দশমিক পদ্ধতিতে ভাগ করা থাকে, এবং কোণার দিকে একটি তীরচিহ্ন আঁকা থাকে (5·4 চিত্র দ্রষ্টব্য)। মানচিত্রে যে বিন্দুটির অবস্থান ছয় সংখ্যায় বা আট সংখ্যায় নির্ণয় করতে হবে, সেই বিন্দুটির নীচে রোমারের তীরচিহ্নটি এমনভাবে বসাতে হবে যেন রোমারের বাহুগুলো মানচিত্রটির ইষ্টিং এবং নর্দিং রেখাগুলোর সঙ্গে সমান্তরাল থাকে। এবার মানচিত্রটিতে যে চার সংখ্যায় চিহ্নিত বর্গক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসটি অবস্থিত তার ইষ্টিং এবং নর্দিং রেখাদুটোর সংখ্যা জেনে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজনমত রোমারে আঁকা লাইনগুলো গুণলেই ছয় সংখ্যার বা আট সংখ্যার বর্গক্ষেত্রটি জানা যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কম্পাস ও তার ব্যবহার

(Compass and its uses)

মানচিত্র পাঠ করতে দুটো সরল কিন্তু কার্যকর যন্ত্র বিশেষ ব্যবহৃত হয়। যন্ত্র দুটোর নাম—(i) চৌম্বক (Magnetic) কম্পাস, ও (ii) 'সার্ভিস প্রোট্র্যাক্টর (Service Protractor)' বা বিশেষ এক ধরনের চাঁদা। বর্তমান পরিচ্ছেদটিতে কম্পাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

দিক নির্ণয় করার জন্য ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ই একটি ছোট সাধারণ কম্পাস ব্যবহার করে—কম্পাসের কাঁটাটি সব সময়ই উত্তর দিকের প্রতি মুখ করে থাকে। সাধারণ সামরিক কাজে যে শ্রেণীর কম্পাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তার দিকনির্ণয়ক কাঁটাটি উত্তর দিকের প্রতি মুখ করে থাকে। তবে সামরিক কম্পাসের গঠন সাধারণ কম্পাসের তুলনায় বেশ জটীল, এবং আকারেও এটা কিছু বড়—তাই সামরিক কম্পাস দিয়ে কেবলমাত্র দিক নির্ণয় করা হয় না, আরও নানা কাজে তাকে ব্যবহার করতে হয়।

কম্পাসের কাঁটা সব সময়ই উত্তর দিকে মুখ করে থাকে কেন? পৃথিবী নামক গ্রহটি নিজেই একটি বিরাট চুম্বক পদার্থ। সব চুম্বকেরই একটি চৌম্বক উত্তর মেরু এবং একটি চৌম্বক দক্ষিণ মেরু থাকে। আর যে কোন দুটো চুম্বকের বিপরীত মেরুগুলো একে অন্যকে আকর্ষণ করে, এবং সমমেরুগুলো সব সময়ই একে অন্যকে বিপরীত দিকে ঠেলে দেয় বা বিকর্ষণ করে।

বেশ কয়েকটি ধাতু (metal)-কে এবং সংকর ধাতুকে (alloy), বিশেষতঃ লোহাকে, সহজেই চৌম্বকধর্মী করা যায়। একটি চৌম্বকায়িত (magnetized) লোহার পাতকে যদি ঝুলিয়ে রাখা যায় এবং ঐ পাতটিকে যদি কোনরকম নাড়াচাড়া না করা হয়, তবে চৌম্বক পদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর মেরুর প্রতি চৌম্বকায়িত লোহার পাতের একটি মেরু সর্বদাই আকৃষ্ট হয়ে স্থিরাবস্থায় পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর মেরু এবং চৌম্বক দক্ষিণ মেরু বরাবর প্রলম্বিত থাকবে। এই মৌলিক সত্যটির উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে কম্পাস।

ভূ-চুম্বকের গঠন

পৃথিবী নামক গ্রহটির চৌম্বক উত্তর মেরু (magnetic north pole) কিন্তু গ্রহটির ভৌগোলিক উত্তর মেরু (geographic north pole)-তে অবস্থিত নয়।

ভূ-চুম্বকের গঠন তাৎপর্য এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই। তবে, ইদানীংকালে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে উচ্চাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সেখানে এমন কোন শক্তিশালী তড়িৎ (electricity) প্রবাহের উৎসের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়নি যার প্রবল প্রভাব ভূ-চুম্বকত্বের মুখ্য কারণ হতে পারে। উর্ধ্বাকাশে 'ভ্যান অ্যালেন (Van Allen)' স্তরে যে তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব রয়েছে তার প্রভাব কেবলমাত্র ভূ-পৃষ্ঠের চৌম্বক-ক্ষেত্রের স্বল্পবিস্তার দৈনিক ও বার্ষিক প্রায় পর্যাবৃত্তাকার পরিবর্তনের পেছনে কিছুটা ক্রিয়াশীল থাকতে পারে।

কাজেই, ঘটনা বিশ্লেষণ করে ধারণা করা হয় যে শক্তিশালী ভূ-চুম্বকের উৎস ভূ-অভ্যন্তরেই নিহিত আছে, আর এর জন্য দায়ী ভূ-অভ্যন্তরে অতি উচ্চমানের চৌম্বক পদার্থের অস্তিত্ব এবং অতি উচ্চতাপমাত্রায় গলিত লাভা-স্রোতের আলোড়ন।

পিচ্ছিলতা ও সান্দ্রতা (viscosity)-র জন্য ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত লাভা পৃথিবীর কঠিন (solid) উপরিভাগের পশ্চিম থেকে পূর্বদিকগামী আবর্তনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে অত্যন্ত ধীর (slow) এবং ধ্রুব বা নির্দিষ্ট (constant) গতিতে পিছিয়ে পড়তে থাকে ; অর্থাৎ কঠিন ভূ-ত্বকের তুলনায় ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত লাভা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধীর ও ধ্রুব আপেক্ষিক গতিতে আবর্তিত হয়। ফলে, উত্তর গোলার্ধের অভ্যন্তরস্থ গলিত লাভামাধ্যমে অবস্থানরত ভূ-চুম্বকের লব্ধি (resultant) বা কার্যকরী উত্তর মেরু এই আবর্তন-গতি লাভ করে ভূ-পৃষ্ঠের ভৌগোলিক উত্তর মেরুর সন্নিকটে অবস্থিত বুথিয়া দ্বীপের ভূ-গর্ভে কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে অতি ধীর ও ধ্রুব গতিতে আবর্তিত হতে থাকে। এই আবর্তনগতির পর্যায়কাল 960 বা প্রায় 1000 বছর।

এরই ফলশ্রুতি হিসাবে উত্তর গোলার্ধের ভূ-পৃষ্ঠে দেখা যায় যে পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর মেরু (magnetic north pole) বুথিয়া দ্বীপকে কেন্দ্র করে বা বলা চলে ভৌগোলিক উত্তর মেরুকে কেন্দ্র করে প্রায় 17^{0} ডিগ্রী কৌণিক

বিস্তারে প্রায় 74° ডিগ্রী উত্তর দ্রাঘিমারেখা বরাবর প্রায়, 1000 বছরে ধীর ও ধ্রুব গতিতে একবার পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরে আসে। এই কারণে, ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত চৌম্বক উত্তর মেরুকে নির্দিষ্ট বিস্তারে ধীর ও ধ্রুবগতিতে একবার ভৌগোলিক উত্তর মেরুর পশ্চিমে এবং আবার পূর্বদিকে সরে যেতে দেখা যায়। তারপর আবার তার শুরু হয় পশ্চিমমুখী যাত্রা। অতি চৌম্বক তরল পদার্থটি যখন যেখানে থাকে, চৌম্বক উত্তর মেরুও তখন সেখানে অবস্থিত থাকে। সাধারণতঃ ভূ-পৃষ্ঠের কোন বিন্দুর অবস্থিতি সাপেক্ষে চৌম্বক উত্তর মেরুটি থাকে ভৌগোলিক উত্তর মেরুর থেকে কয়েক ডিগ্রী পশ্চিমে, নয়ত কয়েক ডিগ্রী পূর্বে। কোন একটি স্থানে চৌম্বক উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরু রেখাটি ভৌগোলিক উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে যে-কোণ তৈরী করে তাকেই বলে ঐ স্থানটির 'চৌম্বক পরিবর্তন (magnetic variation)'।



চিত্র : 6·1

উপরের চিত্রটিতে (চিত্র 6·1) উ-দ রেখাটি 'ক' বিন্দুর ভৌগোলিক উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরু রেখা, এবং উ-ধ রেখাটি 'ক' বিন্দুর চৌম্বক উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরু রেখা। এই রেখাদুটো ক বিন্দুতে একটি 10° ডিগ্রী কোণ (∠ উ ক উ) তৈরী করেছে। অতএব ক বিন্দুতে চৌম্বক পরিবর্তনের পরিমাপ 10° ডিগ্রী। কিন্তু কেবল 10° ডিগ্রী বললে চৌম্বক পরিবর্তনের যথার্থ স্বরূপটি বোঝান যায় না। চৌম্বক উত্তর মেরুটি ভৌগোলিক উত্তর মেরুর

পূর্বে না পশ্চিমে অবস্থিত তাও বলতে হবে। তাই 'ক' বিন্দুতে চৌম্বক পরিবর্তনের পরিমাপ বোঝাতে গেলে বলতে হবে '10° ডিগ্রী পূর্ব'—অর্থাৎ 'ক' বিন্দুতে চৌম্বক উত্তর মেরুটি ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে 10° ডিগ্রী পূর্বে অবস্থিত।

আগেই বলা হয়েছে যে ভূগর্ভস্থ অতি চৌম্বক পদার্থটি সর্বদাই সঞ্চারশীল, যদিও খুব ধীর গতিতে। তাই পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর অবস্থিতিও সদা পরিবর্তনশীল ; ফলে কোন একটি স্থানের 'চৌম্বক পরিবর্তন'ও স্থির থাকতে পারে না—চৌম্বক মেরুর অবস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চৌম্বক পরিবর্তনের পরিমাপও পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ 1980 খ্রীষ্টাব্দে যদি 'ক' বিন্দুতে চৌম্বক পরিবর্তনের পরিমাপ হয় 10° ডিগ্রী পশ্চিম, তাহলে 1981 খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিন্দুতে চৌম্বক পরিবর্তনের পরিমাপ 10° ডিগ্রী পশ্চিম থাকবে না—কিছুটা বদলে যাবে। এই পরিবর্তনের পরিমাপ নির্ভর করছে ভূগর্ভস্থ অতিচৌম্বক তরল পদার্থটির বার্ষিক গতিবেগ এবং তার স্থান পরিবর্তনের অভিমুখের উপর। যদি অতি তরল চৌম্বক পদার্থটি পূর্বদিকে চলতে থাকে এবং তার বার্ষিক গতিবেগ এমন হয় যে চৌম্বক পরিবর্তনে 30″ সেকেণ্ডের তারতম্য ঘটবে তাহলে 1981 খ্রীষ্টাব্দে 'ক' বিন্দুতে চৌম্বক মেরুটি থাকবে উত্তর মেরু থেকে 9° 59′ 30″ পশ্চিমে। কোন অঞ্চলে বছর বছর চৌম্বক উত্তর মেরুর স্থান পরিবর্তনের দিক ও পরিমাপকে বলা হয় ঐ অঞ্চলের 'বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তন (Annual Magnetic Variation)'। উপরে 'ক' বিন্দু সম্বন্ধে যে-সব তথ্য দেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে 'ক' বিন্দুতে 'বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তন'-এর পরিমাপ ও বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তন হচ্ছে '30″ সেকেণ্ড পূর্ব'। বিজ্ঞানীরা যখন কোন অঞ্চল জরীপ করে ঐ অঞ্চলের মানচিত্র তৈরী করেন তখন জরীপবর্ষে (Year of survey) ঐ অঞ্চলের 'চৌম্বক পরিবর্তন (Magnetic Variation)' এবং 'বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তন (Annual Magnetic Variation)' নির্ণয় করেন। আর এই তথ্যগুলো মানচিত্রের প্রান্তে মুদ্রিত করা হয় (প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জরীপবর্ষের চৌম্বক পরিবর্তনকে ভিত্তি ধরে এবং বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তনের সাহায্য নিয়ে কোন বছর ঐ বিশেষ অঞ্চলে চৌম্বক পরিবর্তন কী দাঁড়াবে তা নির্ধারণ করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে চৌম্বক উত্তর মেরু যেখানে থাকে, কম্পাসের কাঁটা বা তীর সেদিকেই মুখ করে থাকে।

কম্পাস কি কি কাজে লাগে এবং তাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সব সম্পর্কে আলোচনা করার আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে একটি কম্পাসে কি কি প্রধান অংশ থাকে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে একটি সামরিক কম্পাসের সাধারণ বর্ণনা সংক্ষেপে দেওয়া হচ্ছে।

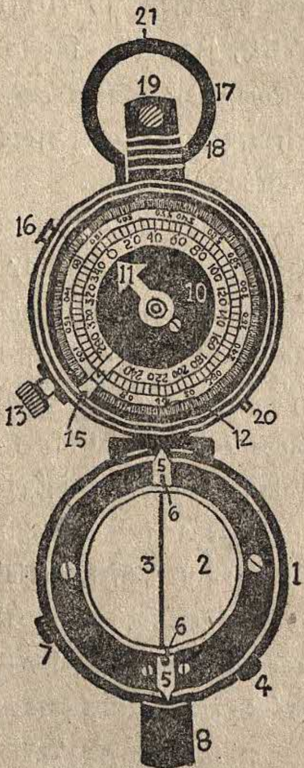
কম্পাসের বর্ণনা

সামরিক বাহিনীতে সচরাচর দুই রকমের কম্পাস ব্যবহৃত হয়—(i) প্রিজম্যাটিক কম্পাস ড্রাই টাইপ মার্ক VIII (Prismatic Compass Dry Type Mark VIII), এবং (ii) লিকুইড প্রিজম্যাটিক কম্পাস (Liquid Prismatic Compass)। দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পাসটির কর্মদক্ষতা বেশী বলে এটাই বেশী ব্যবহার করা হয়—সেই কারণে একটি লিকুইড প্রিজ-ম্যাটিক কম্পাসের বর্ণনা নীচে দেওয়া হচ্ছে।

এই কম্পাসটি পিতলের তৈরী একটি বাক্সে আবরিত থাকে। এই বাক্সটির একটি ঢাকনা থাকে—তার নাম 'লিড (Lid)'। লিডের মধ্যে থাকে একটি বৃত্তাকার কাঁচের জানালা—সাধারণতঃ তাকে বলা হয় 'উইনডো (Window)'। বাক্সটির সঙ্গে লিডটির একটি প্রান্ত একটি কব্জা বা 'হিঞ্জ (Hinge)'-এর সাহায্যে যুক্ত থাকে। লিডটির যে-প্রান্তে হিঞ্জ থাকে ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে লিডের একটি ধাতব অংশ জিহ্বার মত বেরিয়ে থাকে—তার নাম 'জিহ্বা বা টাঙ্গ (Tonge)'। টাঙ্গের মাথায় একটি খাঁজ (Notch) কাটা থাকে। টাঙ্গের একপাশে একটি ছোট্ট ক্লিপ (Clip) লিডের সঙ্গে লাগানো থাকে—তার নাম 'নেল ক্লিপ (Nail clip)'। কম্পাসের বাক্স থেকে লিডকে খুলতে হলে নেল ক্লিপে সামান্য একটু চাপ দিতে হয়। টাঙ্গের আরেক পাশে থাকে আরও একটি ক্লিপ—যার নাম 'ক্যাম ক্লিপ (Cam clip)'। কাঁচের উইনডোটির মাঝ বরাবর একটি অতি সরু সরল-রেখা খোদিত থাকে—এই রেখাটিকে বলা হয় 'হেয়ার লাইন (Hair Line)' বা কেশ-রেখা। এই রেখার দুই প্রান্তে দুটি আলোকিত উজ্জ্বল অংশ থাকে—এদের বলা হয় 'লুমিনাস প্যাচ্ (Luminous Patch)'। এই প্যাচ-দুটোতে একটি করে সরু ছিদ্রপথ থাকে। এই ছিদ্রপথ দুটোর মধ্য দিয়ে সরু সুতো বা ঘোড়ার লোম ঢোকানো যায়। যদি কোন কারণে উইনডোর কাঁচ ভেঙ্গে যায় তখন ঐ ছিদ্রপথ দুটোর সাহায্যে একটি সরু সুতো বা

কোন পোক্ত ঘোড়ার লোম ঢুকিয়ে হেয়ার লাইনের বিকল্প তৈরী করে নেওয়া যায়।

পিতলের বাক্সটির মধ্যে একটি ভারী তরল পদার্থ থাকে। সাধারণতঃ ঐ তরল পদার্থটি তৈরী হয় কোহল ও গ্লিসারিনের মিশ্রণ দিয়ে। এই তরল পদার্থটির উপর একটি বৃত্তাকার 'কার্ড (Card)' ভাসমান থাকে। কার্ডটি সাধারণতঃ কাঁচের তৈরী হয়। এই কার্ডটির উপর তুটি বৃত্তে সমান্তরালবর্তী কতকগুলো রেখা আঁকা থাকে। ভিতরকার বৃত্তটিতে 0° ডিগ্রী থেকে



চিত্র : 6·2

দক্ষিণাবর্ত্তে (clockwise) 360° ডিগ্রী পর্যন্ত গাণিতিক সংখ্যায় লেখা থাকে। স্বভাবতঃই 0° ডিগ্রী বা 360° ডিগ্রী থাকে চৌম্বক উত্তর মেরুর বিন্দুতে। বাইরের বৃত্তটিতে ডিগ্রীরও ছোট ছোট অংশগুলো দেওয়া থাকে

—তবে সেগুলো লেখা থাকে উল্টো করে—যার জন্য প্রিজমের সাহায্য ছাড়া ঐ লেখাগুলো ঠিকমত পড়া কষ্টকর হয়। কম্পাসের 'প্রিজম (Prism)'-টি সমকোণী এবং তার একটি দিক উত্তল (convex)। উত্তল দিকটির সাহায্যেই কার্ডের লেখাগুলো পড়া যায়। প্রিজমটি থাকে একটি ছোট পিতলের বাক্সে। এই ছেট বাক্সটি কম্পাসের বাক্সের সঙ্গে একটি কব্জার সাহায্যে আটকানো থাকে। ঐ কব্জার জন্য প্রিজমটিকে প্রয়োজনমত কম্পাসের বাক্সের উপর বসানো যায়। প্রিজমের বাক্সটির একপাশে একটি ছোট ছেঁদা থাকে, তার নাম 'আই হোল (Eye hole)' বা 'সাইটিং স্লট (Sighting slot)'। ঐ স্লটে চোখ রেখে কম্পাসের লেখা পড়তে হয়।

একটি চৌম্বক ছুঁচ বা তীর (magnetic needle or arrow) ঐ কার্ডটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। কার্ড এবং চৌম্বক ছুঁচটি ষ্টীলের তৈরী একটি ছোট কীলকের উপর ঝুলানো থাকে। বাক্সের ভারী তরল পদার্থের মধ্যে চৌম্বক ছুঁচটি স্বধর্ম অনুযায়ী নড়াচড়া করতে পারে, কিন্তু তরল পদার্থটির ঘনত্বের জন্য তাড়াতাড়ি স্থিতিসাম্যে পৌঁছতে পারে। চৌম্বক ছুঁচের মুখটি সব সময়ই চৌম্বক উত্তর মেরুর প্রতি নির্দিষ্ট থাকে।

কম্পাসের পিতলের বাক্সটির উপরে একটি কাঁচের ঢাকনি শক্ত করে আঁটা থাকে। যেমন লিডের হিঞ্জের কাছে লিডের উপর লুমিনাস প্যাচ থাকে তেমনি এই কাঁচের ঢাকনাটির উপরও হিঞ্জের কাছাকাছি একটি লুমিনাস প্যাচ্ আছে। এই প্যাচ্‌টির উপর একটি সরু রেখা আঁকা থাকে—রেখাটির নাম 'লাবার লাইন (Lubber Line)'।

পিতলের বাক্সটির গায় হিঞ্জের একপাশে একটি স্ক্রু আছে, তাকে বলা হয় 'ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু (Clamping Screw)'। এই স্ক্রুটিকে ঢিলে করলে একটি ফলককে ঘোরানো যায়—ঐ ফলকটির নাম 'মিলড্ ভেন (Milled Vane)' বা 'রোটারি স্কেল (Rotary Scale)'। এই ফলকটির উপর প্রতি 10° ডিগ্রী দূরত্বে দাগ কাটা আছে, এবং ঐ কাটাদাগগুলোর পাশে গাণিতিক সংখ্যায় ডিগ্রী জাহির করা আছে। স্বাভাবিকভাবেই ডিগ্রীর সংখ্যা দক্ষিণাবর্তে (clockwise) বেড়েছে। তবে জায়গার অল্পতার জন্য সংখ্যার ডানদিকের শেষ শূন্যটি লেখা হয়নি, অর্থাৎ যেখানে হওয়া উচিত 120, সেখানে লেখা আছে 12, আবার 260 না লিখে 26 লেখা হয়েছে। মিল্‌ড্ ভেনের যে-জায়গাটিতে 0° বা 360° ডিগ্রী হওয়া উচিত সে জায়গায় একটি

লুমিনাশ প্যাচ্ আছে। এই প্যাচ্‌টির নাম 'ডিরেকশন মার্ক (Direction Mark)'। রাত্রিতে চলাফেরা করার সময় এই চিহ্নটি বিশেষ কাজে লাগে।

পিতলের বাক্সটিতে আরও একটি ফলক আছে, তার নাম 'সেটিং ভেন (Setting Vane)'। এই ফলকটির গায়েও ক্রমান্বয়ে দাগ কাটা আছে। এই ফলকের শূন্য চিহ্নিত স্থানটি থাকে হিঞ্জের মাঝ বরাবর—ঠিক লাবার লাইনের সঙ্গে।

লিডের টাঙ্গ বরাবর পিতলের বাক্সটিতে একটি আংটা আছে, তার নাম 'থাম্ব্ রিং (Thumb Ring)। টাঙ্গের খাঁজ বরাবর থাম্ব্ রিং-এও একটি খাঁজ কাটা আছে। কম্পাসটিকে ঠিক মত ধরতে থাম্ব্ রিংটি কাজে লাগে।

স্থানীয় চৌম্বক আকর্ষণ (Local Magnetic Attraction) বা স্থানীয় উপদ্রব (Terrestrial Disturbance)

যে-স্থানে চৌম্বক কম্পাস ব্যবহার করা হয় সে-স্থানে বা তার খুব কাছাকাছি কোন জায়গায় যদি লোহা বা অন্য কোন চৌম্বক পদার্থ থাকে তাহলে কম্পাসের চৌম্বক ছুঁচে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ঐ সব চৌম্বক পদার্থের আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে কম্পাসের চৌম্বক ছুঁচটি সঠিক চৌম্বক উত্তর মেরুর দিকে মুখ রাখতে পারে না। এই ধরনের স্থানীয় প্রভাবকে বলা হয় 'স্থানীয় চৌম্বক আকর্ষণ (Local magnetic attraction)' বা 'স্থানীয় উপদ্রব (Terrestrial disturbance)'। এই উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণতঃ কম্পাস ব্যবহার করার সময় অন্যান্য ধাতব পদার্থকে কম্পাসের থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হয়। সৈনিকদের ব্যবহার্য কতকগুলো জিনিস কতটা দূরত্বে থাকলে কম্পাসের চৌম্বক ছুঁচের উপর তাদের প্রভাব সাধারণতঃ পরে না তারই একটি ছোট্ট তালিকা নীচে দেওয়া হল।

জিনিসের নাম		নিরাপদ দূরত্ব
রাইফেল	অন্ততঃ	30 ফুট
লোহার হেলমেট	,,	9 ,,
টুপীর ব্যাজ	,,	$1\frac{1}{2}$,,

জিনিসের নাম		নিরাপদ দূরত্ব
ফিল্ড্ গান	অন্ততঃ	120 ফুট
হেভী গান	,,	180 ,,
মোটর যান	,,	120 ,,
কাঁটা তার	,,	30 ,,
টেলিগ্রাফের তার	,,	120 ,,

রেল লাইন, ইলেকট্রিক তার, টীনের বাড়ী, ধাতব চশমার ফ্রেম, কৃষিক্ষেত্রস্থিত ট্র্যাক্টর, ইত্যাদি ধাতব পদার্থমাত্রই স্থানীয় উপদ্রবের কারণ। কাজেই কম্পাস ব্যবহার করার সময় খেয়াল রাখতে হয় যে কম্পাসের কাছাকাছি যেন এসব বস্তু না থাকে। মাটির উপরে থাকা ধাতুর হাত থেকে ত সরে গিয়ে বাঁচা যায়, কিন্তু যদি মাটির নীচে যথেষ্ট পরিমাণে লোহা, কোবাল্ট বা নিকেল থাকে তাহলে কি হবে? সেক্ষেত্রেও কম্পাস কিন্তু স্থানীয় উপদ্রবের পাল্লায় পড়বে।

কম্পাসের নিজস্ব ত্রুটি (Individual Compass Error বা I. C. E.)

কম্পাসকে খুব যত্নের সঙ্গে ব্যবহার না করলে কম্পাসের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়। আবার কখনও বা কম্পাস তৈরীর সময়ই কোন গাফিলতির জন্য কম্পাসটি ত্রুটিহীনভাবে নির্মিত হয় না। এই সব ত্রুটি আপাতঃ দৃষ্টিতে ছোটখাটো হলেও কম্পাস ব্যবহার করার সময় কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই কোন কম্পাস ব্যবহার করার সময় কম্পাসটিতে কোন ত্রুটি আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হয়। এই ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো কিন্তু কোন দুটো কম্পাসে এক রকম হয় না। তাই এই ত্রুটিগুলোকে বলা হয় 'কম্পাসের নিজস্ব ত্রুটি (Individual Compass Error বা সংক্ষেপে I.C.E)'।

স্থানীয় উপদ্রব বা কম্পাসের নিজস্ব ত্রুটি আছে কি না কি করে বোঝা যায় (How to find out the presence of terrestrial disturbance and/or I. C. E.)

মানচিত্র এবং প্রোট্যাক্টারের [পরে আলোচিত হয়েছে] সাহায্যে বোঝা যেতে পারে যে কোন কম্পাসের উপর স্থানীয় উপদ্রবের প্রভাব পড়ছে

কি না, এবং কম্পাসটির কোন নিজস্ব ত্রুটি আছে কিনা। মানচিত্রটির উপর এমন দুটি সুস্পষ্ট বস্তু বেছে নিতে হবে যাদের মাটির উপরেও সহজে সনাক্ত করা যায়। ধরা যাক বস্তু দুটোর নাম A এবং B। এবার A বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কম্পাসের সাহায্যে A বিন্দু থেকে B বিন্দুর চৌম্বক রেয়ারিং [পরে আলোচিত হয়েছে] দেখে নিতে হবে। এখন মানচিত্রটির উপর প্রোট্যাক্টারের সাহায্যে A বিন্দু থেকে B বিন্দুর রেয়ারিং মেপে নিতে হবে—স্বভাবতঃই এটি হবে 'গ্রিড্ বেয়ারিং [পরে আলোচিত হয়েছে]। মানচিত্রের প্রান্তীয় তথ্যের সাহায্যে ,অঙ্ক কষে গ্রিড্ বেয়ারিং থেকে চৌম্বক বেয়ারিং বের করা যায় [বেয়ারিং পরিবর্তনের পদ্ধতি পরে আলোচিত হয়েছে]। এইভাবে অঙ্ক কষে A বিন্দু থেকে B বিন্দুর যে চৌম্বক বেয়ারিং পাওয়া গেল, তা যদি কম্পাসের সাহায্যে পাওয়া বেয়ারিং-এর সঙ্গে মিলে যায় তা হলে বুঝতে হবে যে স্থানীয় উপদ্রবের প্রভাব বা কম্পাসের কোন নিজস্ব ত্রুটি নেই।

কিন্তু যদি ঐভাবে পাওয়া বেয়ারিং দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় তখন বোঝা যাবে যে কোন প্রকারের প্রভাব বা ত্রুটি আছে। তখন আরও একটি বা দুটি কম্পাস দিয়ে A বিন্দু থেকে B বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং বের করতে হবে। যদি দেখা যায় যে সব কয়টি কম্পাসেই একই চৌম্বক বেয়ারিং পাওয়া যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে কম্পাসগুলোর কোন নিজস্ব ত্রুটি নেই, কিন্তু ঐখানে স্থানীয় উপদ্রবের প্রভাব আছে। আবার যদি দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন কম্পাসে ভিন্ন ভিন্ন বেয়ারিং পাওয়া যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে কম্পাসগুলোর নিজস্ব ত্রুটি আছে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে অঙ্ক কষে A বিন্দু থেকে B বিন্দুর যে চৌম্বক বেয়ারিং পাওয়া গেছে, কোন একটি কম্পাসের সাহায্যেও সেই একই বেয়ারিং পাওয়া গেছে, তখন বুঝতে হবে যে এই বিশেষ কম্পাসটি ত্রুটিমুক্ত।

কম্পাসের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical Uses of Compass)

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কাজগুলোতে কম্পাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে:

(i) ভূ-পৃষ্ঠে কোন বস্তুর বেয়ারিং নির্ণয় করতে (to take bearing of objects on earth);

(ii) উত্তর দিক নির্ণয় করতে এবং মানচিত্রকে মাটিতে ঠিকমত সন্নিবেশিত করতে (to find the north and to set a map) ;

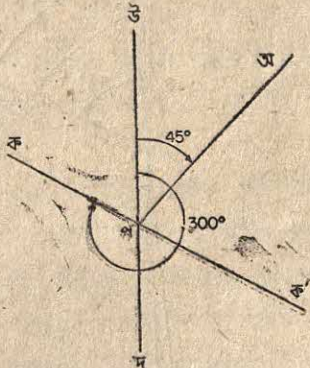
(iii) মানচিত্রের উপর নিজস্ব অবস্থিতি বের করতে (to find one's own position on the map) ; এবং

(iv) কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নির্দিষ্ট বেয়ারিং ধরে দিনে কিংবা রাতে মার্চ করতে (to march on a particular bearing to reach a fixed destination both at day and night) ।

(i) **বেয়ারিং (Bearing) ঃ**

কম্পাস দিয়ে কোন বস্তুর বেয়ারিং কি করে নির্ণয় করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করার আগে বুঝে নিতে হবে বেয়ারিং বলতে কি বোঝায় ?

বেয়ারিং শব্দটির অভিধানগত অর্থ হচ্ছে 'আপেক্ষিক স্থিতি'। মানচিত্র পাঠের প্রথা অনুযায়ী অবশ্য বেয়ারিং বলতে বোঝায় এক বিন্দু বা বস্তু থেকে অপর কোন বিন্দু বা বস্তুর কৌণিক দিক—অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট উত্তর-

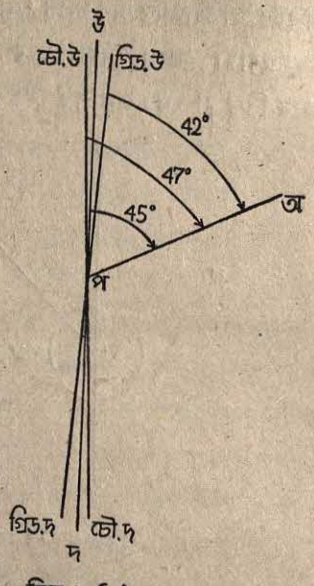


চিত্র ঃ 6·3

দক্ষিণ সরলরেখা অন্য কোন সরলরেখার সঙ্গে যে কোণ সৃষ্টি করে তাই প্রথম সরলরেখা থেকে দ্বিতীয় সরলরেখাটির বেয়ারিং। বিষয়টি একটি চিত্রের সাহায্যে বোঝানো হচ্ছে—6·3 নং চিত্রে প বিন্দু থেকে যথাক্রমে অ বিন্দু এবং ক বিন্দুর বেয়ারিং বের করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে প বিন্দুর উপর দিয়ে একটি উত্তর-দক্ষিণ সরলরেখা টানতে হবে, তারপর প বিন্দুকে একটি সরলরেখার সাহায্যে অ বিন্দুর সঙ্গে যোগ করতে হবে, তারপর এই দুটি সরলরেখার সাহায্যে যে-কোণটি তৈরী হয়েছে সেটা মাপলেই প বিন্দু থেকে

অ বিন্দুর বেয়ারিং পাওয়া যাবে—খেয়াল রাখতে হবে যে প বিন্দুর উপর দিয়ে যে উত্তর-দক্ষিণ সরলরেখাটি গেছে সেখান থেকে দক্ষিণাবর্তে (clockwise) কোণটি মাপতে হবে ; অর্থাৎ ∠ উপঅ হবে প বিন্দু থেকে অ বিন্দুর বেয়ারিং—এক্ষেত্রে কোণটির মাপ 45°, তাহলে দাঁড়াল প বিন্দু থেকে অ বিন্দুর বেয়ারিং 45° ডিগ্রী। একই পদ্ধতিতে ∠ উপক হচ্ছে প বিন্দু থেকে ক বিন্দুর বেয়ারিং, এই কোণটির মাপ 300° ডিগ্রী—অর্থাৎ প বিন্দু থেকে ক বিন্দুর বেয়ারিং 300° ডিগ্রী।

দেখা যাচ্ছে বেয়ারিং প্রধানতঃ উত্তর-দক্ষিণ রেখার উপর নির্ভরশীল। এখন উত্তর দিক তিন প্রকারের, যথা ভৌগোলিক উত্তর মেরু নির্দিষ্ট উত্তর বা যথার্থ উত্তর (True North), চৌম্বক উত্তর মেরু নির্দিষ্ট উত্তর বা চৌম্বক



চিত্র : 6·4

উত্তর (Magnetic North), এবং গ্রিড্ রেখা নির্দিষ্ট উত্তর বা গ্রিড্ উত্তর (Grid North)। তিন রকমের উত্তর দিক থাকলে, তিন রকমের দক্ষিণ দিকও থাকবে—অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ রেখা হবে তিন প্রকৃতির, যথা যথার্থ উত্তর-দক্ষিণ রেখা, (True North-South line), চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখা (Magnetic North-South line), এবং গ্রিড্ উত্তর-দক্ষিণ রেখা (Grid

North-South line)। কাজেই বেয়ারিংও হবে তিন জাতীয়, যথা যথার্থ বেয়ারিং (True Bearing)—এই বেয়ারিংটি নির্ভর করবে যথার্থ উত্তর-দক্ষিণ রেখার উপর, চৌম্বক বেয়ারিং (Magnetic Bearing)—চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখার উপর ভিত্তি করে এই বেয়ারিং মাপা হয়, এবং গ্রিড্ বেয়ারিং—এই কোণটি মাপা হবে গ্রিড্ উত্তর-দক্ষিণ রেখাকে ভিত্তি করে।

আগের পৃষ্ঠার চিত্রটিতে (চিত্র 6·4) দেখা যাবে যে প বিন্দুর উপর তিনটি উত্তর-দক্ষিণ রেখা গেছে—উ-দ রেখাটি যথার্থ উত্তর-দক্ষিণ রেখা, চৌ. উ.-চৌ. দ. রেখাটি চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখা, এবং গ্রি. উ.-গ্রি. দ. রেখাটি গ্রিড্ উত্তর-দক্ষিণ রেখা। ফলে প বিন্দু থেকেও অ বিন্দুর তিন রকম বেয়ারিং পাওয়া যাচ্ছে—যথার্থ বেয়ারিং (True Bearing) 45° ডিগ্রী, চৌম্বক বেয়ারিং (Magnetic Bearing) 47° ডিগ্রী, এবং গ্রিড্ বেয়ারিং (Grid Bearing) 42° ডিগ্রী। এই তিন শ্রেণীর যে-কোন একটি বেয়ারিং জানতে পারলে মানচিত্রের প্রান্তীয় তথ্যের সাহায্যে অন্য দুই রকমের বেয়ারিং বের করা যায়।

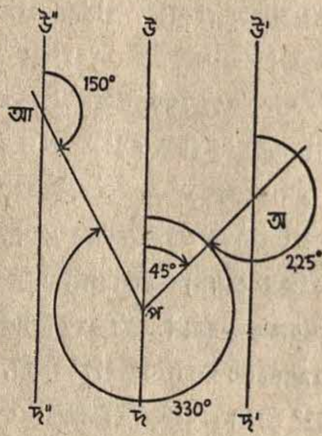
চৌম্বক কম্পাসের সাহায্যে যে-বেয়ারিং মাপা যায় তা স্বভাবতঃই চৌম্বক বেয়ারিং, আবার মানচিত্রের গ্রিড্ লাইনের সাহায্যে যে-বেয়ারিং পাওয়া যায় তা গ্রিড্ বেয়ারিং।

এক শ্রেণীর বেয়ারিং থেকে অন্য দুই শ্রেণীর বেয়ারিং কিভাবে বের করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে বেয়ারিং সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রাথমিক তথ্য জেনে নেওয়া উচিত। একজন পর্যবেক্ষক যখন প বিন্দুতে দাঁড়িয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অ বিন্দুর বেয়ারিং মাপে, তখন যে বেয়ারিংটি পাওয়া যায় তাকে বলে 'সম্মুখ বেয়ারিং (Forward Bearing)'। আবার যখন প বিন্দুতেই দাঁড়িয়েই অ বিন্দু থেকে প বিন্দুর বেয়ারিং মাপা হয় তখন তাকে বলে 'পশ্চাৎ বেয়ারিং (Backward বা Back Bearing)'।

পরের পৃষ্ঠার চিত্রটিতে (চিত্র 6·5) প বিন্দু থেকে অ বিন্দুর সম্মুখ বেয়ারিং হচ্ছে ∠ উপঅ অর্থাৎ, 45°, আবার অ বিন্দুর পশ্চাৎ বেয়ারিং হচ্ছে ∠ উঅপ অর্থাৎ 225° ডিগ্রী। তেমনি, প বিন্দু থেকে আ বিন্দুর সম্মুখ বেয়ারিং হচ্ছে ∠ উপআ অর্থাৎ 330° ডিগ্রী, আ বিন্দুর পশ্চাৎ বেয়ারিং হচ্ছে ∠ উ″আপ অর্থাৎ 150° ডিগ্রী।

এই সম্মুখ বেয়ারিং ও পশ্চাৎ বেয়ারিং-এর মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক

আছে—যদি সম্মুখ বেয়ারিং 180° ডিগ্রীর কম হয় (যেমন 45°) তাহলে সম্মুখ বেয়ারিং-এর সঙ্গে 180° ডিগ্রী করলেই পশ্চাৎ বেয়ারিং পাওয়া যাবে



চিত্র : 6·5

(যেমন 45° ডিগ্রী + 180° ডিগ্রী = 225° ডিগ্রী)। আর যদি সম্মুখ বেয়ারিং-এর কোণটি 180° ডিগ্রীর বেশী হয় (যেমন 330° ডিগ্রী), তাহলে সম্মুখ বেয়ারিং থেকে 180° ডিগ্রী বাদ দিলেই (যেমন 330° − 180° ডিগ্রী = 150° ডিগ্রী) পশ্চাৎ বেয়ারিংটি পাওয়া যায়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত সূত্রটি তৈরী করা যায় :

সম্মুখ বেয়ারিং ± 180° ডিগ্রী = পশ্চাৎ বেয়ারিং

আগে বলা হয়েছে যে চৌম্বক কম্পাসের সাহায্যে যেকোন অভিলক্ষ্য বস্তুর চৌম্বক বেয়ারিং পাওয়া যায়, আসলে সেটি কিন্তু চৌম্বক সম্মুখ বেয়ারিং (Magnetic Forward Bearing)।

কম্পাসের সাহায্যে পর্যবেক্ষকের বিন্দু থেকে অভিলক্ষ্য বিন্দুর চৌম্বক সম্মুখ বেয়ারিং বের করার পদ্ধতিটি সহজ। পদ্ধতিটি পর্যায়ক্রম অনুসারে নীচে বলা হচ্ছে :

(i) কম্পাসের লিডটি খুলে এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যেন সেটি কম্পাসের কার্ডের সঙ্গে সমকোণ (90° ডিগ্রী) তৈরী করে।

(ii) প্রিজমটিকে তার আবরণীসহ তুলে কার্ডের উপর এমনভাবে বসাতে হবে যেন তার সাইটিং স্লট-এর মধ্য দিয়ে উইনডোর হেয়ারলাইনটি

দেখা যায়।

(iii) পর্যবেক্ষকের বাঁহাতের বুড়ো আঙ্গুলটি থাম্ব্ রিং-এর মধ্যে গলিয়ে বাঁ হাতের তর্জনীর উপর কম্পাসের পিতলের বাক্সটিকে এমনভাবে রাখতে হবে যেন সেটি নিখুঁত অনুভূমিক (horizontal) থাকে।

(iv) আস্তে আস্তে কম্পাসটিকে ঐ অবস্থায় পর্যবেক্ষকের ডানচোখের সামনে আনতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে কম্পাসের পিতলের বাক্সটি থাকবে অনুভূমিক, লিডটি থাকবে কার্ডের উপর লম্বভাবে, আর পর্যবেক্ষক যেন প্রিজমের সাহায্যে কার্ডের সমান্তরাল লেখাগুলো (graduations) পড়তে পারেন।

(v) পর্যবেক্ষক এবার অভিলক্ষ্য বস্তুটির দিকে মুখ করে সোজা সটান দাঁড়ান, এবং কম্পাসটিকে তাঁর ডান চোখের সামনে এমনভাবে ধরেন যে উইনডোর হেয়ারলাইনটি অভিলক্ষ্য বস্তুটির মধ্য অক্ষরেখায় (axis) পড়ে—অভিলক্ষ্য বস্তু, হেয়ারলাইন এবং সাইটিং স্লট যেন একই সরলরেখায় অবস্থিত হয়। কিন্তু এরকমটি করতে গিয়ে যেন কোন মতেই কম্পাসের পিতলের বাক্সের অনুভূমিক অবস্থা এবং কার্ডের উপর উইনডোর লম্ব অবস্থা সামান্যতমও বিঘ্নিত না হয়।

(vi) এই অবস্থায় কম্পাসের কার্ডটি এক সময় স্থির হবে। তখন হেয়ারলাইনের ঠিক নীচে কার্ডের গায়ে সমান্তরাল রেখাটির পাশে যে গাণিতিক সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, সেটাই হবে পর্যবেক্ষকের বিন্দু থেকে অভিলক্ষ্য বস্তুটির চৌম্বক সম্মুখ বেয়ারিং।

কম্পাসের সাহায্যে কোন একটি অভিলক্ষ্য বস্তুর বেয়ারিং পড়তে সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। অবশ্যই পর্যবেক্ষকের দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্য কম্পাসের সাহায্যে অভিলক্ষ্য বস্তুর বেয়ারিং নির্ণয় করার কাজটি বার বার অভ্যাস করা উচিত।

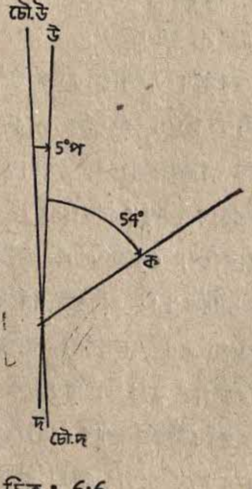
কোন একটি বস্তুর চৌম্বক সম্মুখ বেয়ারিং নির্ণীত হলে, তার সঙ্গে 180° ডিগ্রী যোগ-বিয়োগ করে পশ্চাৎ বেয়ারিংটিও নির্ণয় করা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কম্পাসের সাহায্যে ত চৌম্বক বেয়ারিং পাওয়া যায়, অথচ মানচিত্রে কাজ করতে হবে গ্রিড্ বেয়ারিং-এর সাহায্যে—তাহলে চৌম্বক বেয়ারিং থেকে গ্রিড্ বেয়ারিং বের করা যাবে কি করে? কাজটি কঠিন নয়। কম্পাসের সাহায্যে কোন একটি বস্তুর চৌম্বক বেয়ারিং বের

করার পর দেখতে হবে মানচিত্রটির প্রান্তে চৌম্বক পরিবর্তন সম্পর্কে কি কি তথ্য দেওয়া আছে। ঐ তথ্যগুলোর সাহায্যে চৌম্বক বেয়ারিং থেকে ভৌগোলিক বেয়ারিং বা 'ট্রু বেয়ারিং (True Bearing)' নির্ণয় করা যায়। ট্রু বেয়ারিং নির্ণীত হলে দেখতে হবে যে মানচিত্রটিতে মীন গ্রিড্ নর্থ বা অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স সম্বন্ধে মানচিত্রের উপর প্রান্তে কী তথ্য দেওয়া আছে। এবার ঐ তথ্যের সাহায্যে ট্রু বেয়ারিং থেকে গ্রিড্ বেয়ারিং নির্ণয় করতে হবে। এক ধরনের বেয়ারিং থেকে অন্য ধরনের বেয়ারিং কি ভাবে নির্ণয় করতে তা হয় বোঝাবার জন্য নীচে কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া হল।

উদাহরণ 1

কোন একটি স্থানে একটি বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং (magnetic bearing) হচ্ছে 54° ডিগ্রী, এবং ঐ স্থানটির চৌম্বক পরিবর্তর (magnetic variation) হচ্ছে 50° ডিগ্রী পশ্চিম ; তাহলে আলোচ্য বিন্দুটির যথার্থ বেয়ারিং বা ট্রু বেয়ারিং (True Bearing) কত ?



চিত্র : 6·6

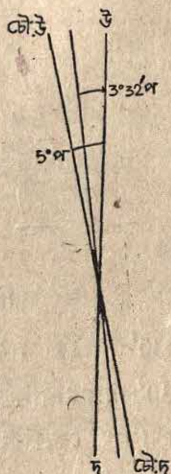
চৌম্বক পরিবর্তন = 5° ডিগ্রী পশ্চিম, অর্থাৎ চৌম্বক উত্তর (magnetic north) যথার্থ উত্তর (true north) থেকে 5° ডিগ্রী পশ্চিমে অবস্থিত। তাহলে চৌম্বক বেয়ারিং এখানে যথার্থ বেয়ারিং থেকে 5° ডিগ্রী বেশী হবে, অর্থাৎ যথার্থ বেয়ারিং হবে চৌম্বক বেয়ারিং থেকে 5° ডিগ্রী কম।

অতএব, আলোচ্য বিন্দুটির যথার্থ বেয়ারিং = চৌম্বক বেয়ারিং—চৌম্বক পরিবর্তন = 54° ডিগ্রী—5° ডিগ্রী = 49° ডিগ্রী।

উত্তর : আলোচ্য বিন্দুটির যথার্থ বেয়ারিং 49° ডিগ্রী।

উদাহরণ 2

কোন একটি শহরে 1980 খ্রীষ্টাব্দে চৌম্বক পরিবর্তন ছিল 5° পশ্চিম। ঐ শহরের বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তন 8′ মিনিট পূর্ব। ঐ শহরে 1991 খ্রীষ্টাব্দে চৌম্বক পরিবর্তন কত হবে ?



চিত্র : 6·7

যেহেতু আলোচ্য শহরটির বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তন 8′ মিনিট পূর্ব, সেহেতু ঐ শহরে প্রতিবছর চৌম্বক উত্তর (magnetic north) 8′ মিনিট করে যথার্থ উত্তর (ture north)-এর দিকে এগিয়ে আসবে। অতএব 11 বছরে (1991 খ্রীষ্টাব্দে—1980 খ্রীষ্টাব্দ) চৌম্বক উত্তর এগিয়ে আসবে 8′ মিনিট × 11 বা 88′ মিনিট।

88′ মিনিট = 1° 28′ মিনিট

∴ 1991 খ্রীষ্টাব্দে ঐ শহরে চৌম্বক পরিবর্তন দাঁড়াবে

= 5° ডিগ্রী পশ্চিম − 1°98 মিনিট

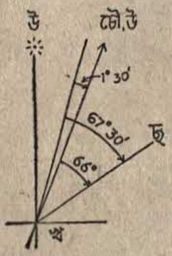
= 3° ডিগ্রী 32′ মিনিট পশ্চিম।

উত্তর : আলোচ্য শহরে 1991 খ্রীষ্টাব্দে চৌম্বক পরিবর্তন দাঁড়াবে 3°

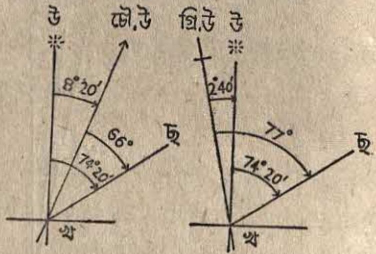
ডিগ্রী 32′ মিনিট পশ্চিম।

উদাহরণ 3

কোন একটি জায়গায় খ বিন্দু থেকে একটি কম্পাসের সাহায্যে ছ বিন্দুর বেয়ারিং পাওয়া গেল 67°30′ মিনিট, কিন্তু ঐ কম্পাসটির নিজস্ব ত্রুটি (I. C. E.) 1°30′ মিনিট পশ্চিম—তাহলে খ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং কত ?



চিত্র : 6·8



চিত্র : 6·9

কম্পাসের নিজস্ব ত্রুটি 1°30′ মিনিট পশ্চিম, অর্থাৎ প্রদত্ত কম্পাসের কাঁটাটি চৌম্বক উত্তর থেকে 1°30′ মিনিট পশ্চিমের দিকে মুখ করে থাকে। অতএব ঐ কম্পাসটির সাহায্যে যে বেয়ারিং পাওয়া যাবে তা চৌম্বক বেয়ারিং থেকে 1°30′ মিনিট বেশী। অতএব, খ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং $= 67°30' - 1°30'$

$= 66°$ ডিগ্রী

উত্তর : খ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং 66° ডিগ্রী (চিত্র 6·8)।

উদাহরণ 4

কোন একটি স্থানে খ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং 66° ডিগ্রী। ঐ স্থানটির চৌম্বক পরিবর্তন (magnetic variation) 8°20′ মিনিট পূর্ব, বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তনের (annual magnetic variation) হার নগণ্য, এবং অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স 2°40′ মিনিট পশ্চিম। তাহলে খ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুর গ্রিড্ বেয়ারিং কত ?

আলোচ্য স্থানটিতে বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তনের হার নগণ্য, অতএব এই তথ্যটি কোন বিবেচনায় লাগবে না।

আলোচ্য স্থানটির চৌম্বক পরিবর্তন 8°20′ মিনিট পূর্ব, অর্থাৎ ঐ স্থানটির চৌম্বক উত্তর হচ্ছে যথার্থ উত্তর (true north) থেকে 8°20′ মিনিট পূর্বে অবস্থিত। অতএব এই স্থানে সকল চৌম্বক বেয়ারিংই যথার্থ বেয়ারিং (true bearing) থেকে 8°20′ মিনিট কম হবে—এখানে চৌম্বক বেয়ারিং থেকে যথার্থ বেয়ারিং পেতে গেলে চৌম্বক বেয়ারিং-এর সঙ্গে চৌম্বক পরিবর্তন যোগ করতে হবে।

অর্থাৎ, খ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুর যথার্থ বেয়ারিং

= 66° ডিগ্রী + 8°20′ মিনিট

= 74° ডিগ্রী 20′ মিনিট।

এই স্থানটিতে অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স 2°40′ মিনিট পশ্চিম, অর্থাৎ এখানে গ্রিড্ যথার্থ উত্তর (true north) থেকে 2°40′ মিনিট পশ্চিমে অবস্থিত। তাই এখানে যথার্থ বেয়ারিং থেকে গ্রিড্ বেয়ারিং নির্ণয় করতে হলে যথার্থ বেয়ারিং-এর সঙ্গে অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স যোগ করতে হবে।

অর্থাৎ, খ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুর গ্রিড্ বেয়ারিং

= 74°20′ মি. + 2°40′ মি.

= 77° ডিগ্রী।

উত্তর : প্রদত্ত তথ্য অনুসারে খ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুর গ্রিড্ বেয়ারিং 77° ডিগ্রী (চিত্র 6·9)।

উদাহরণ 5

একটি জায়গায় চৌম্বক পরিবর্তন (magnetic variation) হচ্ছে 10° ডিগ্রী পূর্ব। সেখানে চ বিন্দু থেকে একটি গাছের যথার্থ (true) বেয়ারিং 4° ডিগ্রী। চ বিন্দু থেকে গাছটির চৌম্বক বেয়ারিং কত ?

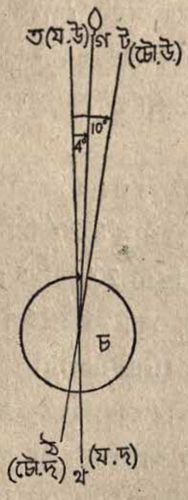
চৌম্বক পরিবর্তন 10° ডিগ্রী পূর্ব, অর্থাৎ যথার্থ (true) উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তর 10° ডিগ্রী পূর্বে অবস্থিত।

আবার চ বিন্দু থেকে আলোচ্য গাছটির চৌম্বক বেয়ারিং হবে চ বিন্দুতে চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখার সঙ্গে চ বিন্দুর সঙ্গে গাছটির সংযোগকারী সরলরেখাটি যে কোণ তৈরী করেছে তার দক্ষিণাবর্ত (clockwise) পাঠ।

পরের ছবিটিতে (চিত্র 6·10) চ বিন্দুর উপর যথার্থ উত্তর-দক্ষিণ রেখা হচ্ছে তথ, চ বিন্দুর সঙ্গে আলোচ্য গাছটিকে সংযুক্ত করেছে গচ রেখা, এবং চ বিন্দুর উপর চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখা হচ্ছে টঠ রেখা।

প্রদত্ত তথ্য অনুসারে,

চ বিন্দু থেকে গাছ-এর যথার্থ বেয়ারিং = ∠তচগ = ∠4° ডিগ্রী,



চিত্র : 6·10

চ বিন্দুতে চৌম্বক পরিবর্তন = ∠তচট = 10° ডিগ্রী,

এবং বের করতে হবে

চ বিন্দু থেকে গাছটির চৌম্বক বেয়ারিং = ∠টচগ।

∠টচগ = 360° − ∠গচট,

তাহলে প্রথমে বের করতে হবে ∠গচট কত ডিগ্রী।

∠গচট = ∠উচট — ∠উচগ = 10° − 4° = 6° ডিগ্রী

∴ ∠টচগ = 360° − 6° = 354° ডিগ্রী।

উত্তর : প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী চ বিন্দু থেকে আলোচ্য গাছটির চৌম্বক বেয়ারিং 354° ডিগ্রী।

উদাহরণ 6

একটি জায়গার মানচিত্রে দেওয়া আছে যে সেখানকার যথার্থ (true) উত্তর থেকে 3° ডিগ্রী পশ্চিমে গ্রিড্ উত্তর (অর্থাৎ mean grid north) অবস্থিত, এবং সেখানকার চৌম্বক পরিবর্তন (magnetic variation) 4°45′ মিনিট পূর্ব। সেখানে ট বিন্দুতে দাঁড়িয়ে একজন পর্যবেক্ষক কম্পাসের সাহায্যে গ নামক গাছটির চৌম্বক বেয়ারিং দেখলেন 256° ডিগ্রী।

তাহলে ট বিন্দু থেকে গ নামক গাছটির যথার্থ (true) এবং গ্রিড্ বেয়ারিং কত হবে ?

প্রদত্ত তথ্য অনুসারে চৌম্বক উত্তর হচ্ছে যথার্থ উত্তরের পূর্বে, আর গ্রিড্ উত্তর যথার্থ উত্তরের পশ্চিমে।

অতএব, যথার্থ বেয়ারিং = চৌম্বক বেয়ারিং + চৌম্বক পরিবর্তন

$= 256° + 4°45'$ মিনিট $= 260°45'$ মিনিট।

এবং, গ্রিড্ বেয়ারিং = যথার্থ বেয়ারিং + অ্যাংগেল অব কনভার্জেন্স

$= 260°45' + 3°$ ডিগ্রী $= 263°45'$ মিনিট।

উত্তর : প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ট বিন্দু থেকে গ নামক গাছটির যথার্থ বেয়ারিং এবং গ্রিড্ বেয়ারিং যথাক্রমে 260°45′ মিনিট, এবং 263°45′ মিনিট।

উদাহরণ 7

মানচিত্রে দেওয়া তথ্য অনুসারে একটি জায়গার যথার্থ (true) উত্তর থেকে 1°40′ মিনিট পূর্বে গ্রিড্ উত্তর অবস্থিত, আবার 1982 খ্রীষ্টাব্দে ঐ জায়গার চৌম্বক (magnetic) উত্তর ছিল গ্রিড্ উত্তর থেকে 3°25′ মিনিট পশ্চিমে। ঐ জায়গাটিতে যথার্থ উত্তরের সঙ্গে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান প্রতি বছর 2′ মিনিট করে কমে। মানচিত্রটির প বিন্দু থেকে ফ বিন্দুর গ্রিড্ বেয়ারিং যদি 120° ডিগ্রী হয়, তবে 1991 খ্রীষ্টাব্দে প বিন্দু থেকে ফ বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং কত হবে ?

প্রদত্ত তথ্য অনুসারে 1982 খ্রীষ্টাব্দে গ্রিড্ উত্তর যথার্থ উত্তর থেকে পূর্বে, এবং চৌম্বক উত্তর গ্রিড্ উত্তর থেকে পশ্চিমে অবস্থিত।

অতএব, 1982 খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থানের চৌম্বক পরিবর্তন = গ্রিড্ উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান − গ্রিড্ উত্তর থেকে যথার্থ উত্তরের ব্যবধান

$= 3°25'$ মিনিট $- 1°40'$ মিনিট

$= 1°45'$ মিনিট পশ্চিম (6·11 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ঐ স্থানটির বার্ষিক চৌম্বক পরিবর্তনের (annual magnetic variation) হার $= 2'$ মিনিট। তাহলে 1982 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1991 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 9 বছরে চৌম্বক উত্তরের সঙ্গে যথার্থ উত্তরের ব্যবধান কমেছে

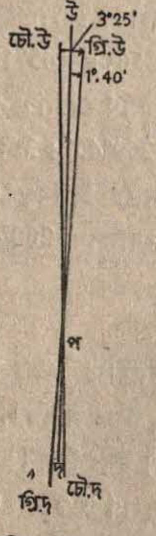
$= 2'$ মিনিট $\times 9 = 18'$ মিনিট।

অতএব, 1991 খ্রীষ্টাব্দে চৌম্বক পরিবর্তন হবে,

$1°45' - 18'$ মিনিট $= 1°27'$ মিনিট পশ্চিম।

তাহলে, 1991 খ্রীষ্টাব্দে গ্রিড্ উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান দাঁড়াবে,

$1°40'$ মিনিট $+ 1°27'$ মিনিট পশ্চিম $= 3°7'$ মিনিট পশ্চিম।



চিত্র : 6·11

অতএব, যখন প বিন্দু থেকে ফ বিন্দুর গ্রিড্ বেয়ারিং 120° তখন প বিন্দু থেকে ফ বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং

$= 120° + 3°7'$ মিনিট $= 123°7'$ মিনিট।

উত্তর : প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হচ্ছে যে 1991 খ্রীষ্টাব্দে প বিন্দু থেকে ফ বিন্দুর চৌম্বক বেয়ারিং হবে 123°7′ মিনিট।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মানচিত্রে দেওয়া প্রান্তিয় তথ্যের ভিত্তিতে এক জাতীয় বেয়ারিং থেকে অন্য দুই শ্রেণীর বেয়ারিং নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বেয়ারিং-এর রূপান্তর (শ্রেণী অন্তর) নির্ণয় করার সময় প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ছবি এঁকে নিলে কাজটি আরও সহজ হয়।

(ii) উত্তর দিক নির্ণয় এবং মাটিতে মানচিত্রের সন্নিবেশন (to find the North and to set a map) :

যদি একটি কম্পাস যথার্থ অনুভূমিক অবস্থায় থাকে, এবং তাকে কেউ

নাড়াচাড়া না করে, তাহলে বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী কম্পাসের চৌম্বক কাঁটাটি পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর মেরুর দিকে মুখ করে থাকে। তাই একটি স্থির অনুভূমিক কম্পাসের চৌম্বক কাঁটার দিক্-নির্দেশ থেকে যে কোন স্থানেই পৃথিবীর চৌম্বক উত্তর মেরুর দিক নির্ণয় করা যায়। আর একবার উত্তর দিক নির্ধারিত হয়ে গেলে অন্যান্য দিকগুলো সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

চৌম্বক উত্তর মেরুর দিক নির্দেশিত হয়ে গেলে, মানচিত্রে প্রদত্ত ঐ স্থানের চৌম্বক পরিবর্তনের সাহায্য নিয়ে আলোচ্য স্থানটির যথার্থ (true) উত্তর দিকও বের করা যায়।

মানচিত্রের সন্নিবেশন (Setting the map)

একটি মানচিত্র যে বিশেষ অঞ্চলের রৈখিক চিত্র, সেই অঞ্চলেই মানচিত্র-টির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু মানচিত্রটিকে ব্যবহার করতে হলে ঐ অঞ্চলের কোনো স্থানে মানচিত্রটিকে সন্নিবেশিত (set) করে নিতে হয়। মানচিত্রের সন্নিবেশন (Setting) বলতে কি বোঝায়? একটি মানচিত্রকে তখনই সন্নিবেশিত বলা হয় যখন মাটি বা মাটির সমান্তরাল কোন অনুভূমিক তলে, যেমন টেবিলে, মানচিত্রটিকে খুলে অনুভূমিক অবস্থায় এমনভাবে ছড়ানো হয় যে ঐ অঞ্চলের যথার্থ উত্তর দিকের প্রতি মানচিত্রের যথার্থ উত্তরটিও নির্দেশিত হয়; এবং ঐ অঞ্চলের যে-সব বস্তু মানচিত্রটিতে দেখানো হয়েছে সেই বস্তুগুলো যেন অনুভূমিক ছড়িয়ে রাখা মানচিত্রটিতে প্রদর্শিত ঐ বস্তুগুলোর সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোর সঙ্গে সমরেখায় অবস্থান করে।

মানচিত্র সন্নিবেশন করার কাজটি সহজ—বার কয়েক অভ্যাস করলেই এই কাজে দক্ষতা লাভ করা যায়। মেঘমুক্ত দিনে সূর্যের সাহায্যে, মেঘ-মুক্ত রাত্রিতে আকাশের তারার সাহায্যে, কখনও বা মুসলমানদের কবর বা হিন্দুদের মন্দিরের সাহায্যে অতি অল্প আয়াসেই মোটামুটিভাবে মানচিত্র সন্নিবেশিত করা যায়। তবে নিখুঁতভাবে মানচিত্রের সন্নিবেশন করতে হলে কম্পাসের সাহায্য নিতে হয়। মানচিত্র সন্নিবেশিত করার পদ্ধতি-গুলোকে প্রধানতঃ দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—

(i) কম্পাসের সাহায্যে সন্নিবেশন, এবং (ii) কম্পাসের সাহায্য ব্যতিরেকে সন্নিবেশন।

কম্পাসের সাহায্যে মানচিত্র সন্নিবেশিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথমে

আলোচনা করা হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে যে ভূ-পৃষ্ঠের যথার্থ উত্তর দিকের প্রতি মানচিত্রটির যথার্থ উত্তর দিক নির্দেশ করলেই মানচিত্র সন্নিবেশিত হয়। এই সূত্র ধরেই বলা যায় যে বিশেষ মানচিত্রটির চৌম্বক উত্তর যদি ঐ অঞ্চলটির চৌম্বক উত্তর মেরুর প্রতি নির্ভুলভাবে নির্দেশিত হয় তা হলেও মানচিত্রটি সন্নিবেশিত হবে। কম্পাসের সাহায্যে যেমন চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখা অবলম্বনে মানচিত্র সন্নিবেশিত করা যায়, তেমনি যথার্থ উত্তর-দক্ষিণ রেখার উপর ভিত্তি করেও মানচিত্রের সন্নিবেশ করা যায়।

মানচিত্র সন্নিবেশনের পদ্ধতি

(i) মাটিতে বা মাটির সমান্তরাল কোন তলে—যেমন টেবিলে—মানচিত্রটি সোজা মুখ করে খুলে সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিতে হবে।

(ii) সাধারণতঃ মানচিত্রের উপর চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ সূচিত করে একটি রেখা আঁকা থাকে,—যদি ঐ রেখাটি আঁকা না থাকে তবে মানচিত্রের কোন একটি দ্রাঘিমা রেখার উপর চৌম্বক পরিবর্তন [মানচিত্রে প্রদত্ত তথ্য] অনুসারে একটি কোণ এঁকে [চাঁদার সাহায্যে] চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণে রেখাটি তৈরি করে নিতে হবে। এই রেখাটি যেন যথেষ্ট লম্বা হয়।

(iii) এবার কম্পাসের ঢাকনাটি খুলে কম্পাসটিকে ঐ চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখার উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ঢাকনাটি মানচিত্রের উত্তর দিকে—অর্থাৎ উপরের দিকে থাকে। ঢাকনার জিহ্বার খাঁজ, উইনডোর হেয়ার লাইন এবং থাম্ব্ রিং-এর খাঁজটি চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখাটির উপর আপতিত হয়।

(iv) কম্পাসটিকে মানচিত্রের উপর ঐ অবস্থায় রেখে কম্পাসসহ মানচিত্রটিকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কম্পাসের চৌম্বক কাঁটাটির মুখ লিডের টাঙ্গ বরাবর হয়। টাঙ্গের খাঁজ, উইনডোর হেয়ার লাইন, থাম্ব্ রিং-এর খাঁজ ত আগেই চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখার উপর এক সারিতে ছিল—এখন তাদের সঙ্গে চৌম্বক কাঁটাটিও একই লাইনে সামিল হল। এই সব একলাইনে এসে চৌম্বক কাঁটাটি স্থির হলে মানচিত্রটি চৌম্বক উত্তর বরাবর সন্নিবেশিত হল।

যদি যথার্থ (true) উত্তর-দক্ষিণ রেখা অবলম্বনে কম্পাসের সাহায্যে

মানচিত্রকে সন্নিবেশিত করতে হয়, তাহলে কম্পাসটিকে উপরে বর্ণিত ভঙ্গীতে বসাতে হবে মানচিত্রটির যে-কোন দ্রাঘিমার উপর। সাধারণতঃ "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলে আঁকা মানচিত্রতে প্রতি 5′ মিনিট অন্তর অন্তর কালো রঙে দ্রাঘিমা আঁকা থাকে। দ্রাঘিমারেখার উপর কম্পাসটিকে বসিয়ে কম্পাসসহ মানচিত্রটিকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না লাবার লাইন বরাবর কম্পাসের কার্ডের ভিতরের সারিতে চৌম্বক পরিবর্তনের গাণিতিক সংখ্যাটি আসে। যখন টাঙ্গের খাঁজ, উইনডোর হেয়ার লাইন, থাম্ব্ রিং-এর খাঁজ, দ্রাঘিমারেখা এক লাইনে এল এবং লাবার লাইন বরাবর চৌম্বক পরিবর্তনের গাণিতিক সংখ্যাটি কম্পাসের কার্ডে [ভিতরের সারিতে] এসে স্থির হল, তখন যথার্থ উত্তর-দক্ষিণ রেখার ভিত্তিতে মানচিত্রটি সন্নিবেশিত হল।

একই পদ্ধতিতে যে কোন ইষ্টিং গ্রিড্ রেখার সাহায্যেও মানচিত্র সন্নিবেশ করা যায়। এখানে চৌম্বক উত্তরের সঙ্গে গ্রিড্ উত্তরের কৌণিক ব্যবধানটি মানচিত্রের প্রান্তীয় তথ্য থেকে নির্ণয় করে নিতে হবে, এবং কম্পাসটিকে উপরে বর্ণিত পন্থায় রাখতে হবে যে-কোন ইষ্টিং গ্রিড্ রেখার উপর। এক্ষেত্রে কম্পাসসহ মানচিত্রটিকে ততক্ষণ ঘোরাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না লাবার লাইন বরাবর চৌম্বক উত্তরের সঙ্গে গ্রিড্ উত্তরের ব্যবধানের গাণিতিক সংখ্যাটি কম্পাসের কার্ডে দেখা যায়।

(iii) মানচিত্রের উপর নিজস্ব অবস্থিতি নির্ধারণ (Finding own position on the map) ঃ

ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ বিন্দুটিতে পর্যবেক্ষক নিজে দাঁড়িয়ে আছেন তা বের করতে হলে ঐ বিশেষ অঞ্চলের মানচিত্রটি ঠিকমত সন্নিবেশিত করে নিতে হয়। তারপর পর্যবেক্ষকর দুই দিকে এমন দুটো প্রকট বস্তু (object) বেছে নিতে হয় যা মানচিত্রটিতেও আঁকা রয়েছে। বস্তুদুটো বেছে নেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যে ঐ বস্তুগুলোর ধারে কাছে যেন এমন কোন বস্তু না থাকে যার সঙ্গে নির্দিষ্ট বস্তুগুলো গুলিয়ে যেতে পারে। এবার পর্যবেক্ষক তার নিজস্ব জায়গা থেকে ঐ বেছে নেওয়া বস্তুদুটোর চৌম্বক বেয়ারিং নেবেন। মানচিত্রে প্রদত্ত তথ্যের সাহায্যে চৌম্বক বেয়ারিং দুটোর গ্রিড্ বেয়ারিং নির্ধারণ করবেন। নির্ধারিত বেয়ারিং দুটোর পশ্চাৎ বেয়ারিং (Back bearing) বের করবেন। এবার মানচিত্রটিতে ঐ বেছে নেওয়া

বস্তুদুটোর পশ্চাৎ বেয়ারিং অনুযায়ী দুটো সরলরেখা আঁকবেন—এই কাজে 'সার্ভিস প্রোট্র্যাক্টর (Service Protactor)' বা সামরিক কাজে ব্যবহার্য আয়তাকার চাঁদার সাহায্য নেবেন, এবং সরলরেখা দুটো আঁকবেন পেন্সিল দিয়ে। এই সরলরেখা দুটো যে-বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করবে, মানচিত্রের সেই বিন্দুটিতেই পর্যবেক্ষকের নিজস্ব অবস্থিতি।

দুটি বস্তুর পরিবর্তে তিনটি বস্তু বেছে নিয়ে কাজটি করলে পর্যবেক্ষকের নিজস্ব অবস্থিতির স্থানটি আরও ভালোভাবে নির্ধারণ করা যায়।

(iv) কোন নির্দিষ্ট বেয়ারিং অভিমুখে দিনে কিংবা রাতে মার্চ করা (To march on a given bearing in day or in night) :

সামরিক কাজে ছোট ছোট সৈন্যদলকে প্রায়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয়—যুদ্ধের সময় সেসব জায়গায় প্রায়ই কোন যান-বাহন পাওয়া যায় না, আবার অনেক সময় যান-বাহন ব্যবহার করাও নিরাপদ নয়। তখন ঐ সব অপরিচিত অঞ্চলে সৈন্যদলকে মানচিত্র এবং কম্পাসের সাহায্যেই নিঃশব্দে যাতায়াত করতে হয়। এই সব যাতায়াতে কম্পাসকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাই বর্তমানের আলোচ্য বিষয়। প্রথমে বলা হবে দিনে কম্পাসের ব্যবহার, পরে আলোচনা করা হবে রাতের কার্য-পদ্ধতি।

(ক) দিনের কার্যপদ্ধতি

ধরা যাক কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য একটি সৈন্যদলকে 95° ডিগ্রী চৌম্বক বেয়ারিং ধরে কিছুটা পথ যেতে হবে।

প্রথমে কোন বস্তুর বেয়ারিং বের করার মত ভঙ্গীতে কম্পাসটিকে ধরতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না কম্পাসের কার্ডে 95° ডিগ্রী প্রিজমের মাধ্যমে দেখা যাবে—অন্য কথায় বলা চলে যে কম্পাসের সাহায্যে 95° ডিগ্রী বেয়ারিং দেখতে হবে। যখন কম্পাসের উইনডোর হেয়ার লাইনটি কম্পাসের কার্ডের 95° ডিগ্রীর উপর লম্বভাবে দাঁড়াবে তখনই কিন্তু বোঝা যাবে যে 95° ডিগ্রী বেয়ারিংটি পাওয়া গেছে। কম্পাসটিকে ঐ অবস্থায় স্থির রেখে দেখতে হবে যে 95° ডিগ্রী বেয়ারিংএ কি কি বড় বস্তু দেখা যাবে। মনে করা যাক যে 95° ডিগ্রী বেয়ারিংএ একটি বেশ বড় বট-গাছ দেখা গেল, আর ঐ বড় বটগাছটির আশেপাশে কোন বটগাছ নেই। তখন ঐ বড় বটগাছটিকেই লক্ষ্য বস্তু ধরে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে হবে।

লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করার সময় নীচে লেখা কথাকয়টি মনে রাখতে হবে :—

(1) লক্ষ্য বস্তুটি বেয়ারিং বরাবর হওয়া চাই।

(2) লক্ষ্য বস্তুটি অচল এবং চলার অযোগ্য হওয়া চাই—অর্থাৎ একটি গাড়ী বা হাতীর মত বড় প্রাণী অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও কিন্তু সেগুলো লক্ষ্যবস্তু হবার যোগ্য হবে না, তবে গাড়ী বা হাতীর ষ্ট্যাচু লক্ষ্যবস্তু হতে পারে।

(3) লক্ষ্যবস্তুটির ধারে-কাছে ঐ বস্তুটির আকৃতির বা প্রকৃতির অন্য কোন বস্তু না থাকে; অর্থাৎ একটি বড় বটগাছকে লক্ষ্যবস্তু বলে সনাক্ত করা তখনই বিধেয় হবে যখন তার ধারে-কাছে অন্য কোন বড় বটগাছ থাকবে না।

(4) লক্ষ্যবস্তুটি পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তাই বলে দূরত্ব এত বেশী হবে না যে পর্যবেক্ষকের জায়গা থেকে লক্ষ্যবস্তুটির আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্যক বোঝা যায় না। দূর থেকে বড় আমগাছ, কাঁঠালগাছ, প্রভৃতিকে বড় বটগাছের মতই দেখায়—তাই যদি পর্যবেক্ষকের জায়গা থেকে গাছটির প্রকৃতি যথার্থভাবে সনাক্ত করা সম্ভব না হয় তবে সেই গাছটিকে লক্ষ্যবস্তু বলে নির্ধারিত করা ঠিক হবে না। এই রকম পরিস্থিতিতে অল্প দূরত্বে অবস্থিত কোন বস্তুকে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিতে হবে, এবং প্রাথমিক লক্ষ্যে পৌঁছে একই বেয়ারিংএ কিন্তু আরও কিছুটা দূরে অবস্থিত কোন বস্তুকে দ্বিতীয় লক্ষ্য ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

(খ) রাতের কার্যপদ্ধতি

ধরা যাক রাত্রিতে 140° ডিগ্রী বেয়ারিং অভিমুখে যেতে হবে। তখনকার কার্যপদ্ধতি হবে নিম্নরূপ :—

(1) প্রথমে কম্পাসের ঢাকনিটিকে খুলে চিৎ করে রাখতে হবে এবং ক্ল্যাম্পিং স্ক্রুকে ঢিলে করে কম্পাসের 'মিলড্ ভেন (Milled Vane)-টিকে ঘোরাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ ভেনটিতে লেখা 14 সংখ্যাটি লাবার লাইনের সঙ্গে এক জায়গায় আসে। এবার ক্ল্যাম্পিং স্ক্রুটিকে আঁট করে আটকাতে হবে।

(2) এবার যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পাসের চৌম্বক কাঁটাটি 'ডিরেকশন মার্ক

(Directon mark)'-এর ঠিক নীচে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত কম্পাসটিকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে হবে।

এই অবস্থায় কম্পাসটিকে সন্নিবেশিত (set) বলা হয়।

(3) সন্নিবেশিত কম্পাসের সম্পূর্ণ চিৎ করে খোলা ঢাকনাটির 'ল্যুমিনাস প্যাচ (Luminous patch)'-গুলো যাত্রাপথের দিক নির্দেশ করে। এখানে একটি কথা পরিষ্কার বুঝতে হবে যে এই যাত্রাপথের দিকটি চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ রেখার সঙ্গে 140° ডিগ্রী কোণ তৈরি করেছে।

(4) অভীষ্ট দিকে চলার সময় কম্পাসটিকে হাতের চেটোতে এমনভাবে রাখতে হবে যেন কম্পাসটি অনুভূমিক থাকে।

(5) চলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে কম্পাসের চৌম্বক কাঁটাটি যেন ডিরেকশন মার্কের ঠিক নীচে থাকে—কাঁটাটি যতক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ যাত্রাপথের দিক ঠিক থাকবে, কিন্তু কাঁটাটি সামান্য একটু নড়ে গেলেই বুঝতে হবে যাত্রাপথের দিক ঘুরে যাচ্ছে। এই কারণে রাত্রে চলার গতি ধীর হয়ে যায়।

কম্পাসের সাহায্যে দিনে বা রাত্রিতে অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি যাওয়াটা কষ্টকর কিছু নয়, তবে কম্পাস ব্যবহারের কিছু দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বার বার অভ্যাস করলেই এই দক্ষতা লাভ করা যায়, আর অভ্যাস না থাকলে কাজটি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

চিত্র 6·2-এর বিস্তারিত সূচী

1 : লিড ; 2 : উইনডো ; 3 : হেয়ার লাইন ; 4 : নেল ক্লিপ ; 5 : লুমিনাস প্যাচ ; 6 : ফুটো ; 7 : ক্যাম ক্লিপ ; 8 : জিহ্বা বা টাঙ্গ ; 9 : খাঁজ ; 10 : কার্ড ; 11 : চৌম্বক ছুঁচ বা তীর ; 12 : লাবার লাইন ; 13 : ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু ; 14 : ডিরেকশন মার্ক ; 15 : সেটিং ভেন ; 16 : ষ্টাড ; 17 : থাম্ব্ রিং ; 18 : প্রিজম ; 19 : প্রিজম কেস বা প্রিজমের বাক্স ; 20 : চেক স্প্রিং ; 21 : থাম্ব্ রিং-এর খাঁজ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রোট্র্যাক্টর ও তার ব্যবহার

(Protractor and its uses)

প্রোট্র্যাক্টর মানে চাঁদা—তবে জ্যামিতির কাজে যে চাঁদা সচরাচর ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার আকৃতি অনেকটা ইংরাজি 'D' অক্ষরের মত, কিন্তু সেনাবাহিনী সাধারণতঃ যে চাঁদা ব্যবহার করে সেটি আয়তাকার। এই শ্রেণীর চাঁদাকে বলা হয় 'সার্ভিস প্রোট্র্যাক্টর (Service Protractor)' বা সামরিক চাঁদা। মানচিত্র ব্যবহার করতে সামরিক চাঁদা অত্যাবশ্যক। সাধারণতঃ মানচিত্রের উপর কোন বস্তুর বেয়ারিং বের করতে এবং বিশেষ কোন বিন্দুতে যে কোন বেয়ারিং অনুযায়ী সরলরেখা আঁকতে সামরিক চাঁদা অপরিহার্য। অবশ্য অর্ধবৃত্তাকার বা বৃত্তাকার চাঁদা দিয়েও এই কাজগুলো করা চলে; তবে সামরিক চাঁদা আয়তাকার হওয়ায় তার সাহায্যে রৈখিক দূরত্বও মাপা চলে। সাধারণতঃ সচরাচর যে সব স্কেল সামরিক মানচিত্রে ব্যবহৃত হয় বস্তুতঃ সামরিক চাঁদায় সে-রকম এগারটি স্কেল লাইন এবং একটি কর্ণমাপনী অর্থাৎ ডায়াগোনাল স্কেল আঁকা থাকে।

সামরিক চাঁদা দুই প্রকারের হয়—মার্ক III এবং মার্ক IV। বর্তমানে মার্ক IV শ্রেণীর সামরিক চাঁদাই বেশী ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সার্ভিস প্রোট্র্যাক্টরের বর্ণনা

আগেই বলা হয়েছে যে সামরিক চাঁদা আয়তাকার—এটি লম্বায় ছয় ইঞ্চি এবং দুই ইঞ্চি চওড়া। সাধারণতঃ মোটা কাগজ, কাঠ বা আইভরিন (ivorine) দিয়ে এই চাঁদা তৈরী হয়। সামরিক চাঁদার সোজা দিকে (obverse) একটি লম্বাপ্রান্তের মধ্যবিন্দুতে একটি তীরচিহ্ন আঁকা থাকে—এই প্রান্তটিকে বলা হয় 'জিরো এজ্ (Zero edge)' বা শূন্য প্রান্ত। বাকি তিন দিকে থাকে দুই সারি সমান্তর রেখা (graduation)। বাইরের সারির সমান্তর রেখাগুলো দক্ষিণাবর্তে 0° ডিগ্রী থেকে 180° ডিগ্রী পর্যন্ত চিহ্নিত থাকে, আর ভিতরের সারিটি চিহ্নিত থাকে 181° ডিগ্রী থেকে 360^0 ডিগ্রী পর্যন্ত। জিরো এজের তীরচিহ্নটি যে-বিন্দুটির প্রতি লক্ষ্য করে থাকে সেই বিন্দুটিকে শীর্ষবিন্দু ধরেই এই বিভিন্ন ডিগ্রীগুলো মাপা হয়েছে। জিরো

এজটিকে 'ভিতরের প্রান্ত বা ইনার এজ (Inner edge)'-ও বলা হয়। তীর-চিহ্নের শীর্ষবিন্দুটির সাহায্যেই মানচিত্রে সামরিক চাঁদা দিয়ে বেয়ারিং মাপা হয়। সামরিক চাঁদার সোজা দিকে এবং উল্টো দিকে (reverse) স্কেল লাইনগুলো আঁকা থাকে। সামরিক চাঁদায় সাধারণতঃ যে-সব স্কেল লাইন-গুলো আঁকা থাকে সেগুলোর একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল (চিত্র 7·1 এবং চিত্র 7·2 দ্রষ্টব্য)।

সোজা দিকে (On the front)

স্কেল	প্রাথমিক বিভাজন	দ্বিতীয় বিভাজন
1/50,000	1,000 মিটার	100 মিটার
1/25,000	500 মিটার	50 মিটার এবং 20 মিটার
1/250,000	1 মাইল	1/4 মাইল
1/250,000	5,000 গজ	1,000 গজ
1/50,000	1,000 গজ	1,00 এবং 250 গজ
1/25,000	500 গজ	20 গজ, 50 গজ এবং 100 গজ

উল্টো দিকে (On the back)

1 ইঞ্চি মানে 1 মাইল	1,000 গজ	100 গজ এবং 250 গজ
1/4 ইঞ্চি মানে 1 মাইল	4,000 গজ	1000 গজ
1/4 ইঞ্চি মানে 1 মাইল	1 মাইল	1/4 মাইল
1/4 ইঞ্চি মানে 1 মাইল	4,000 মিটার	1,000 মিটার
1/20,000	100 গজ	20 গজ
1 ইঞ্চি মানে 1 মাইল	1,000 মিটার	100 মিটার এবং 250 মিটার

সামরিক চাঁদার ব্যবহারিক প্রয়োগ

সাধারণতঃ নীচে লেখা কাজ দুটোতে সামরিক চাঁদা ব্যবহার করা হয় :—

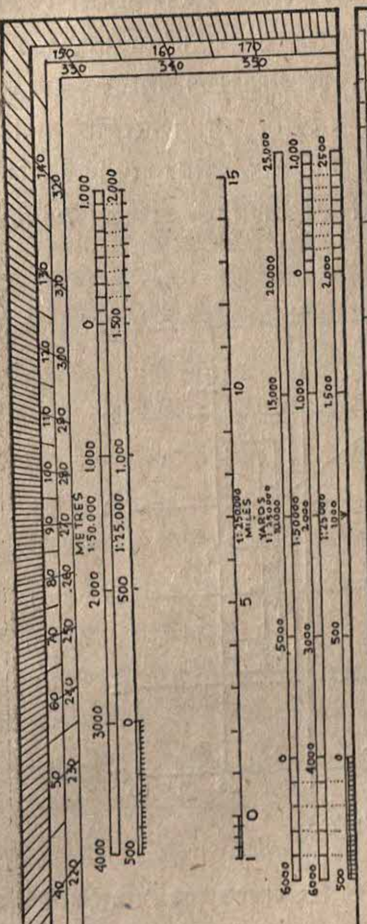
(i) মানচিত্রে বেয়ারিং মাপতে, এবং

(ii) ভূ-পৃষ্ঠে কম্পাসের সাহায্যে কোন বস্তুর বেয়ারিং দেখে তাকে

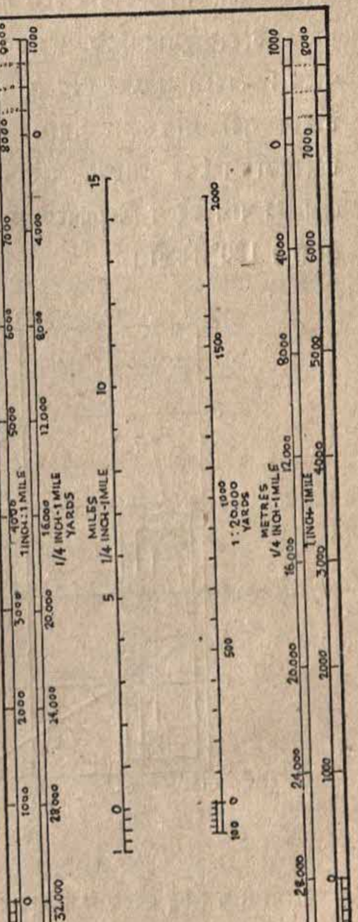
মানচিত্রে চিহ্নিত করতে।

(i) মানচিত্রে বেয়ারিং মাপা

সামরিক চাঁদার সাহায্যে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর বেয়ারিং মানচিত্রেই মাপা যায়, ভূ পৃষ্ঠে নয়। মানচিত্রে বেয়ারিং মাপার পদ্ধতিটি কিন্তু



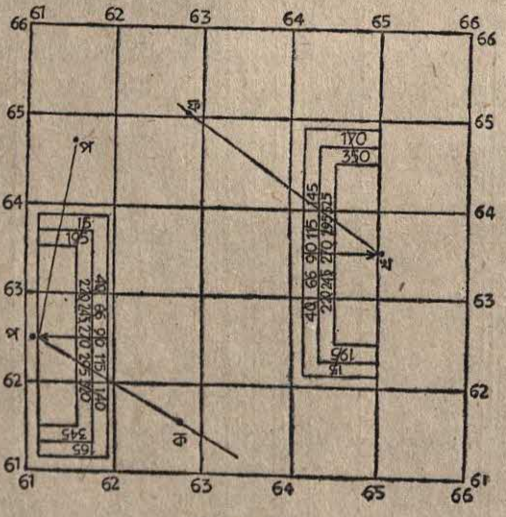
চিত্র : 7·1



চিত্র : 7·2

খুবই সহজ—অল্প অভ্যাসেই এই বিষয়ে দক্ষতা লাভ করা যায়। উদাহরণের সাহায্যে পদ্ধতিটি নীচে বর্ণনা করা হচ্ছে।

যদি প বিন্দু থেকে ক বিন্দুর বেয়ারিং মাপতে হয় তাহলে বিন্দুদুটোকে একটি সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করতে হবে। ক বিন্দুটি প বিন্দুর ডানদিকে অবস্থিত বলে প বিন্দুর ডানদিকে সামরিক চাঁদাটিকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে চাঁদার ইনার এজে অবস্থিত তীরচিহ্নের মাথাটি প বিন্দুকে ছুঁয়ে থাকে; খেয়াল রাখতে হবে যে প বিন্দুর উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখার সঙ্গে যেন চাঁদার লম্বা প্রান্তগুলো সমান্তরাল থাকে। কপ সরলরেখাটি সামরিক চাঁদারডান দিকের প্রান্তের বাইরের সারির যে রেখাটির সঙ্গে মিশেছে সেই রেখাটির মাপাঙ্কই প বিন্দু থেকে ক বিন্দুর বেয়ারিং—এক্ষেত্রে (7·3 চিত্র দ্রষ্টব্য) 120° ডিগ্রী।



চিত্র : 7·3

আবার, খ বিন্দু থেকে ফ বিন্দুর বেয়ারিং মাপতে হলে সামরিক চাঁদা-টিকে খ বিন্দুর বাঁদিকে রাখতে হত, কেননা ফ বিন্দু খ বিন্দুর বাঁদিকে অবস্থিত। এখানে চাঁদাটির বাইরের সারির রেখার মাপাঙ্কর পরিবর্তে ভিতরের সারির রেখার মাপাঙ্ক দেখতে হবে—তাহলে দেখা যাবে খ বিন্দু থেকে ফ বিন্দুর বেয়ারিং 305° ডিগ্রী (7·3 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বিন্দু তুটোর সংযোগকারী রেখার দৈর্ঘ্য যদি সামরিক চাঁদার প্রস্থের চাইতে ছোট হয় তাহলে যে বিন্দুর বেয়ারিং বের করতে হবে (উপরের ক্ষেত্রতুটোতে ক বিন্দু এবং ফ বিন্দু) সেই বিন্দুর দিকে সংযোগকারী রেখার দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দিতে হবে।

(ii) কম্পাসের সাহায্যে ভু-পৃষ্ঠে কোন বস্তুর বেয়ারিং দেখে তাকে সামরিক চাঁদার সাহায্যে মানচিত্রে চিহ্নিত করা

এখানে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে কম্পাসের সাহায্যে যে-বেয়ারিং দেখা যায়, তা হচ্ছে চৌম্বক বেয়ারিং ; আর সামরিক চাঁদার সাহায্যে যে-বেয়ারিং চিহ্নিত করা যায়, তা হচ্ছে গ্রিড্ বেয়ারিং। কাজেই মানচিত্রে দেওয়া প্রান্তীয় তথ্যের সাহায্যে প্রথমে কম্পাসের সাহায্যে পাওয়া চৌম্বক বেয়ারিংকে গ্রিড্ বেয়ারিংএ পরিবর্তিত করে নিতে হবে।

এসব করার আগেই কিন্তু মানচিত্রটিকে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করে মানচিত্রে পর্যবেক্ষকের বিন্দুটিকে সনাক্ত করে নিতে হয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে মানচিত্রটিকে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা, দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ভু-পৃষ্ঠে যে-জায়গায় পর্যবেক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন সন্নিবেশিত মানচিত্রে সেই বিন্দুটিকে সনাক্ত করা, তৃতীয় কাজ হচ্ছে কম্পাসের সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের কোন বস্তুর বেয়ারিং দেখা, চতুর্থ কাজ হচ্ছে মানচিত্রে প্রদত্ত প্রান্তীয় তথ্যের সাহায্যে চৌম্বক বেয়ারিং থেকে গ্রিড্ বেয়ারিং নির্ধারণ করা,—এই কাজগুলো সারা হলে সামরিক চাঁদার সাহায্যে মানচিত্রে বেয়ারিং চিহ্নিত করা যায়।

মানচিত্রে পর্যবেক্ষকের অবস্থিতি যদি 'চ' বিন্দুতে সনাক্ত করা হয়, তাহলে ইষ্টিং গ্রিড্রেখাগুলোর সমান্তরাল করে চ বিন্দুর উপর দিয়ে একটি সরলরেখা আঁকতে হবে। এবার চ বিন্দু থেকে অভিলক্ষ্য বস্তুর বেয়ারিং চিহ্নিত করতে হবে।

ধরা যাক অভিলক্ষ্য বস্তুটির গ্রিড্ বেয়ারিং নির্ণীত হয়েছে 120° ডিগ্রী —অর্থাৎ 180° ডিগ্রীর কম। এক্ষেত্রে সামরিক চাঁদাটিকে রাখতে হবে চ বিন্দুর ডানদিকে, কিন্তু অভিলক্ষ্য বস্তুর গ্রিড্ বেয়ারিং যদি 180° ডিগ্রীর বেশী হত তাহলে সামরিক চাঁদাটিকে রাখতে হত চ বিন্দুর বাঁদিকে। উভয়-

ক্ষেত্রেই অবশ্য সামরিক চাঁদাটিকে এমনভাবে রাখতে হবে যে ঐ চাঁদার তীরচিহ্নটি চ বিন্দুর প্রতি মুখ করে থাকে ; সামরিক চাঁদার ইনার একটি যেন চ বিন্দুতে আঁকা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত সরলরেখাটির সঙ্গে প্রায় মিশে থাকে, এবং সামরিক চাঁদাটির লম্বাপ্রান্তগুলো যে ঐ সরলরেখার সঙ্গে সমান্তরাল থাকে।

আলোচ্য উদাহরণে অভিলক্ষ্য বস্তুর নির্ণীত গ্রিড্ বেয়ারিং হচ্ছে 120° ডিগ্রী, তাই চাঁদাটি রাখা হয়েছে চ বিন্দুর ডানদিকে। এবার চাঁদাটির বাহির-প্রান্তে বাইরের সারিতে যে মাপাঙ্কগুলো লেখা আছে তাদের মধ্যে 120° ডিগ্রীর বিন্দুটি খুঁজে বের করতে হবে। বিন্দুটি পেয়ে গেলে ঐ বিন্দুটির বরাবর চাঁদার বাহিরপ্রান্তে মানচিত্রের উপর পেন্সিল দিয়ে বিন্দুটি চিহ্নিত করতে হবে—এই বিন্দুটির নাম রাখা হোক 'ছ'। এবার সামরিক চাঁদাটিকে সরিয়ে চ বিন্দুর সঙ্গে ছ বিন্দুকে একটি সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করতে হবে। চছ রেখাটিই চ বিন্দু থেকে 120° ডিগ্রী সূচক রেখা। অভিলক্ষ্য বস্তুটি এই রেখার উপরই অবস্থিত। যেহেতু চছ রেখার উপর অনেক বস্তুরই অবস্থিতি সেহেতু ঐ রেখাটির উপর অভিলক্ষ্য বস্তুর সাঙ্কেতিক চিহ্নটি খুঁজে বের করতে হবে। ধরা যাক, আলোচ্য উদাহরণে অভিলক্ষ্য বস্তুটি ছিল একটি গির্জা, যদি চছ রেখার উপর গির্জাটির সাঙ্কেতিক চিহ্নটি পাওয়া যায় তাহলে বোঝা যাবে যে কাজটি নির্ভুল হয়েছে। যদি চছ রেখায় কোন গির্জার সাঙ্কেতিক চিহ্ন না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সমস্ত প্রক্রিয়ার কোন না কোন স্তরে ভুল হয়েছে—তখন পুরো প্রক্রিয়াটি আবার করাই বিধেয়।

যদি অভিলক্ষ্য বস্তুটির নির্ণীত গ্রিড্ বেয়ারিং 180° ডিগ্রীর বেশী হত, তা হলে চ বিন্দুর বাঁদিকে বসাতে হত সামরিক চাঁদাটিকে—একথা ত আগেই বলা হয়েছে। ধরা যাক নির্ণীত গ্রিড্ বেয়ারিং হচ্ছে 210° ডিগ্রী। তা হলে চ বিন্দুর বাঁদিকে সামরিক চাঁদাটিকে ঠিকমত বসিয়ে সামরিক চাঁদার বাহির-প্রান্তে ভিতরের সারির মাপাঙ্কগুলোতে 210° ডিগ্রী সূচক বিন্দুটি খুঁজতে হত, এবং ঐ বিন্দুটি পাবার পর মানচিত্রে তাকে চিহ্নিত করতে হত—মানচিত্রে ঐ বিন্দুর নাম রাখা যাক ট বিন্দু। এবার সামরিক চাঁদাটি সরিয়ে চ বিন্দুর সঙ্গে ট বিন্দুকে সংযুক্ত করে চট রেখাটি আঁকতে হবে। চট সরলরেখাটি চ বিন্দুতে 210° ডিগ্রী সূচক রেখা—কাজেই এবার

অভিলক্ষ্য বস্তুটির সাঙ্কেতিক চিহ্ন এই চট রেখার উপর খুঁজে পেতে হবে। ধরা যাক অভিলক্ষ্য বস্তুটি হচ্ছে একটি সেতু—যদি চট রেখা সেতুটির সাঙ্কেতিক চিহ্নের মধ্যবিন্দুর উপর দিয়ে প্রসারিত হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে সমস্ত প্রক্রিয়াটি নির্ভুল হয়েছে—অন্যরকম কিছু হলে বুঝতে হবে যে প্রক্রিয়াটির কোথাও ভুল হয়েছে। তখন পুরো প্রক্রিয়াটি আবার গোড়ার থেকে করা বিধেয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত বস্তুকে মানচিত্রে সনাক্তকরণ এবং মানচিত্রে প্রদর্শিত বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠে সনাক্তকরণ

(Location and Identification of objects from Ground to Map and vice-versa)

মানচিত্র পাঠের সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ হয় ভূ-পৃষ্ঠস্থিত কোন বস্তুকে মানচিত্রে চিহ্নিত করা এবং মানচিত্রে দেখানো বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠে সনাক্ত করার কাজে। কাজগুলো সহজ এবং উপভোগ্য—এমনকি এক ধরণের খেলাও বলা চলে। এই কাজগুলোতে দক্ষতা লাভ করার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই যথেষ্ট অভ্যাস করতে হয়।

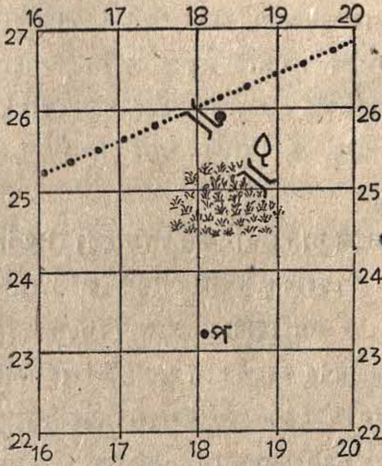
মানচিত্র পাঠ সম্বন্ধীয় যে-কোন কাজ করতে গেলে সবচেয়ে আগে মানচিত্রটিকে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করতে হয় এবং পর্যবেক্ষকের অবস্থিতির জায়গাটি মানচিত্রে সনাক্ত করে নিতে হয়।

ভূ-পৃষ্ঠস্থিত বস্তুগুলোকে মানচিত্রে সনাক্ত করা যায় প্রধানতঃ দুটো পদ্ধতিতে—(i) ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত এবং মানচিত্রে প্রদর্শিত অন্যান্য প্রতিবেশী বস্তুর সাহায্যে (with the help of details), এবং (ii) 'ইণ্টারসেকশন (Intersection)' বা ছেদবিন্দুর সাহায্যে—এই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

(i) **প্রতিবেশী বস্তুর সাহায্যে** (with the help of details)

পর্যবেক্ষক তাঁর উত্তর-পূর্ব দিকে দুটো সিমেণ্টের সাঁকো বা কালভার্ট দেখলেন এবং অনুমান করলেন যে একটি কালভার্টের কাছাকাছি ঝোঁপের মধ্যে কিছু শত্রুসৈন্য লুকিয়ে আছে। এখন সেই বিশেষ কালভার্টটি তাঁকে মানচিত্রে সনাক্ত করতে হবে। তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত দুটো কালভার্টকেই ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন—তাঁর নজরে পড়ল যে বিশেষ কালভার্টটির পাশ ঘেঁষে টেলিগ্রাফের তার গেছে আর অন্য কালভার্টটির পাশে সেরকম কোন তার নেই। দ্বিতীয় কালভার্টটির পাশে একটি বড় আমগাছ আছে; কিন্তু প্রথমটির পাশে ঝোপঝাড় থাকলেও কোন বড় গাছ নেই। এবার তিনি মানচিত্রে তাঁর নিজস্ব অবস্থিত জায়গা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে

কালভার্টদুটো খুঁজতে থাকবেন। কালভার্টদুটো পেলে তিনি মানচিত্রে দেখতে থাকবেন কোন কালভার্টটির পাশে টেলিগ্রাফের তার আছে আর কোনটির ধারে কাছে আছে একটা বড় গাছ। যে-কালভার্টটির পাশে কোন



চিত্র : 8·1

বড় গাছ নেই, কিন্তু টেলিগ্রাফের তার আছে সেই কালভার্টটিই তাঁর লক্ষ্য-বস্তু। এবার তিনি মানচিত্র থেকে তাঁর লক্ষ্যবস্তুটির অবস্থিতির উল্লেখ করবেন ছয় সংখ্যার পদ্ধতিতে।

উপরের উদাহরণটিতে নৈসর্গিক বস্তু ছাড়াও মানুষের তৈরী বিষয়ের কথা আছে, যেমন কালভার্ট এবং টেলিগ্রাফের তার। কিন্তু যে-সব জায়গায় মানুষের তৈরী কোন জিনিস নেই সেখানেও এই পদ্ধতিতে কাজ করা সম্ভব। ধরা যাক পর্যবেক্ষক দেখলেন যে তাঁর উত্তর-পূর্বদিকে অনেক ঝোপঝাড় আছে, কিন্তু কোন কৃত্রিম জিনিস—অর্থাৎ মানুষের তৈরী কোন জিনিস নেই। অথচ ঐ ঝোপঝাড়গুলোর একটি ঝোপের দক্ষিণপাশে শত্রুসৈন্য রয়েছে। তখন তিনি শত্রুসৈন্যের অবস্থিতির জায়গাটির উল্লেখ করবেন কি ভাবে? তাঁকে তখন শত্রুসৈন্যের অবস্থিতির জায়গাটি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তিনি দেখলেন যে, যে-ঝোপটির পাশে শত্রুসৈন্য আছে সে-ঝোপটির কাছে মাত্র একটি তাল গাছ, অন্য ঝোপগুলোতে রয়েছে একাধিক তাল গাছ। আর শত্রুসৈন্যের অবস্থিতির জায়গা থেকে অল্প দূরে একটি

জলধারা আছে—অন্য ঝোপগুলো থেকে তুলনামূলকভাবে জলধারাটি কিছুটা দূরে। এইবার পর্যবেক্ষক মানচিত্রটিতে তাঁর নিজস্ব অবস্থিতির জায়গা থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ঝোপগুলো এবং উল্লিখিত জলধারাটি খুঁজবেন। এবার দেখবেন, ঐ ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে কোনটি জলধারাটির নিকটতম এবং আর ঐ ঝোপটির পাশে তালগাছ রয়েছে কয়টি। জলধারার নিকটতম যে-ঝোপটির পাশে মাত্র একটি তালগাছ আছে সেই ঝোপটিই তাঁর লক্ষ্যবস্তু। এবার তিনি ঝোপটির অবস্থিতির স্থান উল্লেখ করবেন ছয় সংখ্যার পদ্ধতিতে।

(ii) ইন্টারসেকশন বা ছেদবিন্দুর সাহায্যে (By intersection)

ইন্টারসেকশন বা ছেদবিন্দু কথাটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে দুটো সরলরেখার ছেদ অপরিহার্য্য। বাস্তবিকপক্ষে এই পদ্ধতিতে দূরস্থিত কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করতে হলে অন্য দুটি বস্তুর অবস্থিতির স্থান থেকে দুটি সরলরেখা টানতে হয়—এই রেখাদুটির ছেদবিন্দুতে অভিলক্ষ্য বস্তুটির অবস্থিতি নির্ধারিত হয়। দুইভাবে এই পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে—(ক) কম্পাসের সাহায্যে, এবং (খ) সাইট রুলের সাহায্যে।

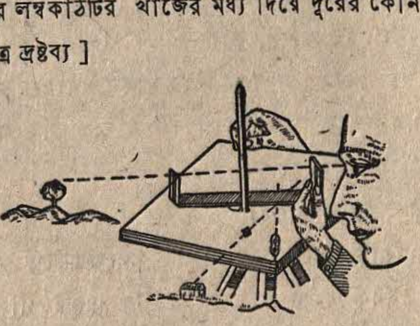
(ক) কম্পাসের সাহায্যে

মানচিত্রটি সন্নিবেশিত করার পর ভূ-পৃষ্ঠে এমন দুটি বস্তু বেছে নিতে হবে যেগুলোর সঙ্গে নিকট সাদৃশ্য আছে এমন কোন বস্তু ঐ জায়গায় নেই, অর্থাৎ দুটো অনন্য বস্তু বেছে নিতে হবে। যেহেতু বস্তুদুটি অনন্য সেহেতু মানচিত্রেও তাদের সহজে খুঁজে বের করা যায়। ধরা যাক, এমনি দুটো অনন্য সাধারণ বস্তু হচ্ছে একটি পাকা রাস্তার মোড়, এবং আরেকটি হচ্ছে একটি ঝর্ণা। ভূ-পৃষ্ঠস্থিত যে বস্তুটির মানচিত্রে অবস্থিতি সনাক্ত করতে হবে, ধরা যাক, সেটি হচ্ছে একটি বড় গাছ। এবার পাকা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অভিলক্ষ্যটির বেয়ারিং মাপতে হবে কম্পাসের সাহায্যে, আরেকবার ঝর্ণার কাছে দাঁড়িয়ে অভিলক্ষ্য গাছটির বেয়ারিং বের করতে হবে। বলা বাহুল্য এই দুটো বেয়ারিংই হবে বড় রাস্তার মোড় এবং ঝর্ণা থেকে অভিলক্ষ্য গাছটির চৌম্বক বেয়ারিং। এই চৌম্বক বেয়ারিং দুটোকে গ্রিড্ বেয়ারিং-এ রূপান্তরিত করতে হবে। তারপর সামরিক চাঁদার সাহায্যে মানচিত্রটিতে বড় রাস্তার মোড় এবং ঝর্ণা থেকে গ্রিড্ বেয়ারিং অনুযায়ী দুটো সরলরেখা টানতে হবে। এই রেখাদুটো যে বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করবে সেই ছেদবিন্দুতেই

অভিলক্ষ্য বড় গাছটির অবস্থিতি। সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন বস্তুর মানচিত্রে অবস্থিতি নিখুঁতভাবে বের করা যায়।

(খ) সাইট রুলের সাহায্যে

সাইট রুল (Sight rule) একটি সাদামাঠা সরঞ্জাম। সাধারণতঃ এক ফুট লম্বা একটি কাঠের দুই প্রান্তে সমান উচ্চতার দুটি কাঠ লম্বভাবে জুড়ে এটি তৈরী হয়—লম্বভাবে জোড়া কাঠ দুটোর প্রান্তভাগে একটি করে ছোট্ট খাঁজ কাটা থাকে। সাইট রুলের একপ্রান্তস্থিত লম্বকাঠটির খাঁজে চোখ রেখে অন্য প্রান্তের লম্বকাঠটির খাঁজের মধ্য দিয়ে দূরের কোন জিনিস দেখতে হয়। [8·2 চিত্র দ্রষ্টব্য]



চিত্র : 8·2

মানচিত্রটি সন্নিবেশিত করার পর মানচিত্রটিতে পর্যবেক্ষকের স্থান চিহ্নিত করতে হবে। এবার মানচিত্রটিতে পর্যবেক্ষকের স্থান থেকে অভিলক্ষ্য বস্তুটির দিকে সাইট রুলের সাহায্যে একটি সরলরেখা টানতে হবে। তারপর পর্যবেক্ষক কাছাকাছি অন্য এক জায়গায় সরে যাবেন, এবং মানচিত্রে তাঁর এই নূতন অবস্থিতির জায়গাটি চিহ্নিত করবেন। এবার এই জায়গা থেকে সাইট রুলের সাহায্যে অভিলক্ষ্য বস্তুটির দিকে আরেকটি সরলরেখা আঁকবেন। এই দ্বিতীয় সরলরেখাটি যে বিন্দুতে প্রথম সরলরেখাটিকে ছেদ করবে সেই ছেদবিন্দুতে অভিলক্ষ্য বস্তুটির অবস্থিতি।

সাইট রুলের পরিবর্তে ফুটরুলার দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে।

উপরে আলোচিত সব কয়টি পদ্ধতির মধ্যে অবশ্যই কম্পাসের সাহায্যে অভিলক্ষ্য বস্তুর অবস্থিতির জায়গা নির্ধারণ করার পদ্ধতিটিই সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য।

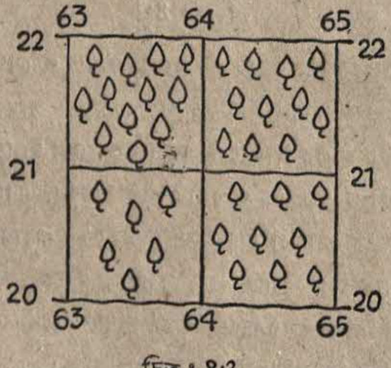
এতক্ষণ ত ভূ-পৃষ্ঠস্থ বস্তুকে মানচিত্রে খুঁজে বের করার পদ্ধতি সম্বন্ধে

আলোচনা করা হল, এবার বলা হচ্ছে মানচিত্রে প্রদর্শিত বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠে সনাক্ত করার পন্থাগুলো। তিনভাবে এ কাজ করা যায়—(i) প্রতিবেশী বস্তুর সাহায্যে, (ii) বেয়ারিং-এর সাহায্যে, এবং (iii) সরলরেখার সাহায্যে।

মানচিত্রে প্রদর্শিত বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠে খুঁজতে হয় নানা কারণে। হয়ত একটি ছোট সৈন্যদলকে বলা হল এই মানচিত্রটির 638212 জায়গায় শত্রুপক্ষ এইটি মাইন বসিয়ে রেখে গেছে—এবার ঐ মাইনটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তখন ছোট সৈন্যদলের নায়ক কি করবেন? প্রথমে মানচিত্রটিতে দেখবেন 638212 জায়গাটিতে কি আছে, তারপর ঐ জিনিসটিকে ভূ-পৃষ্ঠে সনাক্ত করবেন—তবে ত তিনি সেখানে গিয়ে মাইন সরাবার বন্দোবস্ত করবেন। এই প্রসঙ্গে যে সব পদ্ধতির নাম আগে বলা হয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা নীচে করা হচ্ছে।

(i) প্রতিবেশী বস্তুর সাহায্যে

পর্যবেক্ষক মানচিত্রে দেখলেন 6321 বর্গক্ষেত্রটিতে অনেক কয়টা গাছ আছে—638212 বিন্দুটিতেও ঐ একই জাতীয় একটি গাছ আছে। তবে



চিত্র: 8·3

ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক কোন গাছটি তাঁর লক্ষ্যবস্তু বুঝবেন কি করে? তখন তিনি মানচিত্রটি আবার খুঁটিয়ে দেখবেন—হয়ত তিনি দেখতে পেলেন 638212 বিন্দুতে যে-গাছটি আছে তার দক্ষিণদিকে একটি মজে যাওয়া কুঁয়ো এবং পূর্বদিকে একটি জলসমেত কুঁয়ো আছে। এখন তিনি 6321 বর্গক্ষেত্রটিতে গিয়ে যে গাছটির দক্ষিণে এবং পূর্বে এই ধরনের কুঁয়ো দেখবেন সেই গাছটিই

তাঁর অভিলক্ষ্য বস্তু।

(ii) কম্পাসের সাহায্যে

প্রথমে পর্যবেক্ষক মানচিত্রে তাঁর অবস্থিতির জায়গা থেকে 638212 বিন্দুটির গ্রিড্ বেয়ারিং বের করবেন। এবার ঐ গ্রিড্ বেয়ারিংটিকে চৌম্বক বেয়ারিং-এ রূপান্তরিত করবেন। তারপর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কম্পাসে ঐ চৌম্বক বেয়ারিং-এ যে গাছটি দেখতে পাবেন সেটিই তাঁর অভিলক্ষ্য গাছ।

(iii) সরলরেখার সাহায্যে

পর্যবেক্ষক মানচিত্রটিতে তাঁর নিজস্ব অবস্থান বিন্দুর সঙ্গে 638212 বিন্দুটিকে একটি সরলরেখার সাহায্যে যুক্ত করবেন। মানচিত্রে এই সরলরেখাটির দৈর্ঘ্য মাপবেন, তারপর মানচিত্রের স্কেল অনুযায়ী সরলরেখাটির দৈর্ঘ্য ভূ-পৃষ্ঠে কতটা হওয়া উচিত তা নির্ণয় করবেন। এবার মানচিত্রে আঁকা সরলরেখাটির পাশে সাইট রুল বা ফুটরুলার ফেলে নির্ধারিত দূরত্ব পর্যন্ত একটি কল্পিত সরলরেখা টানবেন। নির্দিষ্ট দূরত্বে কল্পিত সরলরেখাটি যে-গাছটিকে স্পর্শ করবে সেটিই অভিলক্ষ্য গাছ।

বলা বাহুল্য যে এই পদ্ধতি তিনটির মধ্যে কম্পাসের সাহায্য নিয়ে অভিলক্ষ্য বস্তু সনাক্ত করার পদ্ধতিটিই সবচেয়ে ভালো। এই পদ্ধতিতে ভুল বস্তু সনাক্ত হওয়ার আশংকা কম। প্রতিবেশী বস্তুর সাহায্যে অভিলক্ষ্য বস্তু বের করাও কঠিন নয়, কিন্তু সরলরেখার সাহায্যে অভিলক্ষ্য বস্তু নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা সহজসাধ্য নয়।

নবম পরিচ্ছেদ

নক্সা আঁকা
(Sketching)

সাধারণতঃ কোন একটি অঞ্চলের জরীপ শেষ করে তার মানচিত্র ছাপতে যথেষ্ট সময় কেটে যায়। সেই সময়ের মধ্যে জরীপ করা জায়গাটিতে নৈসর্গিক কারণে এবং মানুষের নানাবিধ কাজকর্মের ফলে অঞ্চলটির চেহারার কিছু—হয়ত বা তা খুবই সামান্য—পরিবর্তন ঘটে। একই জায়গায় বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির গাছ জন্মায়, শস্যক্ষেত্রগুলোর চেহারাও ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। আর জরীপ করার কয়েক বছর পর ত অঞ্চলটির বড় রকমের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এই সব নানা কারণে কোন মানচিত্রই কোন জায়গার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জাহির করতে পারে না। অথচ যুদ্ধের কাজে অনেক আপাততুচ্ছ বস্তুরও গুরুত্ব থাকে। তাই যখন যেখানে কোন সৈন্যদল—ছোট বা বড়—যুদ্ধের কাজে যায়, তখনই সেখানকার সমস্ত তথ্যসহ নক্সা এঁকে নিতে হয়। এই জন্য সামরিক বাহিনীর সকল সৈন্যকেই নক্সা আঁকার কাজটি শিখতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা উচিত যে কোন একটি অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করতে যত সময় দেওয়া যায়, নক্সা আঁকতে কিন্তু তার অনেক কম সময় পাওয়া যায়। যাঁরা সামরিক কাজের জন্য নক্সা আঁকেন তাঁদের কারিগরী দক্ষতাও মানচিত্র নির্মাতাদের তুলনায় কম। তাড়াহুড়ো করে তুলনামূলকভাবে অল্পদক্ষ লোকরা যে নক্সাগুলো তৈরি করেন তাদের বলা হয় 'ফিল্ড্ স্কেচ (Field Sketch)'।

ফিল্ড্ স্কেচ তৈরীর প্রধান দুটো উদ্দেশ্য—(i) মানচিত্রে যে-সব তথ্য দেওয়া নেই তাদের সংযোজন—প্রয়োজন হলে মানচিত্রে দেওয়া তথ্যাদির পরিবর্তন, এবং (ii) সামরিক রিপোর্টকে সহজবোধ্য করার জন্য সচিত্র তথ্য দেওয়া।

ফিল্ড্ স্কেচ মানচিত্রের মত প্রামাণ্যচিত্র না হলেও তাতে যে-সব তথ্য থাকে সেগুলো নির্ভুল হতে হয়। ফিল্ড্ স্কেচের প্রধান দুটো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঝটপট তৈরি করা নক্সা এবং এতে সমস্ত তথ্য না থাকলেও যে-সব তথ্য থাকে সেগুলো সামরিক কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য। অভ্যাস করলে ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি করার দক্ষতা বাড়ে। সেইজন্য ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি

করার প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায় থেকেই নীচে লেখা বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়ঃ

(i) নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি করতে হবে ;

(ii) ফিল্ড্ স্কেচটি পরিষ্কার ও সহজবোধ্য হওয়া চাই ;

(ii) ফিল্ড্ স্কেচটিতে দেওয়া তথ্যগুলো উদ্দেশ্যানুগ এবং নির্ভুল হতে হবে ; এবং

(iv) ফিল্ড্ স্কেচটিতে যতদূর সম্ভব সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য থাকা উচিত।

ফিল্ড্ স্কেচের শ্রেণী (Type of field sketches)

ফিল্ড্ স্কেচগুলোকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(i) যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধীয় বা ট্যাকটিক্যাল (Tactical), এবং (ii) সংবাদ সম্বন্ধীয় বা ইনফরম্যাটিভ্ (Informative)।

যুদ্ধের কোন বিশেষ কাজ পরিকল্পনা করা এবং ঐ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য তৈরী হয় ট্যাকটিক্যাল ফিল্ড্ স্কেচ। কিন্তু ইনফরম্যাটিভ্ ফিল্ড স্কেচগুলো তৈরী হতে থাকে মানচিত্রে দেওয়া তথ্যগুলোর পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং সংযোজনের জন্য। ট্যাকটিকাল ফিল্ড্ স্কেচগুলো তৈরী করা হয় যুদ্ধ লাগার ঠিক পূর্বমুহূর্তে এবং যুদ্ধ চলাকালে, আর ইনফরম্যাটিভ্ স্কেচগুলো সাধারণতঃ অনবরত তৈরি করতে থাকে সীমান্ত প্রহরীর দল অথবা দূর পাল্লার পেট্রল (Patrol)। ট্যাকটিক্যাল ফিল্ড্ স্কেচে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো থাকলেই চলে, কিন্তু ইনফরম্যাটিভ স্কেচগুলোতে সমস্ত তথ্য থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে।

ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি করার নীতি ও রীতি (Principles of making field sketches)

সাধারণতঃ ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি করার সময় নীচে লেখা নীতি ও রীতিগুলো মানা হয়ঃ

(ক) ভূ-পৃষ্ঠের কতকগুলো বস্তুকে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করে এবং তাদের উচ্চতা নির্ধারণ করে স্কেচ তৈরী কাগজটিতে যথাযথভাবে তাদের চিহ্নিত করা হয়। এদের বলা হয় 'কন্ট্রোল পয়েন্ট (Control

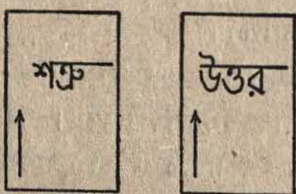
Point) বা নির্দ্ধারিত বস্তু'।

(খ) ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তারিত তথ্য সন্ধান করার জন্য নিকটতম কণ্ট্রোল পয়েন্ট থেকে তল্লাসী শুরু করতে হয়—তল্লাসী চলে বাঁদিক থেকে ডানদিকে।

(গ) একটি কণ্ট্রোল পয়েন্ট থেকে আরেকটি কণ্ট্রোল পয়েন্ট পর্যন্ত তথ্য অনুসন্ধান শেষ হলে এবং সেগুলো স্কেচ করার কাগজটিতে যথাযথ-ভাবে চিহ্নিত হলে, পরবর্তী কণ্ট্রোল পয়েন্ট থেকে তথ্য সন্ধান শুরু করতে হয় ; এই অনুসন্ধানও চলে দক্ষিণাবর্তভাবে।

কাগজ রাখার পদ্ধতি (Orientation of paper) :

যে-কাগজে ফিল্ড্ স্কেচ আঁকা হয় সেই কাগজটির দিক ঠিক করার পন্থা নির্ভর করে ফিল্ড্ স্কেচের প্রকৃতির উপর ; ট্যাকটিক্যাল ফিল্ড স্কেচে কাগজটির



চিত্র : 9·1 চিত্র : 9·2

মাথার দিকে রাখতে হয় শত্রুসৈন্যের অবস্থিতি (9·1 চিত্র দ্রষ্টব্য), কিন্তু ইনফরম্যাটিভ্ ফিল্ড্ স্কেচে উত্তর দিকে নির্দিষ্ট কাগজের উপরের কিনারা (9·2 চিত্র দ্রষ্টব্য)।

স্কেল নির্বাচন (Selection of scale)

মানচিত্রের মত ফিল্ড্ স্কেচও আঁকতে হয় কোন একটি স্কেল অনুযায়ী। কোন একটি ফিল্ড্ স্কেচে কি স্কেল নেওয়া হবে তা নির্ভর করে নীচে লেখা বিষয়গুলোর উপর :

(i) নির্বাচিত অঞ্চলের আয়তন ও নির্ধারিত কাগজটির আয়তনের অনুপাত ;

(ii) প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্যের পরিমাণ ;

(iii) ফিল্ড্ স্কেচটির বিশেষ উদ্দেশ্য ; এবং

(iv) প্রাপ্য সময়।

যখন অনেক বেশী বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন হয় তখন ভূ-পৃষ্ঠের এক

মাইল দৈর্ঘ্যকে সাধারণতঃ স্কেচে ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ দেখান হয়, অর্থাৎ তখন স্কেল দাঁড়ায় "স্কেচের ছয় ইঞ্চি : ভূ-পৃষ্ঠের এক মাইল"। কিন্তু যখন ভূ-পৃষ্ঠের অনেক বড় অঞ্চলের স্কেচ আঁকতে হয় তখন ভূ-পৃষ্ঠের একমাইল দৈর্ঘ্য দেখাতে স্কেচে এক বা দুই ইঞ্চির বেশী জায়গা পাওয়া যায় না।

স্কেল নির্ধারিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্কেচ আঁকার কাগজটিতে নির্বাচিত স্কেলের ভিত্তিতে একটি স্কেল লাইন এঁকে নিতে হয়। এই স্কেল লাইনটির পাশে ভৌগোলিক দিকগুলো, অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম, চিহ্নিত করে দিতে হয়।

এই কাজগুলো ফিল্ড্ স্কেচ আঁকা শুরু করার আগের কাজ।

ভিত্তিরেখা বা ভুমিরেখা বা বেসলাইন (Base line)

যে কোন বাড়ী তৈরি করতে গেলে যেমন সর্বপ্রথম ভিত্তি স্থাপন করতে হয়, অথবা কোন ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ আঁকতে হলে সবার আগে ভূমিরেখা আঁকতে হয়, তেমনি কোন ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি করতে হলে প্রথমে ঠিক করে নিতে হয় ভিত্তিরেখা বা ভূমিরেখা বা বেসলাইন (Base line)। অনেক বিচার-বিবেচনা করে বেসলাইন ঠিক করতে হয়। বেসলাইনের প্রান্তীয় বিন্দুদুটো এমন হওয়া উচিত যে ঐ বিন্দুদুটো থেকে অনেক দূর পর্যন্ত যেন দেখা যায় এবং বিন্দুদুটো যেন পরস্পর দৃশ্যমান হয়। প্রান্তবিন্দুদুটোর অন্তর্বর্তী জমি সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভূ-পৃষ্ঠে বেসলাইনটি নিখুঁতভাবে মেপে নেওয়া প্রয়োজন। ফিল্ড্ স্কেচ আঁকার কাজটিতে ফিল্ড্ স্কেচটির জন্য বেছে নেওয়া স্কেল অনুযায়ী সঠিক মাপে বেসলাইন আঁকতে হয়। ভূ-পৃষ্ঠে বেসলাইন বেছে নেওয়া এবং ফিল্ড্ স্কেচে ত্রুটিহীন বেসলাইন আঁকার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে ফিল্ড্ স্কেচ আঁকার অন্যান্য কাজ।

কাঠাম (The Frame work)

ফিল্ড্ স্কেচের কাঠাম তৈরি করতে হয় ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত কতগুলো বড় বা প্রধান বস্তুর সাহায্যে। প্রধান বস্তু বলতে বোঝায় এমন একটি বস্তু যা তার পরিবেশের অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে গুলিয়ে যায় না, যেমন বিচ্ছিন্ন একটি গাছ, উঁচুতে রাখা জলের আধার, উঁচু মন্দির, ইদগাহ্, ইত্যাদি। এইসব বেছে নেওয়া প্রধান বস্তুগুলোকে বলা হয় 'রুলিং পয়েন্ট (Ruling Point)'। যত বেশী রুলিং পয়েন্ট বেছে নেওয়া যায় ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি করা তত সহজ হয় এবং স্কেচটিও কম ত্রুটিপূর্ণ হয়।

রুলিং পয়েন্টগুলো বেছে নেওয়ার পর বেসলাইন থেকে তাদের বেয়ারিং ও দূরত্ব মেপে ফিল্ড্ স্কেচ আঁকার কাগজটিতে স্কেল অনুযায়ী তাদের সঠিক-ভাবে বসাতে হয়। বেসলাইন আঁকার পর ফিল্ড্ স্কেচ আঁকার কাগজটিতে রুলিং পয়েন্টগুলো ঠিকমত জাহির করা হলেই ফিল্ড্ স্কেচের কাঠাম তৈরী হয়ে যায়।

ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি করার পদ্ধতি (Methods of making field sketch)

নীচে লেখা পদ্ধতিগুলোর যে কোন একটির সাহায্যে ফিল্ড্ স্কেচ তৈরি করা যায় :

(i) প্লেন টেবিল স্কেচিং (Plane Table Sketching) ;

(ii) কম্পাস স্কেচিং (Compass Sketching) ;

(iii) দৃষ্টি ও স্মৃতির সাহায্যে স্কেচিং (Eye and Memory Sketching) ;

এবং (iv) উপর থেকে তোলা ফটোর সাহায্যে স্কেচিং (Sketching from Air-Photos)।

এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কম্পাস স্কেচিং এবং দৃষ্টি ও স্মৃতির সাহায্যে স্কেচিং পদ্ধতিদুটো তুলনামূলকভাবে সহজ। এই পদ্ধতিগুলোই সংক্ষেপে নীচে বর্ণনা করা হচ্ছে।

কম্পাস স্কেচিং (Compass Sketching)

আগেই বলা হয়েছে যে ফিল্ড্ স্কেচ আঁকার প্রথম কাজ হচ্ছে বেসলাইন আঁকা। ভূ-পৃষ্ঠে বেসলাইনের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে যতগুলো সম্ভব রুলিং পয়েন্ট বেছে নিতে হয়। এবার কম্পাসের সাহায্যে বেসলাইনের দুই প্রান্ত ঐ রুলিং পয়েন্টগুলোর বেয়ারিং মাপতে হয়। তারপর বেসলাইনের দুই প্রান্ত থেকে রুলিং পয়েন্টগুলোর দূরত্ব নির্ধারণ করতে হয়। নীচে লেখা পদ্ধতিগুলোর যে-কোন একটির সাহায্যে রুলিং পয়েন্টের দূরত্ব মাপা যায়। ঐ পদ্ধতিগুলোতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা (chance of error) কতটা তা তালিকাকারে নীচে দেওয়া হল।

পদ্ধতি	ভুল হবার সম্ভাবনা
(i) রেঞ্জ ফাইণ্ডার (Range finder)-এর সাহায্যে	250 এককে এক একক
(ii) জানা দৈর্ঘ্যের দড়ি, ফিতা বা	

পদ্ধতি	ভুল হবার সম্ভাবনা
শিকলের সাহায্যে	500 এককে এক একক
(iii) পদক্ষেপ (Pacing)-এর সাহায্যে	50 এককে এক একক
(iv) দূরত্ব-বিচার (Judging distance)-এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে	25 এককে এক একক

প্রথম দুটো পদ্ধতিতে ভুল হবার সম্ভাবনা কম, এবং কোন না কোন সরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল। শেষের পদ্ধতি দুটোতে ভুল হবার সম্ভাবনা বেশী কিন্তু এই পদ্ধতিগুলোতে কোন সরঞ্জাম লাগে না—সামরিক প্রশিক্ষণে প্রতিটি পদক্ষেপে তিরিশ ইঞ্চি দূরত্ব চলতে শেখানো হয় ; এবং নানাভাবে দূরত্ব-বিচার করতেও শেখানো হয়। কাজেই সামরিক প্রশিক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিদের এইসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয় না। এবার বেস-লাইনের সীমান্তবিন্দুগুলো থেকে যে-সব রুলিং পয়েন্টের বেয়ারিং নেওয়া হয়েছিল এবং যাদের দূরত্ব স্থির করা হল সার্ভিস প্রোট্র্যাক্টর এবং ফিল্ড্ স্কেচের স্কেল লাইনের সাহায্যে সেগুলোকে যথাযথভাবে ফিল্ড্ স্কেচ আঁকার কাগজটিতে আঁকতে হবে।

বেসলাইন এবং রুলিং পয়েন্টগুলো আঁকা হয়ে গেলে অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সহজেই আঁকা যায়। কেননা এখন ত অঞ্চলটির অনেকগুলে জায়গাই পরিচিত এবং ফিল্ড্ স্কেচের কাগজে চিহ্নিত হয়ে যায়। যে-কোন একটি রুলিং পয়েন্ট থেকে কম্পাসের সাহায্যে 'রিসেকশন (Resection)' পদ্ধতিতে অন্যান্য বস্তুগুলোর অবস্থিতি নির্ধারণ এবং তাদিগকে ফিল্ড্ স্কেচ আঁকার কাগজে চিহ্নিত করা যায়। কম্পাসের সাহায্যে রিসেকশন পদ্ধতি কি করে ব্যবহার করা যায়? 9·3 ছবিটিতে ধরা যাক, 'ক', 'খ' এবং 'গ' বিন্দু তিনটি হচ্ছে রুলিং পয়েন্ট, আর ভূ-পৃষ্ঠে 'প' বিন্দুর অবস্থিতি ফিল্ড্ স্কেচটিতে দেখাতে হবে। পর্যবেক্ষক ভূ-পৃষ্ঠে 'প' বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে 'ক', 'খ' এবং 'গ' বিন্দুর বেয়ারিং মাপবেন কম্পাসের সাহায্যে। ধরা যাক, 'প' বিন্দু থেকে 'ক', 'খ' এবং 'গ' বিন্দুর বেয়ারিং পাওয়া গেল যথাক্রমে 240° ডিগ্রী, 120° ডিগ্রী এবং 45° ডিগ্রী। এগুলো 'প' বিন্দু থেকে ঐ বিন্দুগুলোর সম্মুখ বেয়ারিং। এই সম্মুখ বেয়ারিংগুলো থেকে 180° যোগ বা বিয়োগ করে পশ্চাৎ বেয়ারিং (back bearing) বের করা যায়—পশ্চাৎ বেয়ারিং আসলে 'ক', 'খ' এবং 'গ' বিন্দু তিনটি থেকে 'প' বিন্দুর

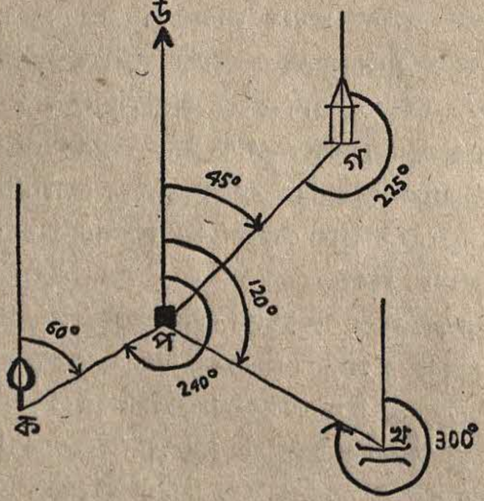
সম্মুখ বেয়ারিং হবে। এবার ঐ বিন্দু তিনটি থেকে 'প' বিন্দুর সম্মুখ বেয়ারিং বের করা যাক্।

ক বিন্দু থেকে প বিন্দুর বেয়ারিং = 240° − 180° = 60°

খ " " প " " = 120° + 180° = 300°

গ " " প " " = 45° + 180° = 225°

কিন্তু স্কেচটিতে ত আগেই 'ক', 'খ' এবং 'গ' বিন্দু তিনটি আঁকা আছে। এবার ঐ বিন্দুগুলোতে সামরিক চাঁদার সাহায্যে 'প' বিন্দুর বেয়ারিং



চিত্র : 9·3

(উপরে যা বের করা হয়েছে) অনুযায়ী সরলরেখা আঁকতে হবে। এই সরলরেখা তিনটি যে-বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করবে বা পরস্পর মিলিত হবে সেই বিন্দুটিতেই 'প' বিন্দুর অবস্থিতি। ফিল্ড্ স্কেচে 'প' বিন্দুর অবস্থিতি ঠিকমত পাওয়া গেল কিনা তাও সহজেই পরীক্ষা করা চলে। ভূ-পৃষ্ঠে 'প' বিন্দু থেকে 'ক', 'খ' এবং 'গ' বিন্দু তিনটির দূরত্ব কি ছিল ? ধরা যাক্, দূরত্ব ছিল যথাক্রমে 150 গজ, 200 গজ এবং 300 গজ (দূরত্ব বের করার পদ্ধতিগুলোর কথা আগেই বলা হয়েছে)। এবার স্কেল লাইনের সাহায্যে ফিল্ড্ স্কেচটিতে 'প' বিন্দুর অবস্থান বিন্দু থেকে 'ক', 'খ' এবং 'গ' বিন্দু তিনটির দূরত্ব মাপতে হবে। যদি এই দূরত্বগুলো ভূ-পৃষ্ঠে মাপা দূরত্বগুলোর সমান

হয় তাহলে বোঝা যাবে যে 'প' বিন্দুর অবস্থিতি নির্ভুলভাবেই ফিল্ড্ স্কেচটিতে চিহ্নিত হয়েছে।

দৃষ্টি ও স্মৃতির সাহায্যে স্কেচিং (Eye and Memory Sketching)

যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্রে বা সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্রে সরঞ্জামের সাহায্যে এবং অনেক সময় নিয়ে নক্সা আঁকা সম্ভব হয় না। তখন চোখে দেখে নিজস্ব আন্দাজ-অনুমানের উপর নির্ভর করেই যুদ্ধক্ষেত্র বা সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্রের নক্সা তৈরী করতে হয়। কখনও বা অকুস্থলে দাঁড়িয়েও নক্সা আঁকা সম্ভব হয় না—তখন জায়গাটিকে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ভালো করে দেখে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়ে স্মৃতির সাহায্যেই নক্সা তৈরি করতে হয়। এইসব নক্সায় বিশেষ গুরুত্ব পায় শত্রুসৈন্যের অবস্থিতি, স্বপক্ষীয় সৈন্যদের বর্তমান অবস্থান, এবং নিজেদের জায়গা থেকে শত্রুসৈন্যের কাছে যাবার পথে সামরিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো (tactical features)। যেহেতু তাড়াহুড়ো করে এবং নিজের আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে এই নক্সা তৈরি করা হয়, তাই এই নক্সা ত্রুটিমুক্ত হয় না—বিশেষ করে একটি বিষয় (feature) থেকে অন্য বস্তুর (feature) দূরত্ব অনুমান করতে কিছু ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। তবে প্রশিক্ষণের সময় বার বার এই রকম ভাবে নক্সা আঁকার অভ্যাস করলে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বাড়ে এবং ভুল-ত্রুটি কমে আসে। যুদ্ধের কাজে—অর্থাৎ আক্রমণ করতে বা পরিকল্পনা করে পশ্চাৎ অপসরণ করতে—এই ধরনের নক্সার তাৎপর্য যথেষ্ট। এই সব পদ্ধতি নিখুঁত না হলেও শিক্ষার্থীদের এই জাতীয় নক্সা তৈরীর কাজ বার বার অভ্যাস করতে হয়।

এই শ্রেণীর নক্সা তৈরি করার সময় স্কেলও ঠিক করতে হয় অনুমানে।

দৃষ্টির সাহায্যে নক্সা তৈরি করার কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় (some importont points for eye Sketching)

এই জাতীয় নক্সা তৈরি করার আগে খুব ভালো করে কম্যাণ্ডারের নির্দেশ বুঝে নিতে হয়, বিশেষতঃ কী কাজের জন্য কম্যাণ্ডার নক্সাটি চান এবং কতক্ষণ সময়ের মধ্যে তাঁকে নক্সাটি দিতে হবে এই বিষয়দুটো সম্পর্কে কোনরকম অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয়।

এই ধরনের নক্সা তৈরি করার সময় পকেট নোটবুকে অথবা কোন শক্ত কার্ডবোর্ডের উপর নক্সা আঁকার কাগজটিকে পিন দিয়ে গেঁথে নিতে হয়। সামরিক চাঁদাই এসব ক্ষেত্রে ফুটরুলারের কাজ করে—কখনও সোজা অথচ

শক্ত কোন কাঠের টুকরো বা গাছের ডাল পেলে তাই দিয়েও কাজ চালানো যায়।

নক্সা তৈরীর সরঞ্জাম যাই হোক নক্সা তৈরি করার কাজে কিন্তু নীচে লেখা নীতিগুলো ঠিকমত মেনে চলতে হয় :

(i) **স্কেল :** পদক্ষেপের সাহায্যে বা অন্য কোনভাবে গজের হিসাবে স্কেল ঠিক করে নিতে হয়—অর্থাৎ জমির 100 গজ নক্সায় এক ইঞ্চিতে জাহির করা হবে, বা ঐ জাতীয় কোন স্কেল বেছে নিতে হয় ; সাধারণতঃ একজন প্রশিক্ষিত সৈনিকের এক পদক্ষেপ তিরিশ ইঞ্চি লম্বা হয়।

(ii) **বেসলাইন :** সর্বপ্রথম বেসলাইনটি যতটা সম্ভব নির্ভুলভাবে মেপে নিয়ে কাগজে আঁকতে হয়।

(iii) **রুলিং পয়েন্ট :** কোন্ কোন্ বিষয় রুলিং পয়েন্ট হবে তা ঠিক করা খুব কঠিন কিছু নয়, কিন্তু রুলিং পয়েন্টগুলোর দূরত্ব এবং দিক (বেয়ারিং) ঠিক করা মুস্কিল। দূরত্ব ঠিক করতে হয় স্কেলের সাহায্যে এবং খানিকটা অনুমানের ভিত্তিতে। বেসলাইন থেকে বা কাছের কোন রুলিং পয়েন্ট থেকে অন্য রুলিং পয়েন্টগুলোর বেয়ারিং বের করার মেঠো পদ্ধতি আছে। নক্সা আঁকার কাগজটিকে মাটির উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন নক্সার বেসলাইনটি জমির বেসলাইনের উপরে বসে। বেসলাইনের যে-বিন্দু থেকে রুলিং পয়েন্টের বেয়ারিং নিতে হবে সেই বিন্দুতে ঘাসের একটি সোজা নলের একটি প্রান্ত বসাতে হবে। ঘাসের নলটি থাকবে কাগজটির উপর আনুভূমিক ভাবে। এইভাবে প্রথম প্রান্তটি বেসলাইনের বিন্দুতে স্থির রেখে নলটিকে এমনভাবে ঘোরাতে হবে যে ঘাস-নলের দ্বিতীয় প্রান্তটি নির্দিষ্ট রুলিং পয়েন্টটির দিকে মুখ করে থাকে। এইবার ঘাস-নলের অবস্থিতি জাহির করে নক্সা আঁকার কাগজটিতে আলতোভাবে একটি পেন্সিলের রেখা আঁকতে হবে, তারপর সামরিক চাঁদার সাহায্যে ঐ রেখাটির বেয়ারিং মাপলেই রুলিং পয়েন্টটির বেয়ারিং পাওয়া যাবে। চোখে দেখে নক্সা আঁকার সময় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে রুলিং পয়েন্টগুলোর দূরত্ব যেন বেশী না হয়—রুলিং পয়েন্ট যত কাছাকাছি হবে ভূলের পরিমাণ তত কম হবে।

বেসলাইনের দুটি প্রান্ত থেকেই প্রতিটি রুলিং পয়েন্টের বেয়ারিং দেখে নেওয়া বিধেয়।

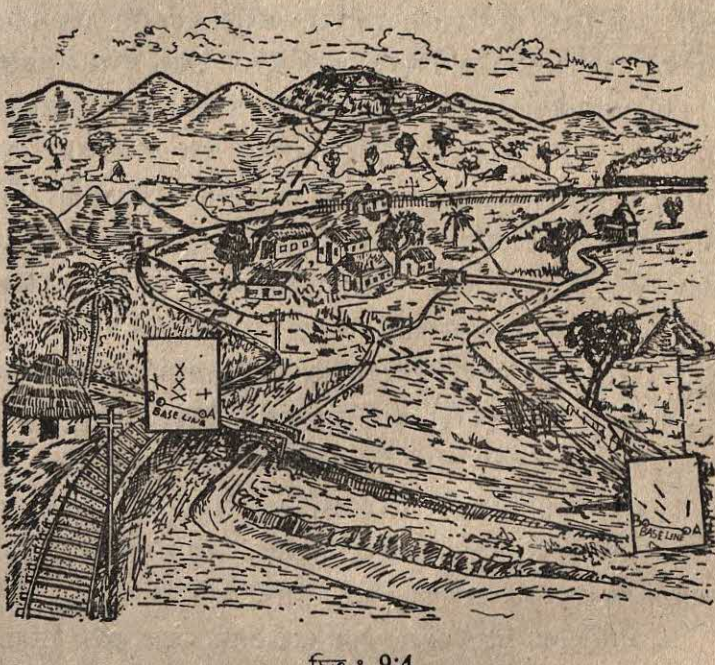
(iv) **ফর্ম লাইন** (Form line) : রুলিং পয়েন্টগুলো নক্সায় আঁকা হয়ে গেলে জমির অন্যান্য ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এক একটি রুলিং পয়েন্টকে ভিত্তি করে চোখে দেখে অনুমানে আঁকতে হয়।

চোখে দেখে নক্সা আঁকার পদ্ধতি (Method of eye sketching)

চোখে দেখে দুভাবে নক্সা আঁকা যায়—(i) কোন সোজা (straight) বস্তুর সাহায্যে, এবং (ii) কম্পাসের সাহায্যে।

(i) সোজা বস্তুর সাহায্যে আঁকার পদ্ধতি

ধারে কাছে যদি শত্রু না থাকে বা নিজস্ব গতিবিধি যদি শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে থাকে তাহলে মোটামুটি ধীরেসুস্থে বেসলাইন ঠিক করে নিতে হয়। ধরা যাক্, **9·4** নং চিত্রে দেখান জায়গাটির নক্সা আঁকতে হবে।



চিত্র : 9·4

এখানে কখ রেখাটি বেসলাইন হিসাবে ঠিক করা হল—'ক' নামক জায়গায় আছে একটি রাস্তার মোড়, আর 'খ' হচ্ছে একটি লেভেল ক্রসিং। 'ক' থেকে 'খ'র দূরত্ব মেপে নেওয়া হল এবং কখ রেখার দূরত্ব নক্সার কাগজে

আঁকার জন্য একটি উপযুক্ত স্কেল তৈরি করে নিতে হবে। এইবার স্কেল অনুযায়ী নক্সার কাগজে বেসলাইন আঁকতে হবে, এবং নক্সার কাগজের একপ্রান্তে স্কেলটি লিখে রাখতে হবে। এবার ক নামক জায়গায় গিয়ে ভূমির কখ রেখার (কাল্পনিক) উপর নক্সার কখ রেখাটিকে যথাযথভাবে স্থাপন করতে হবে। এবার কম্পাসটি পুরোপুরি খুলে নক্সার কাগজের একপ্রান্তে রেখে কম্পাসটিকে ঘোরাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পাসের কাঁটার তীরচিহ্নিত ফলকটি হেয়ার লাইনের দিকে মুখ না করে। এবার নক্সার কাগজটিতে কম্পাসের টাঙের নচ এবং থাম্ব রিং-এর নচের জায়গা দুটো চিহ্নিত করে দুটো বিন্দু বসাতে হবে—বিন্দু দুটো যোগ করলে চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ অক্ষ পাওয়া যাবে। এই অক্ষের যে-প্রান্তে টাঙের নচটি ছিল সেই দিকটি ঐ অঞ্চলের চৌম্বক উত্তর। এবার 'ক' বিন্দু থেকে ভূমির কয়েকটি প্রধান বস্তুর দিকে সরলরেখা টানতে হবে—প্রধান বস্তুগুলো হবে রুলিং পয়েন্ট, আর রেখাগুলো 'ক' বিন্দুতে যে-সব কোণ তৈরি করছে সেগুলো হবে রুলিং পয়েন্টগুলোর বেয়ারিং। ধরা যাক রেখাগুলো টানা হয়েছিল পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত দুর্গ, রেল স্টেশন এবং ডানদিকের একক পাহাড়টির দিকে। রেখাগুলোর মাথায় যথাযথভাবে বিষয়গুলোর নাম লিখে রাখলে পরে গোল পাকাবার সম্ভাবনা থাকে না। এবার 'খ' বিন্দুতে গিয়েও ঐ বিষয়গুলোর প্রতি সরলরেখা টানতে হবে। এই রেখাগুলো 'ক' বিন্দু থেকে আঁকা সরলরেখাগুলোর সঙ্গে যে-সব বিন্দুতে মিলিত হবে ঐসব ছেদবিন্দুগুলো হবে বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলোর নক্সায় অবস্থিতির জায়গা—নক্সার কাগজ খুব ছোট হলে কিন্তু সব কয়টি ছেদবিন্দু কাগজে নাও আসতে পারে, তবে রুলিং পয়েন্ট যদি বেসলাইন থেকে বেশী দূরে অবস্থিত না হয়, তাহলে নক্সার কাগজে তাদের অবস্থিতির জায়গা এইভাবে পাওয়া যাবে। ছেদবিন্দুগুলোতে যথাযোগ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকতে হবে, এবং নক্সার কাগজ থেকে সরলরেখাগুলো মুছে ফেলতে হবে।

এইভাবে রুলিং পয়েন্টগুলো আঁকা হয়ে গেলে, নক্সার মূল কাঠামোটি তৈরী হয়ে যায়। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো চোখে দেখে দেখে বসিয়ে নিতে হয়।

কিন্তু যখন ধারে-কাছেই শত্রুসৈন্য থাকে অথবা শত্রুসৈন্যের নজর এড়িয়ে চলাফেরা করা সম্ভব হয় না, তখন এক জায়গাতে দাঁড়িয়েই নক্সাটি তৈরি

করতে হয়। কম্পাসের সাহায্যে চৌম্বক উত্তরদিক সূচক রেখাটি অাঁকতে হয়, এবং নিজের জায়গার চারিপাশ ভালো করে দেখে নিজের অবস্থিতির জায়গাটা নক্সায় চিহ্নিত করে নিতে হয়। সেই চিহ্নিত জায়গাটি থেকে বিভিন্ন রুলিং পয়েন্টের বেয়ারিং দেখে নিতে হয়, কিন্তু তাদের দূরত্ব অনুমান করে নিতে হয়। তারপর আগের মতই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নক্সায় বসাতে হয় চোখে দেখে দেখে।

(ii) কম্পাসের সাহায্যে নক্সা আঁকার পদ্ধতি

আগের পদ্ধতির মতই এখানেও বেসলাইন, এবং চৌম্বক উত্তর দেখে চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ অক্ষ এঁকে নিতে হবে। তারপর বেসলাইনের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে কম্পাসের সাহায্যে প্রতিটি রুলিং পয়েন্টের বেয়ারিং নিতে হয়, এবং সামরিক চাঁদার সাহায্যে বেসলাইনের দুই প্রান্তে যথাযথভাবে বেয়ারিং অনুসারে সরলরেখা অাঁকতে হয়। সরলরেখার ছেদবিন্দুগুলো রুলিং পয়েন্টের অবস্থিতির জায়গা নির্দেশ করে। এই পদ্ধতিতেও কিন্তু ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয়গুলো চোখে দেখেই নক্সায় বসাতে হয়।

শেষের কাজ (Finishing touches)

নক্সাটি মোটামুটি অাঁকা হয়ে গেলে নীচের লেখা কাজগুলো করতে হয়:

(i) নক্সার মাথায় লিখতে হয় যে নক্সাটি কি চোখে দেখে অাঁকা না স্মৃতি থেকে অাঁকা;

(ii) নক্সার উপর অপ্রয়োজনীয় রেখাগুলো মুছে ফেলতে হয়, এবং প্রতিটি বস্তুর সাংকেতিক চিহ্নগুলো পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলতে হয়;

(iii) প্রধান জায়গাগুলোর নাম পরিষ্কার করে লিখতে হয়;

(iv) এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার পথরেখার উপর জায়গা-দুটোর মধ্যেকার দূরত্ব গজ বা মাইলে লিখতে হয়;

(v) শত্রু যদি ঐ অঞ্চলে উপস্থিত থাকে, তাহলে শত্রুর অবস্থিতির জায়গাগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিতে হয়;

(vi) নক্সার নীচে বাঁ প্রান্তে যে জায়গার নক্সা তার নাম লিখতে হয়, আর লিখতে হয় নক্সাটি তৈরি করার তারিখ, নক্সা তৈরি করার সময়ের প্রাকৃতিক অবস্থা—অর্থাৎ মেঘলা দিন, সূর্যের আলোয়

ঝলমলে দিন, কুয়াশায় ঢাকা সন্ধ্যা, চাঁদের আলোয় ভরা রাত্রি, ইত্যাদি ; এবং

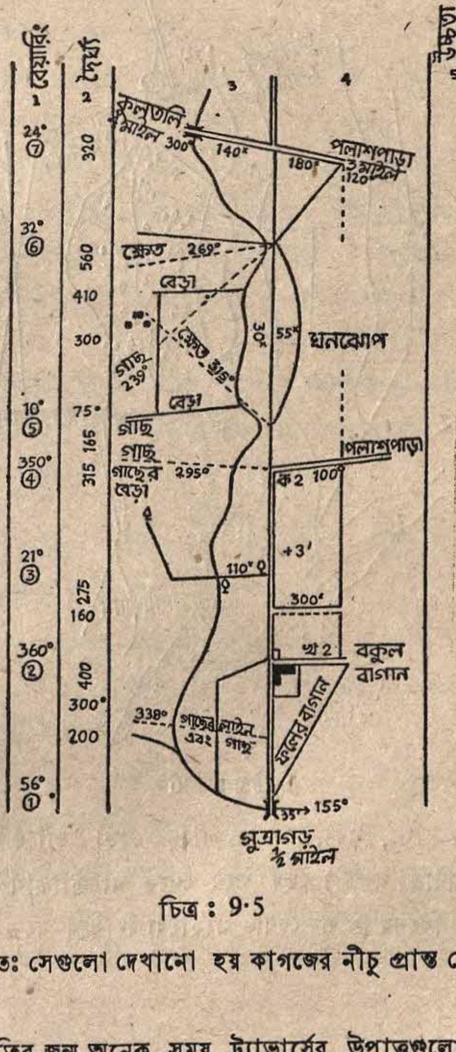
(vii) নক্সার নীচে ডান প্রান্তে নক্সাটি যে তৈরি করেছে তার নাম লিখে তাকে দস্তখত করতে হয়।

ট্র্যাভার্স (Traverse)

যা আড়ে থেকে দৃষ্টিপথের এবং চলার পথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাকেই বলা চলে ট্র্যাভার্স বা মোড়। তবে সাধারণতঃ ব্যবহারিকভাবে ট্র্যাভার্স বলতে বোঝায় পর্যায়ক্রমে থাকা আঁকাবাঁকা পথ। একটি আঁকাবাঁকা পথ ত আসলে কতকগুলো ছোটবড় পথের সমন্বয়ে গড়ে উঠে, অর্থাৎ একটি আঁকাবাঁকা পথে অনেকগুলো মোড় পড়ে যার জন্য চলার দিক পরিবর্তন করতে হয়। দিক পরিবর্তন মানেই বেয়ারিং-এর পরিবর্তন। তাই একটি ট্র্যাভার্সে পর পর অনেকগুলো বেয়ারিং থাকে—যাত্রাস্থল (starting point) থেকে প্রথম মোড় পর্যন্ত এক বেয়ারিং, আবার প্রথম মোড় থেকে দ্বিতীয় মোড় পর্যন্ত অন্য বেয়ারিং, তেমনি দ্বিতীয় মোড় থেকে তৃতীয় মোড় পর্যন্ত আরেক বেয়ারিং। জমিতে দাঁড়িয়ে এক মোড় থেকে অন্য মোড় পর্যন্ত বেয়ারিং কম্পাসের সাহায্যে বের করা যায়—এই বেয়ারিং ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিখে রাখতে হয়। মানচিত্রে বা নক্সায় এইসব বেয়ারিং চিহ্নিত করতে হলে প্রোট্র্যাক্টর বা চাঁদার সাহায্য নিতে হয়। আর যদি মানচিত্র থেকে এই সব বেয়ারিং বের করতে হয়, তবে প্রোট্র্যাক্টরের সাহায্যে গ্রিড্ বেয়ারিং বের করে তাকে চৌম্বক বেয়ারিং-এ রূপান্তরিত করে কম্পাসের সাহায্যে চলা যায়। তবে নক্সা ত আঁকা হয় জমিতে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে কাগজে—তাই এখানে কম্পাসের সাহায্যে চৌম্বক বেয়ারিং নির্ধারণ করে তাকে গ্রিড্ বেয়ারিং-এ রূপান্তরিত করে [যেখানে এই রূপান্তর করা সম্ভব হয় না সেখানে চৌম্বক বেয়ারিং দিয়েই কাজ চালাতে হয়] প্রোট্র্যাক্টরের সাহায্যে নক্সায় চিহ্নিত করতে হয়।

এক মোড় থেকে পরবর্তী মোড়ের দূরত্ব পদক্ষেপের সাহায্যেই বের করে নেন সৈনিকরা [120 পদক্ষেপ = 100 গজ, কেননা একজন সৈনিকের প্রতি পদক্ষেপ 30″ ইঞ্চি দূরত্ব পার হয়]। অবশ্য এই মাপ নিখুঁত না হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই নক্সা তৈরি করার সময় ফিতা বা চেন দিয়েই এই

দূরত্ব নির্ধারণ করতে পারলে ভাল হয়। নক্সা তৈরি করার সময় দুটি মোড়ের অন্তর্বর্তী জায়গার সমস্ত ছোট-বড় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ফীচারগুলো নক্সায় যথাযথভাবে দেখাতে হয়। নক্সা তৈরীর জন্য মোড় লক্ষ্য করতে হয় যাত্রাস্থল থেকে পর্যায়ক্রমে অভীষ্ট বিন্দু অর্থাৎ গন্তব্যস্থল পর্যন্ত, এবং

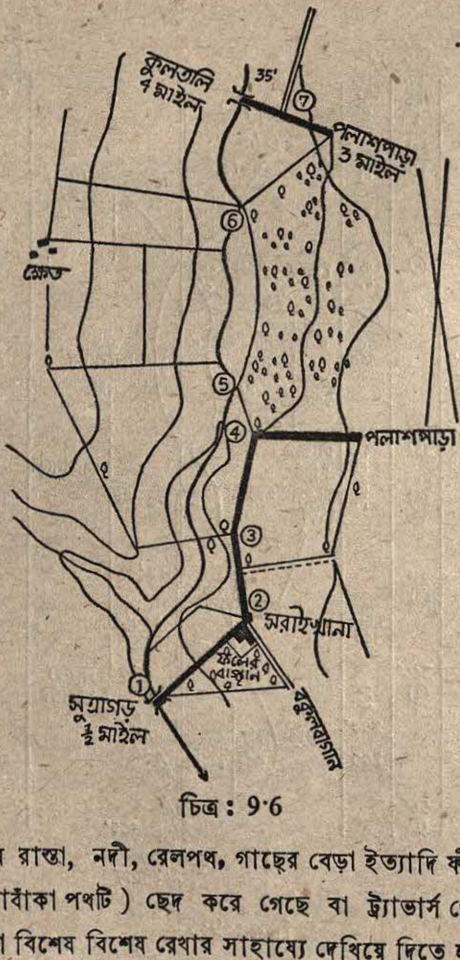


চিত্র : 9·5

নক্সায় সাধারণতঃ সেগুলো দেখানো হয় কাগজের নীচু প্রান্ত থেকে উপরের প্রান্তের দিকে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য অনেক সময় ট্র্যাভার্সের উপাত্তগুলো তাড়াতাড়ি একটি কাগজে টুকে নিতে হয়—নক্সা অবশ্য পরে তৈরি করে নিতে হয়।

কি করে ট্র্যাভার্সের উপাত্তগুলো আগে কাগজে টুকে নিতে হয় এবং পরে সেই সব তথ্যের সাহায্যে কীভাবে নক্সাকে যথাযথ করা যায় পূর্ব পৃষ্ঠার তা নীচের ছবিটিতে (চিত্র 9·5) দেখানো হয়েছে। নক্সায় যথারীতি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, এবং দূরত্বগুলো পাশে পাশে লিখে দিতে



চিত্র : 9·6

হয়। যে-সব রাস্তা, নদী, রেলপথ, গাছের বেড়া ইত্যাদি ফীচার ট্র্যাভার্স (অর্থাৎ আঁকাবাঁকা পথটি) ছেদ করে গেছে বা ট্র্যাভার্স থেকে দূরে সরে গেছে সেগুলো বিশেষ বিশেষ রেখার সাহায্যে দেখিয়ে দিতে হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্ধুরতা ও তার প্রকাশ
(Relief and its Representations)

ভূ-পৃষ্ঠ সমতল নয়, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু—তার ফলে সমুদ্রস্তর থেকে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা সর্বত্র সমান নয়। ভূ-পৃষ্ঠের এই প্রাকৃতিক অসমতলতা প্রকটিত হয় মালভূমি, পাহাড়, উপত্যকা, গিরিখাত, প্রভৃতির মাধ্যমে। ভূ-পৃষ্ঠের এই অসমতলতাকে বলা হয় 'উচ্চাবচতা বা বন্ধুরতা (Relief)'। ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতাকে পৃথিবীর 'ত্রিমাত্রিক (three dimensional)' রূপ বলেও বর্ণনা করা হয়। আর যে সমস্ত প্রাকৃতিক গঠনের মাধ্যমে এই উচ্চাবচতা বা বন্ধুরতা প্রকাশিত হয় তাদের বলা হয় 'বন্ধুরতা সূচক গঠন বা বন্ধুর গঠন (Relief feature)'।

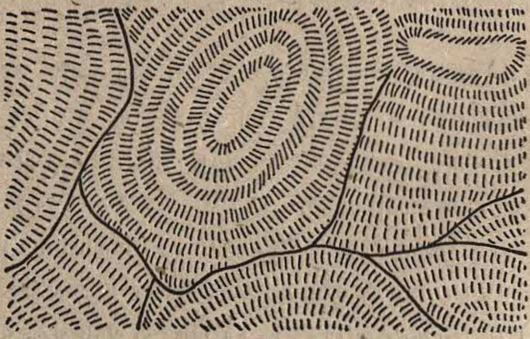
মানচিত্র ত আঁকা হয় সমতল বা দ্বিমাত্রিক কাগজে বা কাপড়ে। তাই পৃথিবী-পৃষ্ঠের ত্রিমাত্রিক রূপ বা বন্ধুরতাকে মানচিত্রে বোঝান হয় কতকগুলো বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে।

মানচিত্রে ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতা প্রকাশের পদ্ধতি (Method of representing relief in map)

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে মানচিত্রে ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতা জাহির করা হয়—(i) ভ্রূলেখ বা হ্যাচিওরস্ (Hachures), (ii) স্তর-জ্ঞাপক বর্ণালী বা লেয়ার টিন্ট্স্ (Layer tints), (iii) উচ্চতা সূচক চিহ্ন বা স্পট হাইট (Spot height) ও বেঞ্চ মার্ক (Bench Mark), এবং (iv) সমোন্নতি রেখা বা কণ্টুর (Contour)।

(i) **ভ্রূলেখ বা হ্যাচিওরস্ঃ** পাহাড় বা পর্বত বোঝাবার জন্য ছোট ছোট কতকগুলো সমান্তরাল সরলরেখা ব্যবহার করা হয়। এই ছোট ছোট সমান্তরাল সরলরেখাগুলো আঁকা হলে দেখায় অনেকটা ভ্রূর মত। সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালের দিকে ভ্রূলেখগুলো আঁকা হয়। পাহাড়ের চড়াই বেশী খাড়া হলে ভ্রূলেখগুলো ঘনসন্নিবিষ্ট করে আঁকা হয়, আর যদি পাহাড়ের ঢাল কম খাড়া হয় তাহলে ভ্রূলেখগুলো আঁকা হয় ফাঁক ফাঁক

করে (চিত্র 10·1 দ্রষ্টব্য)। খাত (quarry), নদীসোপান (river terrace), প্রভৃতি ছোটখাটো বন্ধুরগঠন বোঝাবার জন্য জ্রলেখ বিশেষ উপযোগী, কিন্তু জ্রলেখের মাধ্যমে কোন একটি বন্ধুর গঠনের উচ্চতা বোঝানো যায় না।



চিত্র : 10·1

(ii) **স্তরজ্ঞাপক বর্ণালী :** যে সব মানচিত্রে বহু রকমের রঙ ব্যবহার করা হয়, সেখানে বিশেষ বিশেষ উচ্চতা বোঝাবার জন্য বিভিন্ন রঙের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ সে সব মানচিত্রের নীচের দিকে রঙের ব্যাখ্যা লিখে দেওয়া হয়। নানারকম রঙের সমাবেশ ঘটার ফলে এইসব মানচিত্রগুলো খুব জমকালো হয়, তবে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন বন্ধুর গঠনের তুলনামূলক উচ্চতা সহজে জাহির করা গেলেও অনেক বন্ধুর গঠনের সঠিক উচ্চতা বোঝানো সহজ হয় না।

যাই হোক সামরিক মানচিত্রে উপরে বর্ণিত দুটো পদ্ধতির কোনটিই ব্যবহৃত হয় না।

(iii) **স্পট হাইট এবং বেঞ্চ মার্ক :** কোন বিচ্ছিন্ন বন্ধুর গঠন—যেমন সমতলভূমিতে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়, ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠা, ইত্যাদি—বোঝাতে এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রতল থেকে কোন একটি বন্ধুর গঠনের সঠিক উচ্চতা এইসব পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে বোঝানো সম্ভব।

মানচিত্রে কোন একটি স্থানীয় অবস্থিতির উচ্চতা বা স্পট হাইট (spot height) দেখাতে হলে ঐ জায়গায় একটি বিন্দু এঁকে তার পাশে ঐ জায়গাটির উচ্চতা লিখে দেওয়া হয়। মনে করা যাক, কোন একটি সমতল-

ভূমিতে একটি ছোট পাহাড় আছে—সমুদ্রতল থেকে যার উচ্চতা চারশ ফুট। মানচিত্রে ঐ পাহাড়টিকে বোঝাতে লেখা হবে '•400'। স্পট হাইট পদ্ধতির সাহায্যে পাহাড়টির উচ্চতা সঠিক জানা গেলেও পাহাড়টির ব্যাপ্তি এবং প্রকৃতি বোঝা যাবে না।

স্পট হাইট যদি মানচিত্রে অঙ্কিত কোন বিন্দু-অবস্থিতির উচ্চতা বোঝায়, বেঞ্চ মার্ক তাহলে বোঝায় একটি রেখার উচ্চতা। কোন সমতল ভূমিতে যদি কোথাও একটি ছোট শিরা উঁচু হয়ে থাকে তাহলে ঐ শিরার কোন পাথরে শিরাটির উচ্চতা খোদাই করে লিখে দেওয়া হয়, আর মানচিত্রে ঐ শিরাটি একটি রেখার দ্বারা নির্দেশ করে উচ্চতা লিখে তার আগে লেখা হয় 'B.M.'। ধরা যাক, কোন একটি বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরের মধ্যে তিনশ পঞ্চাশ ফুট উঁচু একটি ছোট পাথুরে শিরা বা উঁচু জায়গা আছে। মানচিত্রে ঐ জায়গাটি দেখাতে একটি রেখা এঁকে লেখা হবে 'B.M. 350'।

(iv) **সমোন্নতিরেখা বা কণ্টুর :** কোন একটি বন্ধুর গঠনের উচ্চতা, ব্যাপ্তি, প্রভৃতি এই পদ্ধতির সাহায্যে সঠিকভাবে বোঝানো যায়। ভারতবর্ষে এই পদ্ধতিটির ব্যবহার চালু রয়েছে 1895 খ্রীষ্টাব্দে থেকে।

সাগরতল থেকে সমান উচ্চতায় অবস্থিত বিন্দুগুলোকে যোগ করে মানচিত্রে যদি কোন রেখা আঁকা হয়, তবে ঐ রেখাকে বলা হয় 'সমোন্নতি রেখা বা কণ্টুর (Contour)'। সমোন্নতি রেখার বর্ণনায় বলা হয় মানচিত্রে অঙ্কিত সাগরতল থেকে সমান উল্লম্ব উচ্চতায় অবস্থিত প্রতিবেশী বিন্দু-গুলোকে ক্রমান্বয়ে সংযোগকারী রেখা। কোন একটি সমোন্নতি রেখা দিয়ে সংযুক্ত বন্ধুর গঠনগুলোর উচ্চতা অনুসারে ঐ সমোন্নতি রেখাটির নাম স্থির হয়—যেমন যে সমোন্নতি রেখাটি সাগরতল থেকে পাঁচশ ফুট উল্লম্ব উচ্চতায় অবস্থিত বিন্দুগুলোকে ক্রমান্বয়ে যুক্ত করে সেই সমোন্নতি রেখাটির নাম হয় '500 ফুট সমোন্নতি রেখা'; তেমনি সাড়ে পাঁচশ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বিন্দুগুলোর সংযোগকারী রেখাটিকে বলা হয় '550 ফুট সমোন্নতি রেখা'। কোন পাহাড় মানচিত্রে দেখাতে হলে সাধারণতঃ পঞ্চাশ ফুট উচ্চতার পার্থক্যে পরপর সমোন্নতি রেখা আঁকা হয়।

একটি বীকার, একটি শঙ্কু (cone), একটি রঙ্গিন পেন্সিল এবং কিছু জল দিয়ে একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে সমোন্নতি রেখা পদ্ধতিটি ভালো

করে বোঝান যায়। বীকারটির ভিতরে শঙ্কুটিকে বসিয়ে বীকারের মধ্যে কিছু জল ঢালা হোক। শঙ্কুর গায়ে জলের উচ্চতা বরাবর রঙ্গিন পেন্সিলের সাহায্যে একটি দাগ দেওয়া হোক। বীকারে আবার কিছু জল ঢেলে জলের এই নূতন উচ্চতা বরাবর শঙ্কুর গায়ে দাগ আঁকা হোক। এমনি করে বীকারের মধ্যে বার কয়েক জল ঢালা এবং জলের উচ্চতা বরাবর শঙ্কুর গায়ে দাগ দেওয়া হোক। তারপর শঙ্কুটিকে বীকারের ভিতর থেকে বের করে এনে দাগগুলোকে দেখতে হবে। শঙ্কুর যে কোন পাশ থেকে দেখলে দাগগুলোকে পরস্পর সমান্তরাল দেখাবে, কিন্তু শঙ্কুর মাথার দিক থেকে দেখলে শঙ্কুর গায়ের দাগগুলোকে দেখাবে সমকেন্দ্রীয় কতগুলো বৃত্তের মত, আর যদি শঙ্কুটির সবদিক সমান নিটোল না হয় তাহলে দাগগুলোকে মনে হবে কতগুলো উৎকেন্দ্রিক বৃত্ত। বৃত্তগুলো সমকেন্দ্রীয় বা উৎকেন্দ্রিক যাই হোক না কেন, বীকারের মধ্যে জল যখন সবচেয়ে কম উঁচু ছিল তখনকার দাগটি তৈরি করবে সবচেয়ে বাইরের বৃত্তটি, আর সব থেকে ভিতরের বৃত্তটি তৈরী হবে সবচেয়ে বেশী উচ্চতার জলতল বরাবর যে দাগটি আঁকা হয়েছিল তার সাহায্যে (চিত্র 10·2 দ্রষ্টব্য)।



চিত্র : 10·2

পরপর অর্থাৎ ক্রমানুযায়ী দুটো সমোন্নতি রেখার ব্যবধানকে বলা হয় 'ভারটিক্যাল ইন্টারভ্যাল (Vertical Interval) বা উল্লম্ব অবকাশ'। ভারটিক্যাল ইন্টারভ্যালের অপর নাম 'কন্টুর ইন্টারভ্যাল (Contour

Interval)'। যে কোন একটি মানচিত্রে কণ্টুর ইণ্টারভ্যাল অপরিবর্তিত থাকে, এবং ঐ ইণ্টারভ্যাল কতটা সমতল দূরত্ব প্রকাশ করছে তা সাধারণতঃ মানচিত্রের নীচে লেখা থাকে। ভারতের স্থানবিবরণ বিষয়ক (topographical) মানচিত্রগুলোতে সাধারণতঃ কণ্টুর ইণ্টারভ্যাল থাকে পঞ্চাশ ফুট। প্রতিটি সমোন্নতি রেখার পাশে সারগতল থেকে তার উচ্চতা লেখা থাকে। কাজেই যে কোন দুটি সমোন্নতি রেখার মধ্যে উচ্চতার ব্যবধান সহজেই হিসাব করা যায়। সাধারণতঃ সমোন্নতি রেখাগুলো মানচিত্রে আঁকা হয় পিঙ্গল (Brown) রঙ দিয়ে, এবং প্রতিটি পঞ্চম সমোন্নতি রেখা আঁকা হয় মোটা করে।

এতক্ষণ ধরে সমোন্নতি রেখাগুলোর অন্তর্বর্তী যে-ব্যবধানের কথা আলোচনা করা হল সেটা হচ্ছে উচ্চতার ব্যবধান। দুটো সমোন্নতি রেখার মধ্যে আনুভূমিক ব্যবধানও প্রকটিত থাকে। ঐ আনুভূমিক ব্যবধানকে বলে 'আনুভূমিক সমতুল্যাঙ্ক বা হরাইজণ্টাল ইকুইভ্যালেণ্ট (Horizontal Equivalent)'। আসলে সমোন্নতি রেখাগুলো ভূমির উচ্চতা সূচিত করে, কিন্তু মানচিত্রে তো যে কোন দুটি বিন্দুর ব্যবধান শুধুমাত্র ঐ বিন্দু-দুটোর আনুভূমিক ব্যবধান বোঝায়—তাই দুটো সমোন্নতি রেখার মধ্যে যে আনুভূমিক ব্যবধান থাকে তাকে আনুভূমিক দূরত্ব না বলে তার সমতুল্য (equivalent) বলে বর্ণনা করা হয়। স্বাভাবিক কারণেই হরাইজণ্টাল ইকুইভ্যালেণ্ট কিন্তু কোন মানচিত্রের সব জায়গায় এক রকম থাকতে পারে না। পাহাড়ের ঢালের চড়াই-এর সূক্ষ্মতা বাড়লে সমোন্নতি রেখাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট হয়, তখন তাদের অন্তর্বর্তী আনুভূমিক দূরত্ব কমে যায়—ফলে হরাইজণ্টাল ইকুইভ্যালেণ্টও কম হয়। কিন্তু যে পাহাড়ের ঢালের সূক্ষ্মতা কম, অর্থাৎ পাহাড়টির উচ্চতা যদি অতি ধীরে ধীরে বাড়ে তাহলে ঐ পাহাড়টি দেখাতে যে-সব সমোন্নতি রেখা আঁকতে হয় তাদের মধ্যেকার দূরত্ব বেড়ে যায়—ফলে হরাইজণ্টাল ইকুইভ্যালেণ্টও বাড়ে। সহজ ভাষায় বলা চলে যে, যদি পাহাড়ের ঢাল গড়ানে হয়, তাহলে সমোন্নতি রেখাগুলোর হরাইজণ্টাল ইকুইভ্যালেণ্ট বাড়ে, আর যদি পাহাড়ের চড়াই খুব খাড়া হয় তাহলে সমোন্নতি রেখাগুলোর হরাইজণ্টাল ইকুইভ্যালেণ্ট কম হয়।

নতি (Inclination) ও নতিমাত্রা (Gradient)

পাহাড়ে ঢালের 'নতি (Inclination)' বলতে সাধারণ কথায় আমরা বুঝি নির্দিষ্ট স্থানে পাহাড়ের যে ঢাল তার উন্নতি বা অবনতি অর্থাৎ চড়াই বা উৎরাই। বাংলা ভাষায় উভয় ক্ষেত্রেই 'নতি' কথাটি ব্যবহার করা হয়—সঙ্গে উন্নতি বা অবনতি উল্লেখ করলে ঢালের দিকও নির্দিষ্ট হয়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় যে পাহাড়ে গায়ে কোন স্থানে স্থানীয় আনুভূমিক তলের সঙ্গে পাহাড়টির ঢাল যে কোণে আনত তাই হচ্ছে নতি।

সেই কোণ বরাবর ঢাল বেয়ে উর্ধ্বগমনে আনুভূমিক পথে অতিক্রান্ত প্রতি একক দূরত্ব সাপেক্ষে উল্লম্বদিকে কোন ব্যক্তির অবস্থিতির যে উচ্চতা বৃদ্ধি ঘটে তারই মান হচ্ছে 'নতিমাত্রা (Gradient)'। নতিমাত্রা একটি অনুপাত, যা সাধারণতঃ ভগ্নাংশে প্রকাশিত হয়। কোন পাহাড়ের নতিমাত্রা বা গ্র্যাডিয়েন্ট (Gradient)' বোঝাতে যে ভগ্নাংশটি ব্যবহার করা হয় তার লব (numerator) তৈরী হয় ভারটিক্যাল ইন্টারভ্যাল দিয়ে, আর হরাইজন্টাল ইকুইভ্যালেন্ট তৈরি করে হর (denominator); অর্থাৎ,

$$\text{ঢালের নতিমাত্রা} = \frac{\text{ভারটিক্যাল ইন্টারভ্যাল}}{\text{হরাইজন্টাল ইকুইভ্যালেন্ট}} \text{ ।}$$

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হর এবং লব সূচক সংখ্যাদুটিকে একই এককে রূপান্তরিত করে নিয়ে ভগ্নাংশটি বের করতে হয়। মানচিত্র পঠন-পাঠনের সময় ভারটিক্যাল ইন্টারভ্যালকে সংক্ষেপে বলে 'ভি. আই. (V. I.)', আর হরাইজন্টাল ইকুইভ্যালেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'এইচ. ই. (H. E.)'। ভি. আই. সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় ফুটের এককে, কিন্তু এইচ. ই. মাপা হয় গজের এককে। তাই ঢালের নতিমাত্রার ভগ্নাংশ তৈরি করার সময় ভি. আই. এবং এইচ. ই.কে একই এককে রূপান্তরিত করতে হয়। ধরা যাক দুটো সমোন্নতি রেখার ভি. আই. হচ্ছে পঞ্চাশ ফুট, কিন্তু তাদের এইচ. ই. হচ্ছে একশ গজ—তাহলে ঐ পাহাড়ী জায়গাটির নতিমাত্রা কি হবে?

আমরা জানি,

$$\text{নতিমাত্রা} = \frac{\text{ভি. আই.}}{\text{এইচ. ই.}} \cdots\cdots \text{সমীকরণ (1)}$$

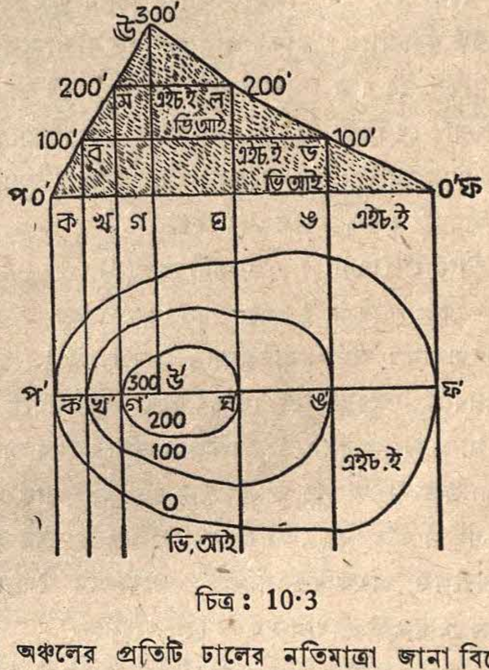
$$= \frac{50 \text{ ফুট}}{100 \text{ গজ}}$$

$$= \frac{50 \text{ ফুট}}{100 \times 3 \text{ ফুট}}$$

$$= \frac{50 \text{ ফুট}}{300 \text{ ফুট}} = \frac{1}{6}$$

তাহলে ঐ পাহাড়ী জায়গাটির নতিমাত্রা প্রকাশ করতে যে ভগ্নাংশটি ব্যবহার করা হবে, সেটি হচ্ছে $\frac{1}{6}$ ।

নতিমাত্রা থেকে একটি পাহাড়ের খাড়াইর তীব্রতা অর্থাৎ সূক্ষ্মতা বোঝা যায়। যে পাহাড়ে খাড়াই যত তীব্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম সে পাহাড়ের এইচ. ই. তত কম, আর যে পাহাড়ের ঢালটি খুব ধীরে ধীরে উঁচু হয় তার এইচ. ই. তত বেশী (10•3 চিত্র দ্রষ্টব্য)।



চিত্র : 10·3

পাহাড়ি অঞ্চলের প্রতিটি ঢালের নতিমাত্রা জানা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা সকল রকম নতিমাত্রায় মালবোঝাই লরী চলতে পারে না। নতিমাত্রা যদি $\frac{1}{5}$ থেকে বেশী হয় অর্থাৎ $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ বা 1 হয় তাহলে সেখানে মালবোঝাই লরী উঠতে পারবে না। নতিমাত্রা যদি $\frac{1}{5}$ বা তার থেকে কম —অর্থাৎ $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{20}$, ইত্যাদি হয় তাহলে মাল বোঝাই লরীর সেই

পাহাড়ী পথে উঠতে অসুবিধা হয় না।

নতিমাত্রার নিরূপণ (Determination of Gradient)

এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হল, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে নতি (inclination) হচ্ছে পাহাড়ের ঢালের কোণ—অর্থাৎ আনুভূমিক জমি থেকে পাহাড়ের ঢাল যখন উপরের দিকে উঠে তখন জমিতে যে কোণটি সৃষ্টি হয় সেই কোণটি। কোণ মাত্রেই প্রকাশিত হতে পারে ডিগ্রীর মাপে, যেমন 15° ডিগ্রী কোণ, 60° ডিগ্রী কোণ, 90° ডিগ্রী কোণ, 120° ডিগ্রী কোণ, ইত্যাদি। পাহাড়ের এই কোণ মাপা হয় সাধারণতঃ 'ক্লাইনোমিটার (Clinometer)' যন্ত্রের সাহায্যে। ধরা যাক, এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি পাহাড়ের নতি মাপা হল 20° ডিগ্রী কোণ। এখন এই কোণকে কি ভগ্নাংশে রূপান্তরিত করা যাবে ? নতিমাত্রার ভগ্নাংশটি না জানলে তো বোঝা যাবে না যে ঐ নতি বেয়ে মাল বোঝাই লরী উঠতে পারবে কি না !

আবার দেখা যায় যে ডিগ্রী এককে প্রকাশিত নতিকোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত 'ট্যানজেণ্ট (tangent)'-এর সমান হচ্ছে নতিমাত্রা।

তাই নতিকোণ t° হলে সংক্ষেপে লেখা হয়,

নতিমাত্রা = ট্যান্ t° (tan t°) ।……সমীকরণ (2)

এই হিসাবে দেখা যায় যে $\frac{1}{5}$ ভগ্নাংশ বা অনুপাতের নতিমাত্রা প্রায় ট্যান্ 12° ডিগ্রীর সমান ; অর্থাৎ, নতিমাত্রা = ট্যান্ 12° = $\frac{1}{5}$ (প্রায়)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, হিসেব করে দেখা গেছে 6° ডিগ্রী নতিকোণ পর্যন্ত নতিকোণের ট্যান্-এর মানকে নতিকোণের সমানুপাতিক ধরলে হিসাবে যা ত্রুটি পাওয়া যায় তা অতি নগণ্য—যা অগ্রাহ্য করা চলে। এমনকি 12° ডিগ্রী বা তার কিছু বেশী মানের নতিকোণ পর্যন্ত এই সমানুপাতিক হিসাব ধরলেও তাৎক্ষণিক সামরিক প্রয়োজনে সৈন্যচলাচল বা সরবরাহের ক্ষেত্রে মোটামুটি প্রাথমিক কাজ চলে যায়।

কাজেই এই হিসাবে অজানা নতিকোণের মান t° ডিগ্রী ধরে আমরা দেখতে পাই—

$$\frac{\text{ট্যান্ } t^\circ}{\text{ট্যান্ } 1^\circ} = \frac{t^\circ}{1^\circ} = t$$

ট্যান 1° ডিগ্রীর মান $\frac{1}{57 \cdot 3}$ বা মোটামুটি $\frac{1}{60}$ ধরে ঐকিক নিয়ম প্রয়োগ

করে পাওয়া যায়,

$$\text{ট্যান্ } t^\circ = t \times \text{ট্যান্ } 1^\circ = \frac{t}{60}$$

$$\therefore \quad \text{নতিমাত্রা} = \frac{t}{60} \cdots\cdots \text{সমীকরণ (3)}$$

[t = ডিগ্রী এককে নতিকোণের মান]।

উপরোক্ত অঙ্কের হিসাবে 1° ডিগ্রী মানের নতিকোণের ক্ষেত্রে নতি-মাত্রা পাওয়া যায়,

$$\text{নতিমাত্রা} = \frac{1}{60},$$

অর্থাৎ, পাহাড়ের ঢালের নতি যদি 1° ডিগ্রী হয়, তাহলে ভূমির 60 ফুট আনুভূমিক বিস্তৃতি লাগবে পাহাড়ের ঢালটিকে 1 ফুট উল্লম্ব উচ্চতায় পৌঁছতে। অন্যভাষায় বলা চলে যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে 1 ফুট উল্লম্ব উচ্চতায় পৌঁছতে আনুভূমিক 60 ফুট পথ অতিক্রান্ত হবে।

অর্থাৎ, আমাদের আলোচ্য নতির কোণ যখন 20° ডিগ্রী, তখন তার নতিমাত্রার ভগ্নাংশ রূপটি হবে, $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$।

এই পাহাড়ের নতিমাত্রা $\frac{1}{5}$ এর চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম, অতএব এখানে মাল বোঝাই লরী উঠতে পারবে না।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়,

$$\frac{t}{60} = \frac{\text{ভি. আই.}}{\text{এইচ.ই.}}\text{।}$$

এই সূত্র ধরে বলা যায় যে,

$$\text{ভি. আই.} = \frac{t \times \text{এইচ. ই.}}{60},$$

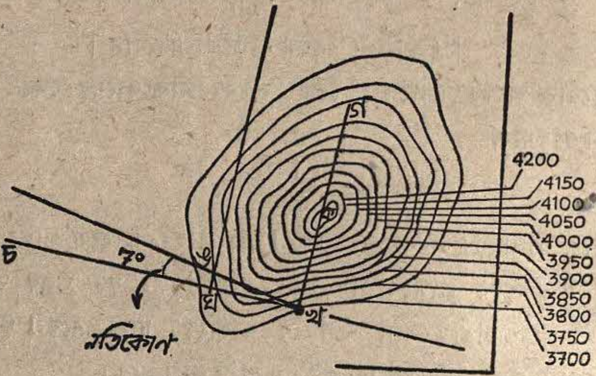
$$\text{অথবা, এইচ. ই.} = \frac{\text{ভি. আই.} \times 60}{t}\text{।}$$

নতির কোণ জানা থাকলে, উপরের সূত্রগুলোর সাহায্যে নতিমাত্রার ভগ্নাংশ রূপ, ভি. আই., এবং এইচ. ই. নির্ণয় করা যায়।

কিন্তু মানচিত্রে ত কোন পাহাড়ের নতির কোণ দেওয়া থাকে না, তাহলে মানচিত্র থেকে নতিমাত্রার ভগ্নাংশ রূপ নিরূপণ করা যাবে কি পদ্ধতিতে?

10·4 চিত্রটি একটি "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলে আঁকা মানচিত্রের অংশ। মানচিত্রে সাধারণতঃ পাহাড় আঁকা হয় সমোন্নতি রেখার সাহায্যে। এখানেও তাই করা হয়েছে। এখন পাহাড়টির 'খ' বিন্দু থেকে

'ক' বিন্দুতে আরোহণ করতে হলে 'খ' বিন্দুর আনুভূমিক তলের সঙ্গে পাহাড়ের ঢালটি কত ডিগ্রী কোণ করে আনত সেটা জানা দরকার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রদত্ত মানচিত্র থেকে সেটা কিভাবে নির্ধারণ করা যাবে ?



চিত্র : 10·4

এই নতিকোণ নির্ণয় করার পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। 'ক' এবং 'খ' বিন্দুদুটোকে একটি সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করা হল, এবার ঐ সরলরেখাটিকে 'গ' বিন্দু পর্যন্ত বাড়ালে 'খ-ক-গ' সরলরেখাটি পাওয়া যাবে। এখন 'খ-ক' সরলরেখাটির দৈর্ঘ্য মানচিত্রে মেপে দেখা গেল 7/10″ ইঞ্চি। অতএব 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর আনুভূমিক দূরত্ব হচ্ছে $\frac{7}{10}''$ ইঞ্চি ; প্রদত্ত মানচিত্রের স্কেল হচ্ছে 'এক ইঞ্চি মানে এক মাইল', তাহলে মানচিত্রের 7/10″ ইঞ্চি ভূমির কতটা দূরত্ব বোঝায় ?

1″ ইঞ্চি মানে 1 মাইল বা 1760 গজ বা 1760×3 ফুট

$\therefore \ \frac{7}{10}''$ ইঞ্চি $= \frac{7}{10} \times 1760 \times 3 = 3696$ ফুট

তাহলে, 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর এইচ. ই. হচ্ছে 3696 ফুট।

এবার, খ-ক-গ সরলরেখাটির 'খ' বিন্দুতে সমকোণ (90° ডিগ্রী) করে আরেকটি সরলরেখা আঁকা হল, অর্থাৎ একটি লম্ব টানা হল। সরলরেখাটির নাম 'খ-চ' রেখা। এবার 'খ' বিন্দুকে কেন্দ্র করে 'খ-ক' সরলরেখাটির দৈর্ঘ্যের সমান দূরত্বে অর্থাৎ $\frac{7}{10}''$ ইঞ্চি দূরত্বে 'খ-চ' রেখাটিকে 'ঘ' বিন্দুতে ছেদ করা হল। 'ঘ' বিন্দুতে 'খ-ঘ' সরলরেখার উপর একটি লম্ব আঁকা হল —স্বভাবতঃই এই লম্বটি 'খ-ক-গ' সরলরেখাটির সমান্তরাল হবে।

প্রসঙ্গতঃ মানচিত্রে দেওয়া সমোচ্চরেখাগুলো ব্যবহার করে দেখা যায় যে, 'খ' বিন্দুর আনুভূমিক তল থেকে 'ক' বিন্দুর উচ্চতা (4200 ফুট-3700 ফুট) অর্থাৎ ভি. আই. 500 ফুট, কেননা 'ক' এবং 'খ' বিন্দু যথাক্রমে 4200 ফুট, এবং 3700 ফুট সমোচ্চরেখাদুটোতে অবস্থিত।

যেহেতু মানচিত্রের প্রদত্ত স্কেল অনুযায়ী ভূমির 500 ফুট দৈর্ঘ্য মানচিত্রটির 0·095 ইঞ্চি বা 2·5 মি. মি. দৈর্ঘ্যের সরলরেখার সমান, সেহেতু 'ঘ' বিন্দুকে কেন্দ্র করে খ-ক-গ রেখাটির সমান্তরাল রেখাটি [যে-রেখাটি কিছুক্ষণ আগে আঁকা হয়েছে]-র উপর 2·4 মি.মি. দৈর্ঘ্য নিয়ে 'ঙ' বিন্দুতে ছেদ করলে 'ঘ-ঙ' রেখা পাওয়া যাবে—এই সরলরেখাটির দৈর্ঘ্য 2·4 মি.মি. অর্থাৎ ভূমির 500 ফুটের আনুপাতিক। এখন 'খ' বিন্দুর সঙ্গে 'ঙ' বিন্দুকে যুক্ত করে একটি সরলরেখা আঁকা হল, এবং ঐ সরলরেখাটিকে প্রয়োজনমত বাড়িয়ে লম্বা করা হল। 'খ-ঘ-ঙ' শীর্ষক যে-ত্রিভুজটি তৈরী হয়েছে, সেটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ, এবং 'খ-ঘ' বাহু 'খ' বিন্দুর আনুভূমিক তলে অবস্থিত। 'ঘ-ঙ' লম্বটি এই আনুভূমিক তল থেকে উল্লম্ব পথে 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর উচ্চতা নির্দেশ করে। অতএব 'খ-ঘ-ঙ' শীর্ষক ত্রিভুজটির ∠ঘখঙ কোণটি 'খ' বিন্দুর আনুভূমিক তলের সঙ্গে পাহাড়টির ঢাল কত ডিগ্রী কোণ করে আনত তা নির্দেশ করে। এই কোণটির মাপ 'সার্ভিস প্রোট্র্যাক্টর'-এর সাহায্যে বের করা যায়—মেপে দেখা গেল কোণটির মাপ হচ্ছে 7° ডিগ্রী।

এবার, নতিমাত্রা নির্ধারণের 3নং সমীকরণে t-এর মান 7 বসিয়ে আমরা পাই, নতিমাত্রা = $\frac{7}{60} \simeq \frac{12}{100} = \frac{1}{8}$ (প্রায়)।

যেহেতু এখানে নতিমাত্রার ভগ্নাংশটি $\frac{1}{5}$-এর চাইতে ছোট সেহেতু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মানচিত্রে প্রদর্শিত খ বিন্দু থেকে ক বিন্দু পর্যন্ত যে ঢালটি ভূমিতে অবস্থিত সেই ঢাল বেয়ে সামরিক গাড়ী সহজেই যাতায়াত করতে পারবে।

'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দু পর্যন্ত ঢালটির নতিমাত্রা আরও কয়েকটি পদ্ধতিতে বের করা যায়। সেগুলোই একে একে আলোচনা করা হচ্ছে।

নতিমাত্রা নির্ধারণের 2নং সমীকরণে t-র মান 7 বসিয়ে নতিমাত্রা পাওয়া যায়,

$$\text{নতিমাত্রা} = \text{ট্যান } 7^\circ \simeq \frac{12}{100} = \frac{1}{8} \text{ প্রায়,}$$

আবার, নতিমাত্রা নির্ধারণের 1নং সমীকরণে ভি. আই (V. I.) এবং এইচ. ই. (H. E.) মান বসালে পাওয়া যায়,

$$\text{নতিমাত্রা} = \frac{\text{ভি. আই. (V. I.)}}{\text{এইচ. ই. (H. E.)}}$$

$$= \frac{\text{ঘ-ঙ}}{\text{খ-ঘ}}$$

$$= \frac{2{\cdot}4 \text{ মি.মি.}}{18 \text{ মি.মি.}}$$

মানচিত্রের স্কেল অনুসারে,

$$\frac{2{\cdot}4 \text{ মি.মি.} = 500 \text{ ফুট}}{18 \text{ মি.মি.} = 3696 \text{ ফুট}} \simeq \tfrac{1}{8} \text{ প্রায়।}$$

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে মানচিত্রের সাহায্যে নতিকোণ মেপে, তার মাণ 2নং অথবা 3নং সমীকরণে বসিয়ে নতিমাত্রার যে মান পাওয়া গেল তা মানচিত্র থেকে ভি. আই. এবং এইচ. ই. মেপে নিয়ে 1নং সমীকরণের সাহায্যে ভি. আই. এবং এইচ. ই.-র অনুপাত নিয়ে পাওয়া নতিমাত্রার মানের প্রায় সমান। তাই সাধারণতঃ মানচিত্র থেকে পাহাড়ের কোন ঢালের নতিমাত্রা নির্ধারণ করার জন্য সমোন্নতি রেখার সাহায্যে ভি. আই. নির্ধারণ করা হয়, এবং মানচিত্রে প্রদত্ত স্কেলের সাহায্যে দুটো বিন্দুর এইচ.ই. বের করা হয় ; তারপর ঐ দুটো মানকে একই এককে রূপান্তরিত করে তাদের অনুপাতটি ভগ্নাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

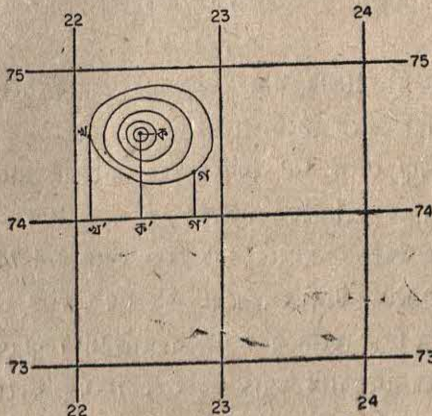
বর্তমান আলোচ্য ক্ষেত্রে 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর ভি. আই. 500 ফুট (4200 ফুট − 3700 ফুট) এবং বিন্দু দুটোর আনুভূমিক দূরত্ব $\frac{7}{10}''$ ইঞ্চি বা $\frac{7}{10} \times 1760 \times 3$ বা 3696 ফুট, অতএব $\text{নতিমাত্রা} = \frac{\text{ভি. আই.}}{\text{এইচ. ই.}}$

$$= \frac{500 \text{ ফুট}}{3696 \text{ ফুট}}$$

$$= \tfrac{1}{8} \text{ প্রায়।}$$

আবার চিত্র 10·5 ছবিটিও "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলে আঁকা একটি মানচিত্রের অংশ—এই অংশটিতে 22, 23, এবং 24 সূচিত তিনটি ইষ্টিং রেখা এবং 73, 74, ও 75 সূচিত তিনটি নর্দিং রেখা আছে ; এবং 2274 বর্গক্ষেত্রটিতে একটি টিলা দেখা যাচ্ছে, টিলাটির শীর্ষবিন্দু হচ্ছে

'ক', এবং টিলাটির পাদদেশের একদিকে আছে 'খ' বিন্দু আবার অন্যদিকে আছে 'গ' বিন্দু। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দু পর্যন্ত ঢাল বেয়ে কি মালবোঝাই সামরিক লরী যেতে পারবে? অর্থাৎ, 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত ঢালটির নতিমাত্রা বের করতে হবে। টিলাটির পাদদেশের নীচে রয়েছে 74-74 নর্দিং রেখাটি। এখন 'ক' বিন্দু থেকে ঐ



চিত্র : 10·5

নর্দিং রেখাটির উপর লম্ব টানা হল—লম্বটি নর্দিং রেখাটিকে 'ক′' বিন্দুতে ছেদ করল। অনুরূপ ভাবে 'খ' বিন্দুটি থেকে 74-74 নর্দিং রেখাটির উপর একটি লম্ব টানা হল এবং এই লম্বটি নর্দিং রেখাটি 'খ′' বিন্দুতে ছেদ করল। এখন 'খ′' 'ক′' সরলরেখাটি 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর আনুভূমিক দূরত্ব প্রকাশ করছে। মানচিত্রে এই দূরত্বটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। মানচিত্রে প্রদত্ত স্কেল অনুসারে ভূমিতে 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর আনুভূমিক দূরত্ব হবে,

খ′ ক′ $= \frac{1}{2}$ ইঞ্চি $= \frac{1}{2}$ মাইল $= \frac{1 \times 1760 \times 3}{2}$ ফুট

$= 2643$ ফুট।

আবার 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর ভি. আই. পাওয়া যাবে সমোন্নতি রেখাগুলোর সাহায্যে—'খ' বিন্দুটি যে-সমোন্নতি রেখাটিতে তার উচ্চতা যদি 2000 ফুট হয়, তাহলে যে-সমোন্নতি রেখাটিতে 'ক' বিন্দুটি অবস্থিত তা উচ্চতা হবে 2200 ফুট কেননা 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর উচ্চতার ব্যব বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে 4টি সমোন্নতি রেখা এবং প্রতিবেশী

সমোন্নতি রেখার মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য 50 ফুট। তাহলে 'খ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর উচ্চতা বা ভি. আই. হচ্ছে 200 ফুট।

$$\text{তাহলে 'খ ক' ঢালের নতিমাত্রা} = \frac{\text{ভি. আই.}}{\text{চইচ. ই.}}$$

$$= \frac{200 \text{ ফুট}}{2634 \text{ ফুট}}$$

$$= \frac{1}{13} \text{ প্রায়।}$$

যেহেতু এই নতিমাত্রার মান $\frac{1}{5}$-এর চাইতে কম সেহেতু 'খ ক' ঢাল বেয়ে সামরিক লরী উপরে উঠতে পারবে।

কিন্তু 'গ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দু বরাবর যে-ঢালটি আছে তা দিয়ে কি মালবোঝাই সামরিক লরী উঠতে পারবে?

পূর্বের বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে 'গ' বিন্দু থেকে 74-74 নর্দিং গ্রিড্ রেখাটির উপর একটি লম্ব টানা হল, এবং এই লম্বটি গ্রিড্ রেখাটিকে 'গ′' বিন্দুতে ছেদ করল। তাহলে 'গ′ ক′' সরলরখাটি 'গ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর আনুভূমিক দূরত্বের সমতুল্যাঙ্ক অর্থাৎ এইচ. ই. নির্দেশ করছে। মানচিত্রে 'গ′ ক′' রেখার দৈর্ঘ্য $\frac{1}{6}''$ ইঞ্চি, অর্থাৎ ভূমিতে এই দৈর্ঘ্যের মাপ হচ্ছে $\frac{1}{6}$ মাইল বা $\frac{1 \times 1760 \times 3}{6}$ ফুট বা 880 ফুট। সমোন্নতি রেখার সাহায্যে দেখা যাবে যে 'গ' বিন্দু থেকে 'ক' বিন্দুর ভি. আই. হচ্ছে 200 ফুট।

$$\text{তাহলে 'গ ক' ঢালটির নতিমাত্রা} = \frac{\text{ভি. আই}}{\text{এইচ. ই}}$$

$$= \frac{200 \text{ ফুট}}{880 \text{ ফুট}}$$

$$= \frac{1}{4} \text{ প্রায়।}$$

যেহেতু এই নতিমাত্রার মান $\frac{1}{5}$-এর চেয়ে বেশী, সেহেতু 'গক' ঢাল বেয়ে সামরিক লরী উঠতে পারবে না।

সমোন্নতি রেখার ব্যবহার (Uses of Contour)

শুধু পাহাড়ের উচ্চতা বোঝাতেই সমোন্নতি রেখার ব্যবহার করা হয় না, এই রেখাগুলোর সাহায্যেই পাহাড়ের আকৃতি, বিস্তৃতি, অবয়ব, গিরিসঙ্কট, পর্যঙ্ক, প্রভৃতিও মানচিত্রে দেখান হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে উপত্যকা, গিরি-

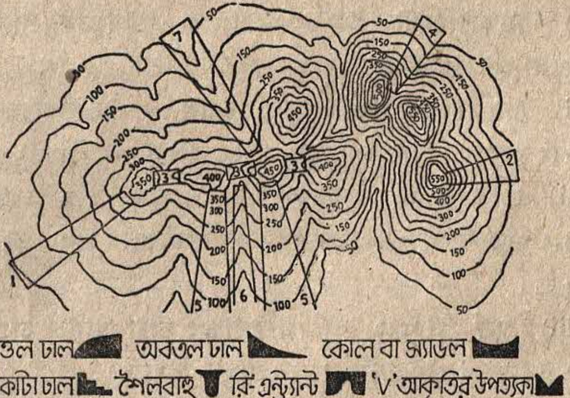
খাত, শৈলশিরা, ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক গঠন দেখা যায়। সেই রকম কিছু সহজলভ্য গঠনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল, এবং সেই গঠনগুলো কীভাবে সমোন্নতি রেখার সাহায্যে আঁকা হয় তা দেখানো হচ্ছে (চিত্র 10·6)।

(i) **বেসিন (Basin) বা অববাহিকা বা পর্যঙ্ক ঃ** পাহাড় দিয়ে সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ ঘেরা ছোট সমতলভূমি।

(ii) **ক্লিফ্ (Cliff) বা ভৃগু বা খাড়া পাহাড় ঃ** সমুদ্র বা নদীর তীরে প্রায় সোজা হয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়। পর্বতমালার মধ্যেও মাঝে মাঝে ভৃগু দেখা যায়।

(iii) **কোল (Col) বা স্যাড্ল (Saddle) বা পল্যয়ন ঃ** দুটো উঁচু পাহাড়কে অপেক্ষাকৃত নীচু ও সরু যে পাহাড় বা ভূ-খণ্ড সংযুক্ত করে তাকে বলা হয় গিরিসঙ্কট বা পল্যয়ন। এই সংযোজকটি যে-দুটি পাহাড়কে যুক্ত করছে তাদের চাইতে নীচু হলেও, আশপাশের ভূতল থেকে উঁচু।

(iv) **কনকেভ স্লোপ (Concave slope) বা অবতল ঢাল ঃ** যে ঢালের নীচের অংশ গড়ানে, কিন্তু উপরের অংশ খাড়া সে ঢালকে কনকেভ স্লোপ বা অবতল ঢাল বলে। এই ধরনের ঢাল আঁকার সময় বাইরের



চিত্র ঃ 10·6

অর্থাৎ নীচু অংশের সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যে ব্যবধান থাকে অনেক, কিন্তু ভিতরের অর্থাৎ উচু অংশের সমোন্নতি রেখাগুলো হয় ঘন সন্নিবিষ্ট।

(v) **কনভেক্স স্লোপ (Convex slope) বা উত্তল ঢাল ঃ** যে ঢালের

নীচের অংশ খাড়া কিন্তু উপরের অংশ গড়ানে তাকে কনভেক্স স্লোপ বা উত্তল ঢাল বলে। এই ঢাল-এর ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই বাইরের সমোন্নতি রেখাগুলো হয় গায়ে গায়ে, কিন্তু ভিতরের সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যে ব্যবধান থাকে বেশ।

(vi) **ক্রেষ্ট্ (Crest) বা চূড়া বা তরঙ্গ কিরীট :** একটি পর্বতমালার শীর্ষদেশ ধরে বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গগুলোকে ক্রমান্বয়ে যোগ করলে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাকে বলে ক্রেষ্ট্ বা তরঙ্গ কিরীট।

(vii) **ডেড্ গ্রাউণ্ড (Dead gorund) বা অপজমি :** কাছাকাছি দুটো উঁচু জমির মধ্যেকার নীচু জমি—সাধারণতঃ এই জমিটি প্রতিবেশী উঁচু জমিগুলোর জন্য দৃষ্টিপথের অগোচরে থেকে যায়।

(viii) **ডিফাইল (Defile) বা গিরিসংকট :** প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যে গঠন অতিক্রম করতে হলে সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগ সঙ্কুচিত করতে হয়, তাকেই বলে ডিফাইল। পার্বত্য এলাকায় গিরিপথগুলো হচ্ছে গিরিসংকট ; আবার জলাভূমির জাঙ্গাল বা কোন সরু পুল হচ্ছে কৃত্রিম ডিফাইল।

(ix) **ডিউন (Dune) বা বালিয়াড়ি :** বাতাস বা মরুঝড় দিয়ে বাহিত হয়ে এসে বালুকণা যে পাহাড় বা শিরার সৃষ্টি করে তাকে ডিউন বলে।

(x) **এসকার্পমেণ্ট (Escarpment) বা প্রবণভূমি বা উপলম্ব :** অনেকগুলো ভৃগু অর্থাৎ ক্লিফ্ দিয়ে তৈরী একটি দীর্ঘায়িত রেখা।

(xi) **গ্লেসিয়ার (Glacier) বা হিমবাহ :** উঁচু পাহাড়ের ঢালে বা উপত্যকায় বরফের বিশাল চাঁই বা পাহাড়, যা ঝর্ণা বা নদীর উৎস।

(xii) **ব্রাউ (Brow) বা ভ্রূ :** যে তলের ভাজ থেকে একটি গড়ানে ঢাল হঠাৎ খাড়া ঢালে পরিবর্তিত হয়, পাহাড়ের সেই তলের ভাঁজটি বলে ব্রাউ বা ভ্রূ।

(xiii) **গর্জ (Gorge) বা গিরিখাত :** দুটো খাড়া ঢালের মধ্যে অবস্থিত এবড়োখেবড়ো গভীর খাদকে বলে গিরিখাত।

(xiv) **নোল (Knoll) বা ঢিবি বা টিলা :** বিচ্ছিন্ন একটি ছোট পাহাড়কে বলে নোল বা ঢিবি বা টিলা।

(xv) **মেন ফীচার (Main feature) বা প্রধান গঠন :** যে সব প্রধান গঠন—যেমন শৈলশিরা, অববাহিকা পদ্ধতি, ইত্যাদি—কোন একটি ভূ-খণ্ডের প্রকৃতি এবং আকৃতি নির্ধারিত করতে সাহায্য করে, তাদের বলা

হয় প্রধান গঠন বা মেন ফীচারস্। কখনও কখনও এদের উল্লেখযোগ্য গঠন (Salient features) বলেও অভিহিত করা হয়।

(xvi) **পাস (Pass) বা গিরিপথ :** পর্বতমালায় অবস্থিত কোন সরু পথ। গিরিপথগুলোর প্রস্থ কম হলেও তাদের সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট।

(xvii) **মালভূমি বা প্ল্যাটু (Plateau) :** সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উচ্চতায় অবস্থিত সমভূমিকে মালভূমি বলে।

(xviii) **রি-এন্ট্র্যান্ট (Re-entrant) বা পুনঃপ্রবিষ্ট :** দুটো প্রধান পাহাড়ের মধ্যে কোন একটি জায়গায় যদি পাহাড়টি মূল পর্বতমালার ভিতরের দিকে বেঁকে যায়, তাহলে ঐ বাঁকে যে সমতলভূমি প্রবেশ করে তাকে বলে পুনঃপ্রবিষ্ট বা রি-এন্ট্র্যান্ট।

(xix) **রিলিফ্ (Relief) বা বন্ধুরতা বা উচ্চাবচতা :** পাহাড়, উপত্যকা, খাত বা নীচু জায়গা, প্রভৃতি যে সকল গঠন ভূমিতলকে বন্ধুর করে তোলে, তাদের বলা হয় রিলিফ্ বা বন্ধুরতা বা উচ্চাবচতা।

(xx) **রীজ (Ridge) বা শৈলশিরা :** যে খাড়া উঁচু জমির গঠন বৈশিষ্ট্যে উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ অনেক কম, তাকে রীজ বা শৈলশিরা বলে। সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলেই রীজ দেখা যায়, তবে সমতল ভূমি বা মালভূমি অঞ্চলেও কখনো কখনো রীজ দেখা যায়।

(xxi) **স্যালিয়েন্ট (Salient) বা স্পার (Spur) বা শৈলবাহু :** অনেক সময় মূল বা প্রধান পর্বতমালা থেকে একটি শাখা বহির্গামী হয়ে বেরিয়ে আসে। স্বভাবতঃই পাহাড়ের এই বাহুটি স্পষ্টপ্রকাশমান হয়। পাহাড়ের এই বিশেষ শাখাটিকে স্যালিয়েন্ট বা স্পার বা শৈলবাহু বলে।

(xxii) **স্লোপ (Slope) বা ঢাল :** ভূ-পৃষ্ঠের উত্থিত বা পতিত অঞ্চলকে স্লোপ বা ঢাল বলে। ঢাল ক্রম-গড়ানিয়াও হতে পারে, আবার বেশ খাড়াও হতে পারে। সাধারণতঃ সব পাহাড়েই ঢাল থাকে। পাহাড় ছাড়াও ভূ-পৃষ্ঠের অনেক অংশেই ঢালু জায়গা পাওয়া যায়। ঢালু জায়গাতেই ঢাল দেখা যায়।

যে ঢালের সব উচ্চতাতেই ঢালের নতি অপরিবর্তিত থাকে, সেই ঢালকে 'সমরূপ (Uniform)' ঢাল বলে। অবতল এবং উত্তল ঢাল সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

পাহাড়ী যুদ্ধে প্রতিটি ঢালের প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

(xxiii) **আণ্ডারফীচার (Underfeature) বা অপ্রধান গঠন :** প্রতিটি প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক গঠনেরই এক বা একাধিক ছোট ছোট বা অপ্রধান গঠন থাকে। আকারে ছোট বা ভূ-প্রকৃতির বিচারে গৌন এইসব গঠনকে 'অপ্রধান গঠন বা আণ্ডারফীচার (Underfeature)' বলে। এখানে উল্লেখ্য যে ভৌগোলিক বিচারে এই গঠনগুলোর বিশেষ কোন গুরত্ব না থাকলেও রণচাতুরী (tactic) পরিকল্পনায় বা তার বাস্তব প্রয়োগে এই অপ্রধান গঠনগুলোর গুরুত্ব যথেষ্ট।

(xxiv) **তরঙ্গিত ভুমি (Uudulating ground) :** উঁচুনীচু ভূমিতলকে 'তরঙ্গিত ভূমি' বলে। একটু দূর থেকে এই রকম ভূমিকে দেখলে মনে হয় যেন অনেকগুলো মাটির বা পাথরের ঢেউ জমাট বেঁধে আছে। যুদ্ধের কাজে এই শ্রেণীর ভূমি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

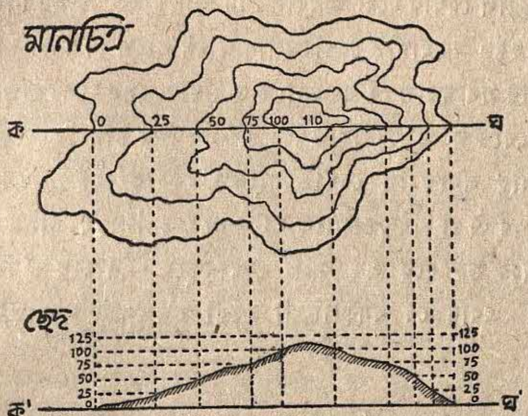
(xxv) **ওয়াটার কোর্স (Water coarse) বা জলের গতিপথ :** উপত্যকার সবচেয়ে নীচু অংশটি যে রেখা দিয়ে দেখানো হয় তাকে বলে 'ওয়াটার কোর্স বা জলের গতিপথ'। এই গতিপথে যে জল থাকতেই হবে এমন কোন শর্ত কিন্তু নেই, তবে বর্ষাকালে বা অন্য কোন ঋতুতে বর্ষা হলে সাধারণতঃ ঐ গতিপথ দিয়েই উপত্যকাটির জল প্রবাহিত হয়। যুদ্ধের জন্য 'ভূমিবিচারে (in the study of terrain)' এই গতিপথ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সৈন্যবাহিনী সামান্য অমনোযোগী হলে জলের গতিপথ তাদের দুর্দশার এমনকি ভয়ানক বিপদের কারণ হতে পারে।

(xxvi) **ওয়াটারশেড (Watershed) বা জলবিভাজিকা :** যে শৈলশিরা বা রীজ জলধারাকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে বাধ্য করে, তাকে বলা হয় জলবিভাজিকা বা ওয়াটারশেড। অন্যভাবে বলা চলে, যে শৈলশিরা দুটো অববাহিকাকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে তারই নাম জলবিভাজিকা। ভৌগোলিক এবং সামরিক বিচারে এই গঠন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সমোন্নতিরেখা ও ছেদ (Contour and section)

ভূতলের উল্লম্বছেদনের খসড়াচিত্রকে বলা হয় 'সেকশন (Section) বা ছেদ'। সমোন্নতি রেখার সাহায্যে মানচিত্রে পাহাড়ী অঞ্চলের নক্সা আঁকা হয়। যে পাহাড়টিকে সমোন্নতি রেখার সাহায্যে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, যদি সেই পাহাড়টিকে উল্লম্বভাবে ছেদন করে তার একটি খসড়াচিত্র

আঁকা হত তাহলে সেটি হত পাহাড়টির 'ছেদ বা সেকশন'। মানচিত্রে দেওয়া সমোন্নতি রেখা থেকেও পাহাড়ী অঞ্চলের ছেদ আঁকা যায়। বাস্তব-



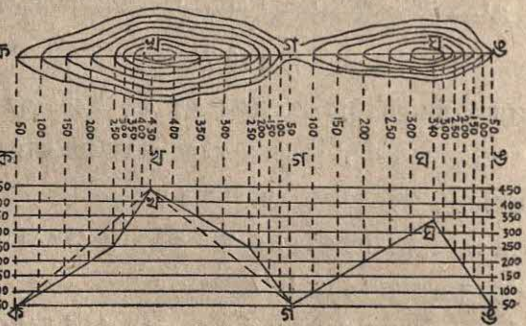
চিত্র 10·7

ক্ষেত্রে সচরাচর ছেদ আঁকার প্রয়োজন হয় না, তবে ছেদ আঁকলে ঐ পাহাড়ী অঞ্চলের অপজমি, অপ্রধান গঠন এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার দৃশ্যমানতা, প্রভৃতি সম্যক বোঝা যায়।

মানচিত্রে দেওয়া সমোন্নতি রেখার থেকে কী ভাবে ছেদ আঁকা যায় তাই সংক্ষেপে নীচে বলা হচ্ছে (চিত্র 10·7 দ্রষ্টব্য)।

সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যরেখা বরাবর ক ঘ একটি সরলরেখা আঁক। ক ঘ রেখাটির যে-সব বিন্দুতে সমোন্নতি রেখাগুলো ছেদ করেছে সে-সব বিন্দুগুলোকে চিহ্নিত কর। এবার হয় মানচিত্রটিতেই অথবা অন্য কোন সাদা কাগজে ক ঘ সমান একটি রেখা আড়াআড়িভাবে আঁক। এই রেখাটি সবচেয়ে বাইরের সমোন্নতি রেখার আনুভূমিক তলে অবস্থিত এবং এই আনুভূমিক রেখার সমস্ত বিন্দুতে অবস্থিত পার্বত্যভূমির স্থানগুলিও এই আনু-ভূমিক তলে অবস্থিত বলেই এই সরলরেখাটি উপরোক্ত সমোন্নতি রেখাটির প্রতিনিধিত্ব করছে। এই রেখাটির নাম রাখা হোক ক' ঘ'। এবার ক ঘ রেখার যে-সব বিন্দুতে অপর সমোন্নতিরেখাগুলো ছেদ করেছে সে-সব বিন্দু থেকে ক' ঘ' রেখাটির উপর লম্ব টান—লম্বগুলো নিশ্চয়ই সমান্তরাল হবে। এবার ক' ঘ' রেখার সমান্তরাল পরস্পর সমদূরবর্তী কতকগুলো রেখা টানতে হবে। এখানে দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে: (i) মানচিত্রে পাহাড়টি

বোঝাতে যে-কয়টি সমোন্নতি রেখা আঁকা হয়েছে ক' ঘ' রেখার সমান্তরাল রেখাগুলো যেন সংখ্যায় তার থেকে কম না হয়, এবং (ii) যে-কোন পরপর দুটো সমান্তরাল রেখার মধ্যে ব্যবধান যেন আনুভূমিক স্কেলের চাইতে অন্ততঃ ছয়গুণ বড় হয়। সমোন্নতি রেখাগুলোর পাশে পাশে যে উচ্চতা লেখা আছে ক' ঘ' রেখার সমান্তরাল রেখাগুলোতে ক্রমান্বয়ে সেই উচ্চতাগুলো লেখ। ক ঘ রেখা থেকে ক' খ' রেখার উপরে যে-সব লম্ব টানা হয়েছে সেগুলোও ক' খ' রেখার সমান্তরাল রেখাগুলোকেও ছেদ করেছে। এবার ক' বিন্দু থেকে পর পর ঐ ছেদবিন্দুগুলোকে সংযুক্তকরে একটি রেখা টান—এই রেখাটি ক' বিন্দু থেকে শুরু হয়ে সব কয়টি ছেদবিন্দুকে স্পর্শ করে ঘ' বিন্দুতে এসে শেষ হবে। এবার যে খসড়াচিত্রটি তৈরী হল সেটিই পাহাড়টির 'ছেদ বা সেকশন'।



চিত্র : 10·8

দুটো গিরিশৃঙ্গের ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

পারস্পরিক দৃশ্যমানতা
(Intervisibility)

ভূ-পৃষ্ঠ সব জায়গায় সমতল নয়—কোথাও উঁচু, কোথাও বা নীচু। আবার সমতল জায়গাতে ঝোপঝাড় গাছপালা বাড়ীঘর এসব থাকে। ফলে অনেক সময়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা দেখা যায় না, কেননা দৃষ্টিপথে কোন না কোন অন্তরায় থাকে। এক জায়গা থেকে আর একটি জায়গা যদি দেখা যায়, তাহলে জায়গাতুটোকে পরস্পর দৃশ্যমান বলে। আর যদি একটি জায়গা থেকে দ্বিতীয় জায়গাটি দেখা না যায় তাহলে জায়গা-তুটো পরস্পর অদৃশ্যমান। যুদ্ধক্ষেত্রে এই পারস্পরিক দৃশ্যমানতা বিশেষ প্রয়োজন। পাহাড়ী অঞ্চলে কিন্তু এই পারস্পরিক দৃশ্যমানতা প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। তাই পাহাড়ী অঞ্চলে ত বটেই, অন্যান্য অঞ্চলেও যুদ্ধ পরিচালনা করতে হলে বা ছোটবড় সৈন্যদল পাঠাতে হলে তার আগে ঐ অঞ্চলের মানচিত্র থেকে বিভিন্ন জায়গার পারস্পরিক দৃশ্যমানতা ভালভাবে বুঝে নিতে হয়। যদি এমন পথের সন্ধান পাওয়া যায় যে সে পথ দিয়ে আপন সৈন্য-দলকে পাঠালে তারা অনায়াসেই শত্রুসৈন্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু ঐ পথটি শত্রুর ঘাঁটি বা চৌকি থেকে অদৃশ্যমান বলে শত্রুসৈন্য কিছু টেরই পাবে না—তখন আচমকা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে ঘায়েল করা যাবে। আবার পাহাড়ী বা অন্যান্য জায়গায় যখন নিজেদের চৌকি, এমনকি বিভিন্ন ঘাঁটি, বসাতে হয় তখন দেখা উচিত যে বাছাই করা জায়গাগুলো যেন সম্ভব মত পরস্পর দৃশ্যমান হয়, কেননা তাহলে এক চৌকি থেকে অন্য চৌকির হাল-হাকিকত্ সহজেই বোঝা যায় এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যায়।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অবস্থাগুলোতে এক জায়গার বিভিন্ন অংশ পরস্পর দৃশ্যমান হয়, অবশ্য যদি জায়গাটি সমতল হয় এবং সেখানে গাছপালা বা বাড়ীঘর না থাকে :—(i) আদর্শ সমতল ভূমি, (ii) যখন অংশ তুটোর মধ্যবর্তী অঞ্চল সমভূমি অথবা অবতল ভঙ্গীতে ঢালু হয়ে গেছে, এবং (iii) যখন অংশতুটোর মধ্যবর্তী অঞ্চল বাটি বা গামলার মত নীচু থাকে।

অন্যদিকে নীচে লেখা অবস্থাগুলোতে সাধারণতঃ দুটো জায়গা পরস্পর দৃশ্যমান হয় না : (i) যখন জায়গাদুটোর মধ্যবর্তী অঞ্চল উত্তল ঢালের মত উঠে থাকে, অথবা (ii) যখন জায়গাদুটোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেক ঝোপঝাড় বা বড় বড় গাছপালা বা উঁচু বাড়ীঘর থাকে।

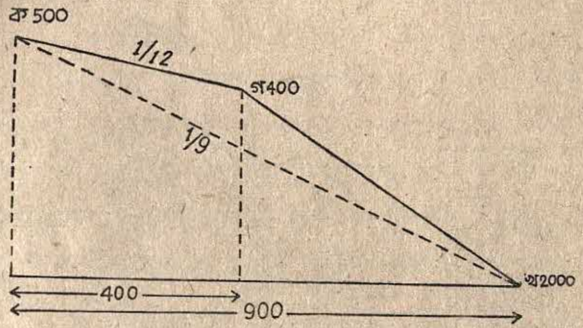
যাই হোক, সমোন্নতি রেখা সমন্বিত মানচিত্র ঠিকমত অনুধাবন করতে পারলে দুটো জায়গার পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যায়। মানচিত্র থেকে দুটো জায়গার পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করার আগে কয়েকটি বুনিয়াদি তথ্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া ভালো। যে মানচিত্রে ভি. আই. ছোট এবং সেই মানচিত্রে না-দেখানো প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম গঠনগুলোর উচ্চতা যদি কম হয়, সে মানচিত্রে দুটো জায়গার পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ধারণ করা সহজ। কিন্তু যে মানচিত্রের ভি. আই. বড়, অথবা মানচিত্রে না-দেখানো প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম গঠনগুলো বড়, সে মানচিত্র থেকে দুটো জায়গার পারস্পরিক দৃশ্যমানতার বিচার ত্রুটিহীন হওয়া দুঃসাধ্য। সাধারণতঃ মানচিত্রগুলোতে ভি. আই. থাকে 50 ফুট, কখনও বা 25 ফুট, কিন্তু ছোট ভি. আই. বলতে বোঝায় 10 ফুট। তাই মানচিত্র থেকে পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ণয় করার পরও সরেজমিনে গিয়ে দেখা প্রয়োজন হয়।

পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ (Methods of determining Intervisibility) : মানচিত্র থেকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে দুটো জায়গার পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ধারণ করা হয় : (i) ঢালসমূহের নতিমাত্রার তুলনা করে (by comparing the gradients of the slopes), (ii) সরল সমানুপাতিক অঙ্কের সাহায্যে (by a sum of simple proportion), (iii) বিভিন্ন পাহাড়ের ছেদ এঁকে (by drawing the sections of the hills), এবং (iv) সমানুপাতের সাহায্যে (by proportion)।

(i) **ঢালসমূহের নতির তুলনা :** চিত্র 11·1 ছবিটিতে 'ক' এবং 'খ' হচ্ছে দুটো পাহাড়ের চূড়া। 'ক'-এর উচ্চতা 500 ফুট আর 'খ'-র উচ্চতা 200 ফুট। 'ক' এবং 'খ'-র মাঝখানে আরেকটি পাহাড় আছে 'গ'। 'গ'-র উচ্চতা 400 ফুট। 'খ' থেকে 'ক' পাহাড়টির আনুভূমিক দূরত্ব 900 গজ, এবং 'গ' থেকে 'ক'-র দূরত্ব 400 গজ। এখন দেখতে হবে

'ক' এবং 'খ' পরস্পর দৃশ্যমান কিনা।

আলোচ্য পদ্ধতিতে 'কগ' ঢালের নতিমাত্রার সঙ্গে 'কখ' ঢালটির নতি-



চিত্র : 11·1

মাত্রার তুলনা করতে হবে। অতএব, প্রথমে ঢালদুটোর নতিমাত্রা বের করতে হবে।

$$\text{কগ ঢালের নতিমাত্রা} = \frac{\text{ভি. আই}}{\text{এইচ. ই.}}$$

$$= \frac{100 \text{ ফুট } (500 - 400 \text{ ফুট})}{400 \text{ গজ (ক থেকে গ'র আনুভূমিক দূরত্ব)}}$$

$$= \frac{100 \text{ ফুট}}{400 \times 3 \text{ ফুট}} = \frac{1}{12}$$

$$\text{কখ ঢালের নতিমাত্রা} = \frac{\text{ভি. আই.}}{\text{এইচ. ই.}}$$

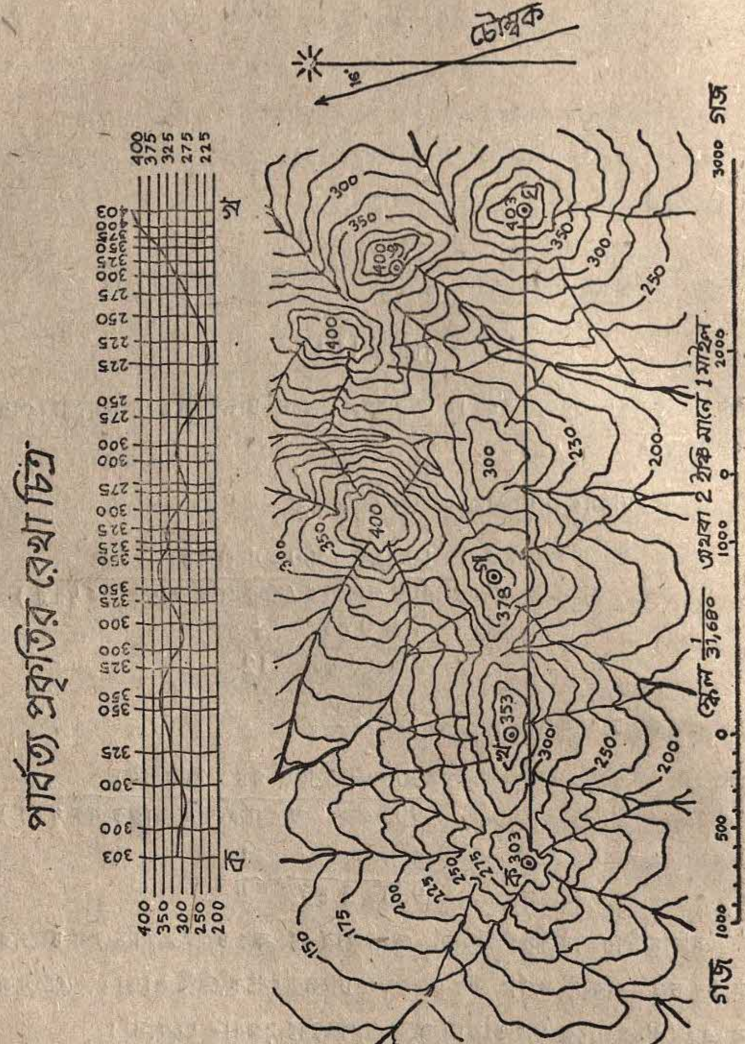
$$= \frac{300 \text{ ফুট } (500 \text{ ফুট} - 200 \text{ ফুট})}{900 \text{ গজ (ক থেকে খ'র আনুভূমিক দূরত্ব)}}$$

$$= \frac{300 \text{ ফুট}}{900 \times 3 \text{ ফুট}} = \frac{1}{9}$$

নতিদুটোর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কখ ঢালের নতি কগ ঢালের নতির চাইতে বড়, অর্থাৎ কখ ঢাল কগ ঢালের থেকে বেশী খাড়া। এক্ষেত্রে ক এবং খ'-র মাঝে 'গ' থাকায় ক ও খ পরস্পর দৃশ্যমান হবে না।

(ii) **সরল সমানুপাতিক অঙ্কের সাহায্যে** (by a simple proportion sum) : পরপৃষ্ঠার ছবিটিতে (11·2 চিত্র দ্রষ্টব্য) 'ক' পাহাড়টি থেকে পূর্বদিকে একটি পাহাড় আছে, যার নাম 'খ'। 'ক' পাহাড়টি থেকে 'খ' পাহাড়টির দূরত্ব 700 গজ, এবং 'খ' পাহাড়টির চূড়া 'ক' পাহাড়টির

চূড়া থেকে 50 ফুট উঁচু। 'খ' পাহাড়ের 820 গজ পূর্বে 'গ' নামক পাহাড়টি অবস্থিত, এবং 'গ' পাহাড়ের চূড়া 'ক' পাহাড়ের চূড়া থেকে 75 ফুট উঁচু।



চিত্র : 11·2

তাহলে 'ক' পাহাড়ের চূড়া থেকে কি 'গ' পাহাড়ের চূড়া দেখা যাবে, অর্থাৎ 'ক' পাহাড়ের চূড়া এবং 'গ' পাহাড়ের চূড়া কি পরস্পর দৃশ্যমান হবে ?

'ক' পাহাড় থেকে 'গ' পাহাড়ের দূরত্ব

$= 700$ গজ $+ 820$ গজ $= 1520$ গজ $= 4560$ ফুট।

'ক' পাহাড়ের চূড়া থেকে 'গ' পাহাড়ের চূড়ার উচ্চতা $= 75$ ফুট।

অর্থাৎ 'ক' পাহাড়ের চূড়া থেকে 'গ' পাহাড়ের চূড়া দেখার জন্য দৃষ্টি-পথকে 4560 ফুট দূরত্বে 75 ফুট উন্নীত করতে হয়।

তাহলে 700 গজ ('ক' পাহাড় থেকে 'খ' পাহাড়ের দূরত্ব) দূরত্বে এই দৃষ্টিপথ কতটা উন্নীত হয় তা একটি সরল সমানুপাতিক অঙ্কের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়,

700 গজ $= 2100$ ফুট ;

$2100 : 4560 :: X : 75$

অথবা $X = \frac{2100 \times 75}{4560} = 34{\cdot}5$ ফুট।

অর্থাৎ, 700 গজ দূরত্বে এই দৃষ্টিপথ মাত্র 34·5 ফুট উন্নীত হয়। কিন্তু 'ক' পাহাড় থেকে 700 গজ দূরত্বে অবস্থিত 'খ' পাহাড়ের চূড়া ত 'ক' পাহাড়ের চূড়া থেকে 50 ফুট উঁচু, যা নির্ধারিত দৃষ্টিপথকে বাধা দেবে। অতএব 'খ' পাহাড়ের অবস্থিতির জন্য 'ক' পাহাড়ের চূড়া এবং 'গ' পাহাড়ের চূড়া পরস্পর দৃশ্যমান হবে না, যদিও 'খ' পাহাড়টি 'গ' পাহাড়টির চাইতে কম উঁচু।

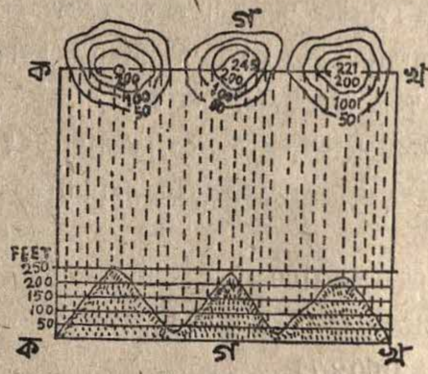
আবার যদি 'খ' পাহাড়টি 'ক' পাহাড়টির থেকে 1050 গজ দূরত্বে অবস্থিত হত, তাহলেই 'ক' পাহাড় এবং 'গ' পাহাড় পরস্পর দৃশ্যমান হত।

(iii) **বিভিন্ন পাহাড়ের ছেদ এঁকে** (by drawing the section of the hills) : আগের পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে যে সমোন্নতি রেখাগুলো থেকে পাহাড়ের ছেদ (section) আঁকলে সমস্ত ছোটখাটো গঠনও প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়। কাজেই যদিও এই পদ্ধতিটি সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ণয়ে পদ্ধতিটি বিশেষ কার্যকর।

পরপৃষ্ঠায় দেওয়া ছবিটি (চিত্র 11·3) থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে 'ক' এবং 'খ' পাহাড়দুটো পরস্পর দৃশ্যমান নয়।

(iv) **অনুপাতের সাহায্যে** (By proportion) : এই পদ্ধতিটি চিত্র 11·2 ছবিটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। একটি সরলরেখা দিয়ে 'ক' বিন্দুকে 'খ' বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করা হোল। 'ক' বিন্দুর উচ্চতা 303 ফুট,

আর 'খ' বিন্দুর 403 ফুট—অর্থাৎ বিন্দুদুটোর মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য 100 ফুট (ভি. আই.-র চারগুণ)। এবার ক খ রেখাটিকে এমন কয়টি অংশে



চিত্র : 11·3

ভাগ করা হোক যে-অংশগুলো নিম্নলিখিত উচ্চতাগুলোর মধ্যেকার এইচ. ই. জ্ঞাপক হবে—'ক' বিন্দু (303) এবং 325 ফুট, 325 এবং 350 ফুট, 350 এবং 375 ফুট, 375 এবং 400 ফুট 400 ফুট এবং 'খ' বিন্দু (403 ফুট)। দৈর্ঘ্যের যে-কোন এককে এইচ. ই.-গুলোর দূরত্ব মাপা যায় ; আলোচ্য ছবিটিতে এই দূরত্ব মাপা হয়েছে সেন্টিমিটার এককে।

ক খ সরলরেখার দৈর্ঘ্য 9·7 সে. মি.। 'ক' বিন্দু থেকে প্রথম এইচ. ই. জ্ঞাপক অংশটির দূরত্ব হচ্ছে 9·7 এর $\frac{22}{100}$ = 2·13 সে. মি.। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রতিটি অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 9·7 এর $\frac{25}{100}$ = 2·43 সে.মি.।

তাহলে এই তিনটি অংশের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য হচ্ছে—

2·43 সে. মি. × 3 = 7·29 সে.মি.।

সর্বশেষ অংশটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে 9·7 এর $\frac{3}{100}$ = 0·29 সে.মি.

এই মাপ অনুসারে কখ রেখাটিকে চিহ্নিত করা হোক। এই চিহ্নগুলো বিভিন্ন উচ্চতায়—অর্থাৎ 325 ফুট, 350 ফুট, 375 ফুট এবং 400 ফুট—দৃষ্টিপথটি কোথায় থাকবে, তা বোঝাবে। মানচিত্রে দেওয়া সমোন্নতিরেখা-গুলোর সঙ্গে এই উচ্চতাগুলোর অবস্থিতি মিলিয়ে দেখা হোক। যদি দেখা যায় যে দৃষ্টিপথের উচ্চতার চাইতে কোথাও ভূ-পৃষ্ঠ বেশী উঁচু তাহলেই বোঝা যাবে যে 'ক' এবং 'খ' পরস্পর দৃশ্যমান নয়। আলোচ্য ছবিটিতে 'খ' বিন্দুটি দৃষ্টিপথের চাইতে বেশী উচ্চতায় অবস্থিত, অতএব 'ক' এবং 'খ'

পরস্পর দৃশ্যমান নয়।

এই পদ্ধতিটি সহজ এবং এই পদ্ধতিটির সাহায্যে পারস্পরিক দৃশ্যমানতা খুব তাড়াতাড়ি নির্ধারণ করা যায়।

বাস্তবক্ষেত্রে একটি স্থিতিস্থাপক ফিতার (elastic ribbon) উপর এইচ. ই.-র দূরত্বজ্ঞাপক অংশগুলো চিহ্নিত করা হয়, এবং ঐ ফিতাটিকে আলোচ্য পাহাড়দুটোর শীর্ষবিন্দুর উপর সোজা করে ফেলে দেখা হয় দৃষ্টিপথের চাইতে উঁচু কোন বিন্দু আছে কিনা। যদি সে-রেকম কোন বিন্দু না থাকে, তবে পাহাড়দুটো পরস্পর দৃশ্যমান।

উপরের বিভিন্ন আলোচনা থেকে সাধারণভাবে বলা চলে যে—

(i) মানচিত্রে দেখান একটি উপত্যকার দুধারে অবস্থিত পাহাড় দুটোর মধ্যবর্তী অংশে উভয়ের থেকে উচ্চতর কোন গঠন না থাকে, তবে ঐ পাহাড়দুটো পরস্পর দৃশ্যমান ;

(ii) যে-কোন দুটো বিন্দুর মধ্যে তৃতীয় একটি উচ্চতর (উভয়ের থেকে) বিন্দু থাকে, তাহলে প্রথম বিন্দু দুটো পরস্পর অদৃশ্যমান ;

(iii) দুটো বিন্দুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তৃতীয় কোন বিন্দু যদি প্রথমোক্ত বিন্দু দুটোর যে-কোন একটির চাইতে উচ্চতর হয়, তাহলে প্রথম বিন্দু দুটো পরস্পর দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান হতে পারে ;

(iv) কোন উত্তল ঢালের দুই দিকে অবস্থিত দুটো বিন্দু পারস্পরিক দৃশ্যমান নয় ;

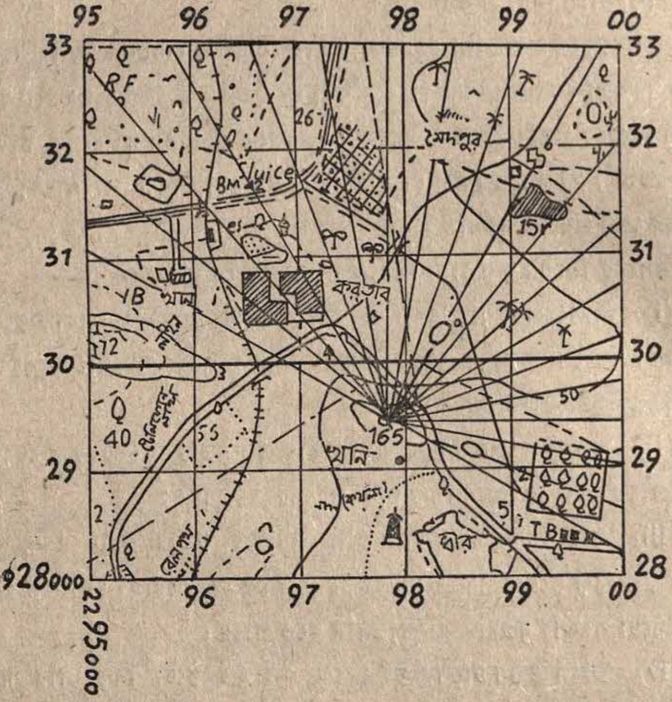
(v) অবতল ঢালের দুইদিকে অবস্থিত হলে বিন্দু দুটো পরস্পর দৃশ্যমান হবে ;।

(vi) সমতলভূমিতে দুটো বিন্দুর পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ভর করে বিন্দু দুটোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ঝোপঝাড়, গাছপালা, বাড়ীঘরের উচ্চতার উপর।

দৃশ্যমানতার ছবি (Visibility diagram)

সৈন্যদল কোন জায়গায় ঘাঁটি গাড়লে বা কিছুদিনের জন্য অবস্থান করলে, তাদের অবস্থিতির অঞ্চলে কোন এক বা একাধিক উঁচু জায়গাকে পর্যবেক্ষণ করার জায়গা 'পর্যবেক্ষণ বিন্দু বা অবজারভেশন পোষ্ট (Observation Post)' হিসাবে নির্ধারিত করে। সেই অবজারভেশন পোষ্ট থেকে ঐ অঞ্চলের কোন্ কোন্ জায়গা সরাসরি দেখা যায় আর কোন্ কোন্ জায়গা দৃষ্টিগোচর

হয় না তার একটি খসড়া চিত্র তৈরি করে। এই খসড়া চিত্রকে বলে 'দৃশ্যমানতার ছবি বা ভিজিবিলিটি ডায়াগ্রাম (Visibility diagram)' ।

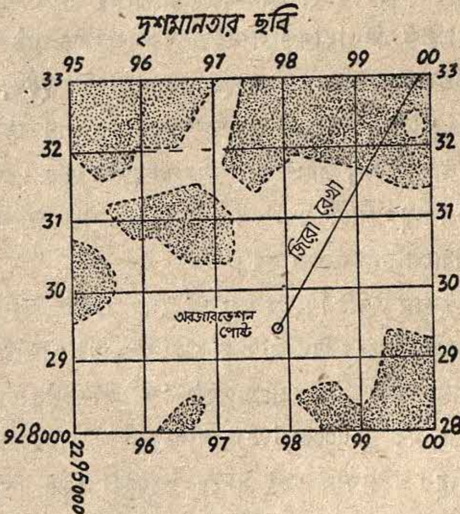


চিত্র : 11·4 (A)

দৃশ্যমানতার ছবি তৈরি করার পদ্ধতিটি বেশ সহজ। মানচিত্রের উপরে পর্যবেক্ষণ বিন্দুটি সর্বপ্রথম চিহ্নিত করতে হয়। সেই বিন্দু থেকে লক্ষ্য করার জায়গা বা পর্যবেক্ষ্য বিন্দু (place to be observed) পর্যন্ত একটি সরলরেখা টানতে হয়। এই রেখাটিকে বলে 0° ডিগ্রী রেখা বা 'জিরো রেখা (Zero line)'। এই জিরো রেখার উভয় পাশে পর্যবেক্ষণ বিন্দু থেকে প্রতি 10° ডিগ্রী পর পর কতকগুলো রেখা টানতে হয়। এই সরলরেখাগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিপথ বোঝায়। তারপর পূর্বে বর্ণিত যে-কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখতে হয় ঐ রেখাগুলোর মধ্যে দৃষ্টিরোধক কোন গঠন আছে কিনা।

যদি কোন দৃষ্টিপথের কোন বিন্দুতে দৃষ্টিরোধক কোন গঠন থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ দৃষ্টিপথে ঐ দৃষ্টিরোধক পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা চলবে;

দৃষ্টিরোধকের পিছনের অঞ্চল থেকে যাবে পর্যবেক্ষণের আওতার বাইরে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে মানচিত্রে যে-সব দৃষ্টিপথে কোন দৃষ্টিরোধক দেখা যাচ্ছে না সে-সব দৃষ্টিপথেও কিন্তু দৃষ্টিরোধক থাকতে পারে—কেননা মানচিত্রটি তৈরি করার সময় যে-সব জায়গায় গাছপালা বা বাড়ীঘর ছিল না পরবর্তীকালে সেখানে বড় বড় গাছ বা উঁচু উঁচু বাড়ী তৈরী হয়ে থাকতে পারে। তাই দৃশ্যমানতার পাকা ছবি আঁকার আগে ঐসব অঞ্চলে সরেজমিন তদন্ত করা উচিত। একটি কথা সব সময়ই মনে রাখতে হয় যে মানচিত্র কখনও কোন একটি অঞ্চলের সর্বাধুনিক ছবি দিতে পারে না, তাই মানচিত্রকে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে মানচিত্রের প্রামাণ্যতা যাচাই করে নিতে হয়।



চিত্র : 11'4 (B)

এমনিভাবে মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে এবং বাস্তব তদন্তের মধ্য দিয়ে দেখে নিতে হয় পর্যবেক্ষণ বিন্দু থেকে কোনদিকে কতটা সাফ্ দেখা যায়। এবার মানচিত্র থেকে অন্য একটি কাগজে শুধু গ্রিড্ লাইন এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গঠনগুলো এঁকে নিয়ে (অবশ্যই প্রথাগত সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে) দৃশ্যমানতার ছবি আঁকতে হয়। দৃশ্যমান অঞ্চলগুলো পরিষ্কার রাখা হয় এবং অদৃশ্যমান জায়গাগুলোকে কালো করা হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আবহচিত্র
(Weather Chart)

'জলবায়ু (climate)' এবং 'আবহাওয়া (weather)' সমার্থক নয়। সাধারণতঃ কোন একটি স্থানে পর পর অনেক বছর যে ধরনের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুর গতিবেগ ও গতিমুখ, দিনের দৈর্ঘ্য, বৃষ্টিপাত, প্রভৃতি ভূ-প্রাকৃতিক উপাদান লক্ষ্য করা যায় তার উপর ভিত্তি করেই ঐ স্থানের জলবায়ু বা বছরের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার গড় প্রকৃতি ও পরিবর্তন নিরূপিত করা হয়। কোন স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভৌগোলিক উপাদানগুলোর উপর—(ক) ভূ-পৃষ্ঠে অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমাংশের উপর অবস্থিতি, (খ) সমুদ্র থেকে স্থানটির দূরত্ব, (গ) সমুদ্রতল থেকে জায়গাটির উচ্চতা, (ঘ) প্রতিবেশী অঞ্চলে বড় পর্বতশ্রেণীর অবস্থিতি ও সেই অবস্থিতির প্রকৃতি, এবং (ঙ) বায়ুর গতিবেগ এবং গতিমুখ। কোন একটি স্থানের জলবায়ু সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে ঐ অঞ্চলটির বিভিন্ন ঋতুর জলবায়ু পর্যালোচনা করতে হয়।

অপর পক্ষে কোন একটি বিশেষ স্থানে বিশেষ একটি ক্ষণে যে উষ্ণতা, আর্দ্রতা, দৃশ্যমানতা, মেঘের উপস্থিতি ও প্রকৃতি, বায়ুর গতিবেগ ও গতিমুখ, ইত্যাদি বিদ্যমান তাই নিয়ে গড়ে উঠে 'আবহাওয়া'র ধারণা। কোন একটি জায়গার ক্রমিক (successive) আবহাওয়ার সমন্বয়েই তৈরি হয় ঐ জায়গাটির জলবায়ু। আবার একই সময়ে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমপ্রকৃতির আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। আবার হয়ত দেখা যায় যে কয়েকটি জায়গার তাপমাত্রা এক, কিন্তু আর্দ্রতা এক নয়। আবার হয়ত আর্দ্রতা সমান, কিন্তু তাপমান বা বায়ুর গতিবেগ এক নয়। সাধারণতঃ কোন জায়গার আবহাওয়া নিরূপণ করতে হলে প্রধানতঃ যে-সব উপাদানগুলো লক্ষ্য করা হয় সেগুলো হচ্ছে—(1) বায়ুচাপ (atmospheric pressure), (2) দৃশ্যমানতা (visibility), (3) উষ্ণতা (temperature), (4) বাতাসের গতিমুখ ও গতিবেগ (direction and velocity of wind), (5) আর্দ্রতা (humidity), (6) মেঘের উপস্থিতি ও তার প্রকৃতি। গ্রীনিচ মধ্য সময়

(Greenwich Mean Time) অনুসারে প্রতি তিনঘণ্টা অন্তর অন্তর পৃথিবীর কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট আবহাওয়া পরিবেক্ষণ কেন্দ্রে এই সব বিষয়ে 'উপাত্ত বা ডেটা (Data)' সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি আবহাওয়া পরিবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে এই সব উপাত্তের আদানপ্রদান হয়। বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। সমস্ত উপাত্তকে কতকগুলো বিধিবদ্ধ গাণিতিক সংকেতে (numerical code)-এ রূপান্তরিত করা হয়। কিছু কিছু উপাত্ত জাহির করবার জন্য কতকগুলো বিধিবদ্ধ সাংকেতিক চিহ্নও আছে। বিভিন্ন আবহাওয়া পরিবেক্ষণ কেন্দ্রে সংগৃহীত উপাত্তগুলো মানচিত্রের উপর বসানো হয়। তারপর সমতাপমাত্রার জায়গাগুলোকে, বা যেসব জায়গায় বায়ুর গতিমুখ এবং গতিবেগ এক বা প্রায় এক,—অর্থাৎ সমউপাত্ত-সমন্বিত জায়গাগুলোকে মানচিত্রের উপর বিশেষ রেখা দিয়ে যুক্ত করলে যে-চিত্রটি ফুটে উঠে তাকেই বলে 'আবহচিত্র (Weather Chart)'।

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন উচ্চতায় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্দিষ্ট একটি উচ্চতায়, এবং বায়ুস্তরের উপরের অংশে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট উচ্চতায় আবহাওয়ার উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন উচ্চতায় সংগৃহীত উপাত্তগুলো দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন 'আবহচিত্র' তৈরি করা হয়।

আবহচিত্র সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস তৈরি করা যায়, এবং সেই মত সৈন্য চলাচল বা যুদ্ধ-চাতুরী নিরূপণ করা যায়। বর্তমান যুগে আকাশপথে যুদ্ধ যখন যুদ্ধের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তখন প্রতিরক্ষার কাজে আবহচিত্রের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

বৈমানিকরা সাধারণতঃ আবহাওয়ার যে সব উপাত্তগুলো বিশেষভাবে জানতে চান তাদের সংক্ষিপ্তরূপে একটি সূত্রে বলা হয় 'Vat B'। কয়েকটি ইংরাজি শব্দের আদ্য অক্ষর জুড়ে কিন্তু এই বিশেষ সূত্রটি তৈরি হয়েছে। সূত্রটি নীচে ব্যাখ্যা করা হল—

V (visibility **বা দৃশ্যমানতা**)ঃ খালিচোখে কত মাইল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়;

A (amount of clouds **বা মেঘের পরিমাণ**)ঃ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কত ফুট উচ্চতায় কী পরিমাণে মেঘ আছে এবং তার প্রকৃতি;

T (height of cloud top **বা মেঘের শীর্ষদেশের উচ্চতা**)ঃ মেঘ একটি ঘন পদার্থ—তাই তার যেমন দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে তেমনি আছে

তার উচ্চতা ; মেঘের ঐ উচ্চতা কতখানি এবং মেঘের শীর্ষদেশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কত হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত সেই উপাত্তটি এখানে বলা হয় ;

B (height of cloud base **বা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মেঘের ভূমিরেখা বা তলদেশের উচ্চতা**) ঃ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কত হাজার ফুট উচ্চতায় মেঘের তলদেশ বা ভূমিরেখা বা নিম্নরেখাটি অবস্থিত।

শুধুমাত্র এই কয়টি তথ্য জানলেই একজন বিমানচালকের চলে না, তাঁকে আরও জানতে হয় বায়ুমণ্ডলে বর্তমান মেঘগুলো কোন্ শ্রেণীর এবং তাদের ঘনত্বই বা কতটা। কতদূর আয়তন জুড়ে মেঘগুলো ছড়িয়ে আছে। তাছাড়াও একজন বৈমানিককে জানতে হয় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের তাপ, চাপ, বায়ুর গতিমুখ, বায়ুর গতিবেগ, ইত্যাদি বহু তথ্য।

প্রশ্ন হতে পারে একজন বৈমানিককে এত সব জানতে হয় কেন ? একজন বৈমানিককে ত বিমান চালাতে হয় বায়ু মণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায়, আবার বিমানকে উড়তে ও নামতে হয় ভূ-পৃষ্ঠের উপর। কাজেই ভূ-পৃষ্ঠের এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় আবহাওয়ার সব কয়টি উপাদানের সঙ্গে বিমানের সমন্বয় সাধন করে একটি যথাযথ ভারসাম্য তৈরি করতে হয় ; প্রয়োজনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি করতে না পারলে আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় বিমানটি চলতে ত পারবেই না, এমন কি ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, বিমানের নিরাপদ উড্ডয়নের জন্যই বিমানচালককে আবহাওয়ার সমস্ত তথ্য জানতে হয়। মনে রাখা দরকার, বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য সবচেয়ে ছোট পথে ন্যূনতম সময়ে বিমানচালককে নিরাপদে বিমান নিয়ে পৌঁছতে হয়।

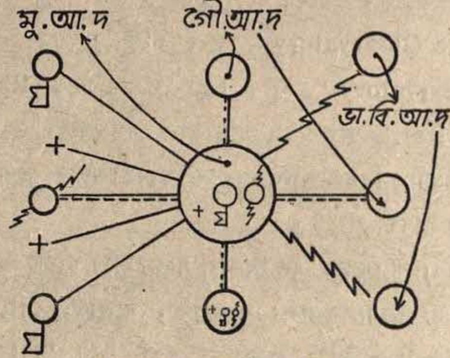
আবহাওয়ার তথ্য কেবল বৈমানিকদেরই লাগে না, জলযান অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ, সওদাগরী জাহাজ, এমনকি মাছধরার জাহাজ ও নৌকা, যাঁরা চালান তাঁদেরও বিশেষ প্রয়োজন। সমুদ্রপৃষ্ঠের এবং ডুবোজাহাজের ক্ষেত্রে সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতার আবহাওয়া জানা না থাকলে জলযান অকস্মাৎ ঝড়-বৃষ্টি বা উষ্ণস্রোতের মধ্যে পড়ে বিপন্ন হতে পারে—অনেক সময় ধ্বংসও হয়ে যায়। এই সব কারণেই বিমানচালক এবং জলযানচালকদের আবহাওয়া বিজ্ঞান জানা আবশ্যক। আবহাওয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি জানা থাকলেই আবহচিত্র তৈরি করা বা আবহচিত্র পড়া সম্ভব হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ভারত সরকারের অধীনে একটি বিভাগ আছে। বিভাগটির নাম 'মেটেরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (Meteorological Department)' বা আবহাওয়া বিভাগ। এই বিভাগটির অধীনে অনেকগুলো 'আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Weather Observatory)' আছে। এদের মধ্যে প্রায় 300টি 'কেন্দ্র ভূ-পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Surface Observatory)', প্রায় 60টি 'বেলুন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Balloon Observatory)', প্রায় 15টি 'রেডিও সণ্ডে (Radio Sonde)' পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, ইত্যাদি আছে। তাছাড়াও সমুদ্রবক্ষে ভাসমান জাহাজ এবং আকাশে উড্ডীন বিমানগুলো থেকেও আবহাওয়ার তথ্যাদি সংগ্রহ ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃত এই বিশাল সংগঠনটির চারটি আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয় আছে। কার্যালয়গুলো কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং নূতন দিল্লীতে অবস্থিত। প্রতিটি অঞ্চলেই একটি করে 'মূখ্য পূর্বাভাস কেন্দ্র (Principal Forecast Centre)' এবং কয়েকটি করে 'গৌণ পূর্বাভাস কেন্দ্র (Dependent Forecast centre)' আছে। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সমস্ত তথ্য মূখ্য পূর্বাভাস কেন্দ্রে আসে। ঐ কেন্দ্রে তথ্যগুলোর ভিত্তিতে আবহচিত্র তৈরী হয় এবং তাদের বিশ্লেষণ হয়। আপন আপন অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘোষণা করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিপদের সংকেত সূচিত করার মূল দায়িত্ব থাকে মূখ্য পূর্বাভাস কেন্দ্রের উপর।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ভারতীয় বিমানবাহিনীরও নিজস্ব একটি আবহাওয়া বিভাগ আছে। বিমানবাহিনীর সদর দফ্‌তরেই একটি 'আবহাওয়া সেকশন (Meeotrlogical Section)' অবস্থিত। পালাম, আগ্রা, আম্বালা, জম্মু, শ্রীনগর, কানপুর, পুনা, হাকিমপেট, কলাইকুণ্ডা ও ব্যারাকপুরে রয়েছে স্বতন্ত্র পূর্বাভাস কেন্দ্র। বেগমপেট, হাকিমপেট, জলাহাল্লী এবং যোধপুরে রয়েছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বিমানবাহিনীর সবকয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের সঙ্গে আবহাওয়া বিভাগের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আবহাওয়া সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য বিমানবাহিনীর কেন্দ্রগুলোকে জানানো হয়। এমন কি বিমান পরিচালক আকাশপথে পরিক্রমার সময় প্রায় 15 মিনিট অন্তর অন্তর ভূ-পৃষ্ঠের কোন না কোন আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে বেতার তরঙ্গে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত আবহবার্তা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করতে পারেন।

অসামরিক আবহাওয়া বিভাগের সঙ্গেও বিমানবাহিনীর আবহাওয়া কেন্দ্রগুলোর তথ্যের আদান-প্রদান হয়। টেলিপ্রিণ্টার, তার ও বেতারের মাধ্যমে তথ্যের লেনদেন চলে। বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ কী ভাবে চলাচল করে তার একটি নক্সা নীচে (চিত্র 12·1) দেওয়া



আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন সংগঠন এবং তাদের যোগসূত্র

1.	ভারতীয় বিমানবাহিনীর আবহাওয়া দফতর	ভা.বি.আ.দ
2.	মুখ্য আবহাওয়া দফতর	মু.আ.দ
3.	গৌন আবহাওয় দফতর	গৌ.আ.দ
4.	রেডিওসন্ডে পর্যবেক্ষন কেন্দ্র	[illegible]
5.	বেলুন পর্যবেক্ষন কেন্দ্র	[illegible]
6.	ভূপৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (স্থল অথবা জাহাজ)	+

চিত্র : 12·1

হল। আবহাওয়া যেহেতু কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমিত থাকে না, সেহেতু সাধারণতঃ আবহাওয়ার তথ্য ও বিপদের স্থচনা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও আদান-প্রদান হয়। অবশ্য যুদ্ধ চলাকালে এই আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ অনেকাংশে বিছিন্ন হয়ে পড়ে।

কার্যতঃ ভারতীয় 'আবহ-বিজ্ঞান সংগঠন (Indian Meteorological Organization)' 'আন্তর্জাতিক আবহ-বিজ্ঞান সংগঠন (International Meteorological Oranization)'-এরই অঙ্গ।

আবহাওয়া সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ (Meteorological Observation)

আগেই বলা হয়েছে যে সারাদেশের স্থলসীমা, জলসীমা এবং আকাশ-সীমা জুড়ে ছড়ানো পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে নিরন্তর আবহাওয়া সম্বন্ধীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিছু কিছু উপাত্ত খালি চোখে সংগৃহীত হলেও বেশীরভাগ উপাত্তই আহরণ করতে হয় নানা রকমের যন্ত্রের সাহায্যে। দৃশ্য-মানতা (visibility), স্থল-জল-আকাশের সাধারণ অবস্থা খালি চোখেই বোঝা যায়, আবার বাতাস ও মেঘের গতিপথ এবং গতিবেগ যেমন খালি চোখেও বোঝা যায় তেমনি যন্ত্রের সাহায্যেও অনুধাবন করা যায়, কিন্তু তাপ, চাপ, আর্দ্র'তা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং অনেক উঁচুস্তরের বাতাসের প্রকৃতি বুঝতে যন্ত্রপাতি অপরিহার্য।

তাপের পর্যবেক্ষণ (Observation of Temperature)

তাপ মাপার স্কেল তিন রকম—সেন্টিগ্রেড বা সেলশিয়াস (Centigrade or Selsius), ফারেনহাইট (Fahrenheit) এবং স্বতন্ত্র বা অ্যাবসল্যুট (Absolute)। সাধারণতঃ কাঁচের ক্যাপিলারি নলের মধ্যে পারদ পুরেই থার্মোমিটার বা তাপমাপক যন্ত্র তৈরী হয়।

পর্যবেক্ষণের যন্ত্র (Instrument of observation)ঃ সাধারণতঃ তাপ পর্যবেক্ষণের জন্য তিন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়—(i) ম্যাক্সিমাম থার্মোমিটার (maximum thermometer), (ii) মিনিমাম থার্মোমিটার (minimum thermometer), এবং (iii) থার্মোগ্রাফ (Thermograph)।

ম্যাক্সিমাম থার্মোমিটারে বাল্‌বের থেকে এক ইঞ্চি উপরে একটা খাঁজ থাকে। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্‌বের পারদ ঐ খাঁজ অতিক্রম করে উপরে উঠতে থাকে—সর্বোচ্চ তাপে উঠার পর কিন্তু পারদ আর তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে নীচে নেমে আসতে পারে না। তাই এই ধরনের থার্মোমিটারের সাহায্যে কেবল কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশে, যেমন দৈনিক, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাপা চলে। সাধারণতঃ মানুষের জ্বর মাপতে এই যন্ত্রই ব্যবহার করা হয়।

মিনিমাম থার্মোমিটারে কিন্তু কাঁচের নলের মধ্যে কোহল বা স্পিরিট ভরা থাকে ('Spirit-in-glass')। স্পিরিটের সূত্রের মধ্যে একটি 'সূচক (index)' দেওয়া থাকে। তাপমান কমতে থাকলে ঐ সূচকটি নীচে নামতে থাকে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় গিয়ে সূচকটি আটকে থাকে।

থার্মোগ্রাফ্ (Thermograph) একটি সুবেদী যন্ত্র—এতে দুটো ভিন্ন ধাতুর পাত গায়ে গায়ে পরস্পর যুক্ত থেকে কুণ্ডলীর আকারে থাকে। তাপ-মাত্রা বাড়াকমার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর পাতদুটোও সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়—ফলে কুণ্ডলীটি আঁটো বা ঢিলা হয়। কলমের মত দাগ দেবার একটি দণ্ড বা 'পেন-রড্ (pen-rod)' ঐ কুণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কুণ্ডলীটির প্রসারণ-সঙ্কোচনের ফলে পেন-রড্‌টিরও জায়গার পরিবর্তন হয়। পেন-রড্‌টির সূক্ষ্ম পেন-প্রান্তটি একটি 'অংশাঙ্কিত (graduated)' কাগজের সঙ্গে লাগানো থাকে,—ঐ কাগজটির নাম 'থার্মোগ্রাম (Thermogram)'। থার্মোগ্রামটি বসানো থাকে একটি 'ক্লক ড্রাম (Clock drum)'-এর উপর। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ক্লক ড্রামটি ঘুরতে থাকে, আর পেন-রড্‌টি থেকে তার উপরে দাগ পড়ে। তাপমাত্রা বাড়াকমার সঙ্গে তাল রেখে পেন-রড্‌টির স্থান পরিবর্তিত হয়—ফলে এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটির সাহায্যে সারাক্ষণই তাপমাত্রার তারতম্যের একটি রেখাচিত্র (graph) আঁকা হয়ে যায়।

আর্দ্রতার পর্যবেক্ষণ (Observation of Humidity)

আদ্র'তা পর্যবেক্ষণের জন্য সহজ যন্ত্র হচ্ছে 'ওয়েট-বাল্‌ব্ (Wet Bulb)' থার্মোমিটার। এটি একটি সাধারণ পারদের থার্মোমিটার, তবে এই থার্মোমিটারে পারদের বাল্‌ব্‌টির উপর একটি ভিজা মস্‌লিন জড়ানো থাকে। মসলিনটির জলের বাষ্পীভবন হবার ফলে বাল্‌বের পারদ তুলনা-মূলকভাবে ঠাণ্ডা থাকে। বাতাসে যদি জলকণা কম থাকে, তবে বাষ্পী-ভবন তাড়াতাড়ি হয়। আবার বাষ্পীভবনের হার (rate)-এর উপর শীতল হবার মাত্রা নির্ভরশীল। একটি সাধারণ পারদ-থার্মোমিটার এবং একটি ওয়েট-বাল্‌ব্ থার্মোমিটার পাশাপাশি রাখলে দুটোর মধ্যে কোন সময়েই তাপাঙ্ক এক থাকবে না। থার্মোমিটার দুটোর নির্দেশিত তাপ-মাত্রার পার্থক্য থেকেই বাতাসের আদ্র'তার একটি হিসেব করা যায়।

বৃষ্টিপাতের পর্যবেক্ষণ (Observation of Rainfall)

বৃষ্টিপাত পরিমাপ করার যন্ত্রটির নাম 'রেইনগজ (Rainguage)'।

বায়ুর গতিমুখ ও গতিবেগ পর্যবেক্ষণ (Observation of the direction and speed of the Wind)

ভূ-পৃষ্ঠে এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় এবং একই উচ্চতায় বিভিন্ন সময়ে বাতাসের গতি বা গতিমুখ এক থাকে না। কাজেই ভূ-পৃষ্ঠে এবং

বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে বাতাসের গতি ও গতিমুখ পর্যবেক্ষণের জন্য ভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ভূ-পৃষ্ঠে বাতাসের গতিমুখ দেখার জন্য যে-যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তার নাম 'উইণ্ড ভেন (Wind Vane)', আর বাতাসের গতি মাপা হয় 'অ্যানিমোমিটার (Anemometer)' নামক যন্ত্রের সাহায্যে।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের গতিমুখ নির্ণয় করা হয়ে থাকে 'থিয়োডোলাইট (Theodolite)' নামক যন্ত্র দিয়ে, আর গতিবেগ মাপা হয় হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা যন্ত্রসজ্জিত 'পাইলট বেলুন (Pilot Balloon)' দিয়ে।

বায়ুমণ্ডলের চাপ পর্যবেক্ষণ (Observation of Atmospheric Pressure)

ভূ-পৃষ্ঠকে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা যথেষ্ট। বায়ুমণ্ডলের বাতাস সর্বদাই নীচের দিকেও চাপ দেয়—ভূ-পৃষ্ঠে বা বায়ুমণ্ডলের যে কোন নির্দিষ্ট উচ্চতায় অবস্থিত কোন স্তরে তার ঊর্ধ্বাকাশের বায়বীয় পদার্থের ওজন জনিত চাপ সেই স্তরের যে-কোন স্থানে সবদিকে সমান মানে ক্রিয়া করে—ফলে এই চাপ নীচের দিকেও ক্রিয়াশীল। বায়বীয় পদার্থের এই নিম্নমুখী চাপকেই বায়ুমণ্ডলের চাপ বলে। কোন একটি স্থানে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলতে বোঝায় আনুভূমিক তলের এক বর্গ একক জায়গার উপর লম্বভাবে অবস্থিত বায়ুর স্তম্ভ (column) ওজন জনিত যে বল প্রয়োগ করে তাকে। স্বভাবতঃই ভূ-পৃষ্ঠের উপর বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য যত বেশী বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে বায়ুস্তম্ভ তত দীর্ঘ নয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উঁচুতে উঠা যাবে বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য তত কমবে। দীর্ঘতর বায়ুস্তম্ভের মধ্যে বাতাসের পরিমাণ বেশী বলে বাতাসের চাপও বেশী হয়। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের চাপ কমতে থাকে; কেননা সেই স্তরের নীচে অবস্থিত বায়ুস্তম্ভের ওজন জনিত চাপ সেই স্তরকে বহন করতে হয় না, শুধুমাত্র সেই স্তরের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বায়ুস্তম্ভের চাপই তাকে বহন করতে হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপের একক 'মিলিবার (milibar)'। এখন সমুদ্রপৃষ্ঠে এবং বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের চাপের একটি ছোট তালিকা নীচে দেওয়া হল।

সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের	প্রমাণ চাপ	1013·2	মিলিবার,
ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 5,000 ফুট উচ্চতায়	„ „	850·00	„
„ „ 10,000 ফুট „	„ „	700·00	„
„ „ 18,000 ফুট „	„ „	500·00	„

মোটামুটিভাবে বলা চলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি হাজার ফুটে প্রায় 30 মিলিবার হারে বায়ুমণ্ডলের চাপ হ্রাস পায়—একে বলা হয় বায়ুমণ্ডলের চাপের 'হ্রাসপ্রাপ্তির হার (lapse rate)'।

বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপা হয় 'ব্যারোমিটার (Barometer)' নামক যন্ত্র দিয়ে। ধাতুর আবরণীতে আবৃত একটি কাঁচের নলের মধ্যে পরিপূর্ণ অবস্থায় পারদ ভরে দিয়ে যন্ত্রটি তৈরী হয়। কাঁচের নলটির এক পাশে একটি 'অংশাঙ্কিত (graduated)' স্কেল থাকে। কাঁচের নলটির মধ্যে পারদের স্তম্ভটি কত উঁচুতে উঠে আছে অংশাঙ্কিত স্কেল দিয়ে তা অতি সহজেই মাপা যায়। 45° ডিগ্রী অক্ষাংশে 32° F (0°C) উষ্ণতায় সমুদ্রতলে ব্যারোমিটার নির্ভুলভাবে বায়ুমণ্ডলের যে চাপ নির্ণয় করে তাকেই বলে 'প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (Standard Atomspheric Pressure)'।

বায়ুমণ্ডলের চাপ সরাসরি মিলিবার এককে মাপার পক্ষে 'অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার (Aneroid barometer)' খুব উপযোগী। সুবিধাজনকও বটে। কেননা যন্ত্রটি ছোট এবং নিয়ে চলাফেরা করা সহজ। যন্ত্রটির স্কেল 'মিলিবার'-এ বিভক্ত থাকে এবং কাঁটাটি যেসময় কোনস্থানে স্কেলের যে দাগ বরাবর থাকে সেই দাগের পাঠ (মিলিবার-এ) সেই সময় সেই স্থানে বায়ুমণ্ডলের চাপ তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ করে। আবার চাপ মাপার স্কেলের পাশাপাশি উচ্চতা মাপার এককে বিভক্ত দ্বিতীয় একটি স্কেল যুক্ত থাকলে এই যন্ত্র দিয়ে সমুদ্রতল থেকে কোন স্থানের অবস্থিতির উচ্চতাও অনায়াসে মাপা যায়। সে ক্ষেত্রে যন্ত্রটি 'উচ্চতা-মাপক-যন্ত্র (Altimeter)'-এ পরিণত হয়। বিমানে এই উচ্চতা-মাপক-যন্ত্র (Altimeter)-টি একটি অবশ্য গ্রহণীয় যন্ত্র হিসাবে সংযুক্ত থাকে। বিমানটি বায়ুমণ্ডলে সমুদ্রতল থেকে অথবা কোন বিমান ক্ষেত্রের আনুভূমিক তল থেকে কতটা উচ্চতায় অবস্থিত তা 'অলটিমিটার (Altimeter)' বা উচ্চতা-মাপক-যন্ত্রের পাঠ থেকে বিমানচালক সরাসরি জানতে পারেন। এটা বিমানচালকের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ বা তথ্য।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি নয় কিম্বা দশ হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি 30 ফুট উচ্চতা বৃদ্ধিতে 1 মিলিবার করে হ্রাস পায়। এই হিসেব মত, কোন এক সময় বিমান ক্ষেত্র ত্যাগ করে আকাশে উড়ার

পূর্বে সেই সময়কার সমুদ্রতলে বায়ুমণ্ডলের চাপ জেনে নিয়ে বায়ুমণ্ডলের কোন এক উচ্চতায় বিমানটি নিয়ে গেলে সেই উচ্চতায় সেই সময় 'অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার (Aneroid barometer)'-এর পাঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের চাপ জানা যায় এবং সমুদ্রতলের চাপ থেকে বায়ুমণ্ডলের সেই উচ্চতায় চাপ কতটা হ্রাস পেল তা দেখে নিয়ে বিমানচালক অনায়াসে জানতে পারেন বিমানটি সেই সময় কত উচ্চতায় অবস্থিত। অবিশ্যি উচ্চতার এককে বিভক্ত স্কেলযুক্ত 'উচ্চতা-মাপক-যন্ত্র বা অলটিমিটার (Altimeter)' স্কেলের গায়ে তার কাঁটার নির্দেশে সে খবর সরাসরি বিমানচালককে জানিয়ে দেয়।

বিনা যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করা যায় মেঘের প্রকৃতি (অর্থাৎ স্ট্রেটাস, কিউমিউলাস, সিরাস, নিম্বাস, নিম্বোষ্ট্র্যাটাস, নিম্বোকিউমিউলাস, ইত্যাদি), মেঘের পরিমাণ, দৃশ্যমানতা, প্রভৃতি। তবে এই পর্যবেক্ষণ নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উপর।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় তাপ, আর্দ্রতা, এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ জানা যায় 'রেডিও-সণ্ডে' (Radio-sonde)'-এর মাধ্যমে। বেলুনের সাহায্যে রেডিও-সণ্ডেগুলোকে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন উচ্চতা থেকে রেডিও-সণ্ডেগুলো রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে উপাত্তগুলো পর্যবেক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

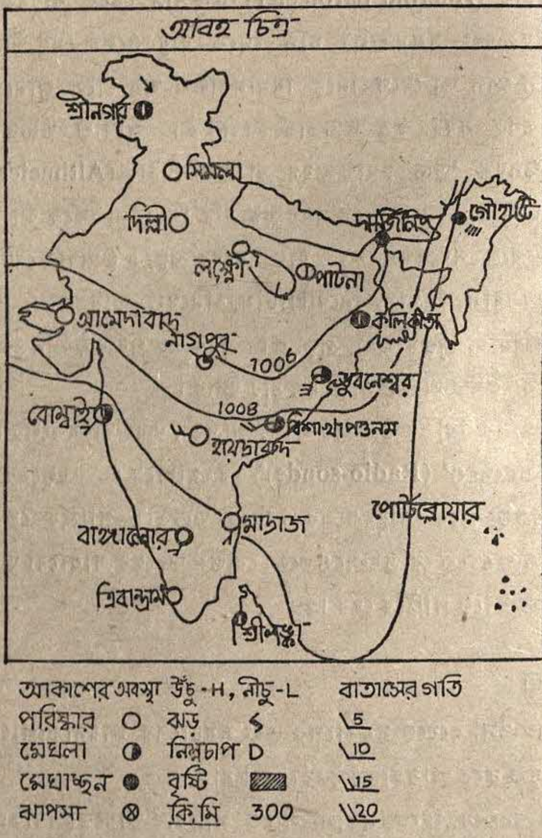
আবহচিত্র

আগেই বলা হয়েছে সমতাপের এবং সমচাপের জায়গাগুলোকে রেখার সাহায্যে যুক্ত করে আবহচিত্র তৈরী করা যায়।

একটি বিশেষ দিনে সকাল সাড়ে সাতটায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি প্রধান আবহাওয়া পরিবেক্ষণ কেন্দ্রে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরী আবহচিত্র পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল (চিত্র 12·2)।

প্রদত্ত আবহচিত্রটি থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার একটি পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ঐ পূর্বাভাস অনুসারে বলা চলে যে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় নিম্নলিখিত জায়গাগুলোতে বৃষ্টিপাত বা বজ্রসহ ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে—অরুণাচল, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা ; পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং লাক্ষাদ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কিছু কিছু বৃষ্টি হতে পারে। আর বিক্ষিপ্তভাবে বর্ষা হবার সম্ভাবনা

দেখা যায় উড়িষ্যা, বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গনা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, এবং



চিত্র : 12·2

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল মোটামুটিভাবে শুকনো থাকবে।

সামরিক ইতিহাস

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সামরিক ইতিহাস

(Military History)

ইতিহাস পড়তে মানচিত্রের সাহায্য আবশ্যক হয়—তবে সে মানচিত্র নিশ্চয়ই বর্তমান যুগের মানচিত্র নয়, যে সময়ের ইতিহাস পড়া হচ্ছে সেই সময়ের মানচিত্র। অনেক সময় হয়ত আলোচ্য ঐতিহাসিক সময়ের সম-সাময়িক মানচিত্র পাওয়া যায়, কখনও কখনও অবশ্য পুরানো দিনের প্রামাণ্য মানচিত্র পাওয়া যায় না। যখন আলোচ্য কোন ঐতিহাসিক যুগের মানচিত্র পাওয়া যায় না, তখন অন্য কোন উপায় না পেয়ে বর্তমান কালের মানচিত্রকে ভিত্তি ধরা হয়। এবং আলোচ্য ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন বর্ণনার সাহায্যে বর্তমান কালের মানচিত্রটির প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে ঐ বিশেষ যুগটির একটি নক্সা দাঁড় করানো হয়। যত বেশী প্রমাণ, তথ্য এবং বর্ণনা পাওয়া যায় নক্সাটিকে তত বেশী নিখুঁত করা সম্ভব হয়।

সামরিক ইতিহাস পড়ার সময় কোন যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্যক বুঝতে হলে ঐ যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের নক্সার সাহায্য প্রয়োজন হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে বর্তমান যুগে প্রতিরক্ষাবাহিনীগুলোর প্রতিটি যুদ্ধ-কার্যের ব্যায়াম বাস্তব-ভূমিতে শুরু করার আগে বিশেষ একটি পদ্ধতিতে ঐ নির্দিষ্ট বাস্তব-ভূমির একটি 'প্রতিরূপ (model)' তৈরি করা হয়। ঐ প্রতিরূপটি গঠন করতে সচরাচর প্রচুর বালুর ব্যবহার করা হয় বলে সাধারণতঃ ঐ জাতীয় প্রতিরূপকে বলা হয় 'বালুকা প্রতিরূপ বা স্যাণ্ড্ মডেল (Sand Model)'।

গ্রিড্ রেখাযুক্ত মানচিত্র থেকে স্যাণ্ড্ মডেল তৈরি করা খুব কঠিন কাজ নয়। মানচিত্রের কোন একটি বিশেষ অংশকে অনেক বড় করে ঐ অংশের স্যাণ্ড্ মডেল তৈরি করা হয়। সাধারণতঃ "এক ইঞ্চি মানে এক মাইল" স্কেলের মানচিত্রে গ্রিড্ রেখাগুলোর সাহায্যে যে-সব ছোট ছোট বর্গক্ষেত্র তৈরী হয়, তাদের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য (বাস্তব জমিতে) 1000 গজ, কিন্তু মানচিত্রে তাদের দৈর্ঘ্য প্রায় আধা ইঞ্চি। এবার মানচিত্রের যে বিশেষ অংশটির স্যাণ্ড্ মডেল তৈরি করতে হবে মানচিত্র থেকে স্যাণ্ড্ মডেলে তাকে কি অনুপাতে বাড়ানো হবে সেটা আগে ঠিক করে নিতে হয়। যদি মান-

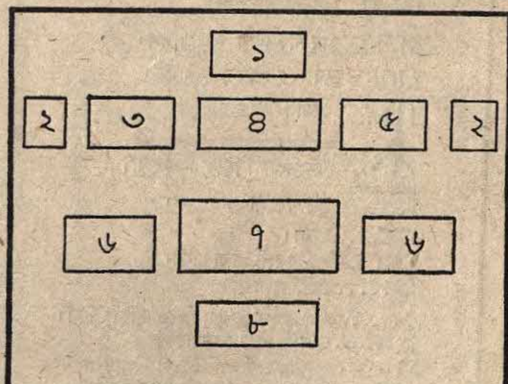
চিত্রের এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যকে স্যাণ্ড্ মডেলে দশ ইঞ্চি দেখানো হয়, তাহলে মানচিত্রের প্রতিটি ছোট বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য স্যাণ্ড্ মডেলটিতে দাঁড়াবে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। মানচিত্রের অংশবিশেষকে স্যাণ্ড্ মডেলে এইভাবে বর্দ্ধিত বা বিস্তারিত করে দেখাবার ফলে মানচিত্রের চাইতে স্যাণ্ড্ মডেলে জমির অনেক ছোটখাটো খুঁটিনাটি দেখানো সম্ভব হয়। মানচিত্রের থেকে স্যাণ্ড্ মডেলে 'বৃদ্ধি বা বিস্তৃতি (enlargement)' কি অনুপাতে করা হবে সেটা নির্ধারিত হয়ে গেলে, ঐ অনুপাতে প্রয়োজনীয় একটি আয়তক্ষেত্র বা বর্গ-ক্ষেত্র মাটিতে তৈরি করতে হয়। ঐ বিশেষ চতুর্ভুজটির বাহুগুলো সাধারণতঃ কাঠের মসৃণ তক্তা দিয়ে তৈরি করা হয়। কাঠের বাহুদ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রটির মধ্যে বালু ঢেলে জমি জাহির করা হয়। মানচিত্রের গ্রিড্ রেখাগুলোকে স্যাণ্ড্ মডেলে সাধারণতঃ পাটের রঙ্গিন সূতো দিয়ে দেখানো হয়। এইভাবে স্যাণ্ড্ মডেলের কাঠামো তৈরী হয়ে গেলে মানচিত্রে দেখানো পাহাড়, নদী, রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, বনজঙ্গল, প্রভৃতি প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম বস্তুগুলোর প্রতিরূপ যথাযথভাবে স্যাণ্ড্ মডেলে বসানো হয়। মানচিত্র সমতল বা দ্বিমাত্রিক, স্যাণ্ড্ মডেল কিন্তু বন্ধুর বা ত্রিমাত্রিক। তাই মানচিত্রে পাহাড় দেখাতে যখন 'সমোচ্চ রেখা (contour line)' ব্যবহার করতে হয়, স্যাণ্ড্ মডেলে বালু দিয়েই স্যাণ্ড্ মডেলের স্কেল অনুযায়ী ত্রিমাত্রিক পাহাড় তৈরি করতে হয়। তেমনি গাছ, নদী, ঝর্ণা, প্রভৃতি মানচিত্রে দেখানো হয় 'সাংকতিক চিহ্ন (conventional sign)' দিয়ে স্যাণ্ড্ মডেলে, কিন্তু তাদের প্রতিরূপ বসানো হয় পুতুল বা ঐ জাতীয় উপকরণ দিয়ে। মানচিত্র ধরে বার কয়েক স্যাণ্ড্ মডেল তৈরী অভ্যাস করলে ব্যাপারটা একটি আকর্ষক খেলার মত মনে হয়। যে অঞ্চলে কোন একটি বিশেষ যুদ্ধকার্য করতে হবে, সে-অঞ্চলের স্যাণ্ড্ মডেল তৈরি করাটা সাধারণ রীতি। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া প্রামাণ্য সংবাদের ভিত্তিতে ঐ স্যাণ্ড্ মডেলে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদের অবস্থিতি প্রয়োজনীয় পুতুলের সাহায্যে দেখাতে হয়। অন্যদিকে স্বপক্ষীয় সৈন্যদের অবস্থিতিও স্যাণ্ড্ মডেলে দেখানো হয়। তারপর করণীয় বিশেষ যুদ্ধকার্যটি করার জন্য বিভিন্ন পর্যায় এবং সম্ভাব্য কার্যক্রম ঠিক করে সেই মত স্ব-পক্ষীয় সৈন্যদের অবস্থিতি পুতুলের সাহায্যে দেখাতে হয়।

নিকট ভবিষ্যতে বা পরিকল্পিত পরিস্থিতিতে সৈন্য-সমাবেশ এবং সৈন্যদের

চলাচল কী হওয়া বাঞ্ছনীয় তা নির্ণয় করা যতটা কঠিন, তার চাইতে অনেক বেশী কষ্টকর অতীতে ঘটে যাওয়া কোন যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে যুদ্ধরত উভয়-পক্ষের সৈন্যসমাবেশ, ব্যূহ রচনা এবং সৈন্যপরিচালনার রূপরেখা স্থির করা। অথচ ঐতিহাসিক যুগে কোন একটি যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ কেন জয়ী হল আর পরাজিত পক্ষই বা কি কারণে হেরে গেল তা যথার্থ বুঝতে হলে সেই সময়কার যুদ্ধক্ষেত্রটির এবং তার প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর স্যাও্ মডেল তৈরি করা, এবং ঐ মডেলে যুদ্ধটির বর্ণনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উভয়পক্ষের সৈন্য-চলাচলের রূপরেখা তৈরি করা অপরিহার্য।

পানিপথের যুদ্ধ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে, বিশেষতঃ মধ্যযুগে, অনেক ছোটবড় যুদ্ধই হয়েছে পানিপথের প্রান্তরে ; এই সব যুদ্ধের অনেক-গুলোই মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ইতিহাসের ধারার। পানিপথ জায়গাটা কোথায়? সেখানে এত যুদ্ধ হলই বা কেন? দিল্লীর প্রায় 30 মাইল

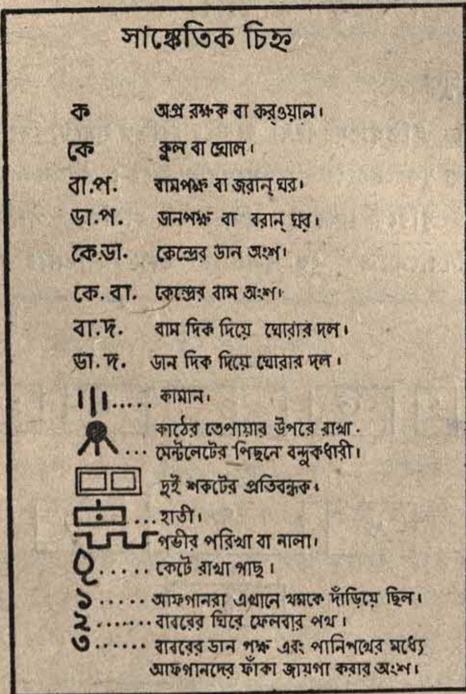


চিত্র : 13·1

মোগল সামরিকবাহিনী যে-ভাবে ব্যূহিত তার রেখাচিত্র

উত্তরে বা কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে কুরুক্ষেত্রর কাছে গ্র্যাণ্ড্ ট্রাংক রোডের কাছে অবস্থিত পানিপথ। মোটামুটিভাবে এই জায়গাটা সমতল এবং বিস্তৃত,

অথচ এইখানে এমন একটা উঁচু জাগয়া আছে যেটা আপন অধিকারে রাখতে পারলে বহুদুর পর্যন্ত বিপক্ষদলের সৈন্যদের গতিবিধির উপর নজর রাখা সম্ভব—মনে রাখা উচিত যে মধ্যযুগে উড়োজাহাজ বা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে দূরদূরান্তরের উপর নজরদারী রাখা সম্ভব ছিল না। পানিপথের কাছ দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত—অতএব পানিপথে সমবেত সৈন্যবাহিনীদের জলের অভাব হত না, অন্যদিকে প্রয়োজন হলে নদীপথে সৈন্যরা যাতায়াত করতে পারত। মধ্যযুগে ভারতীয় কোন নৃপতি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার

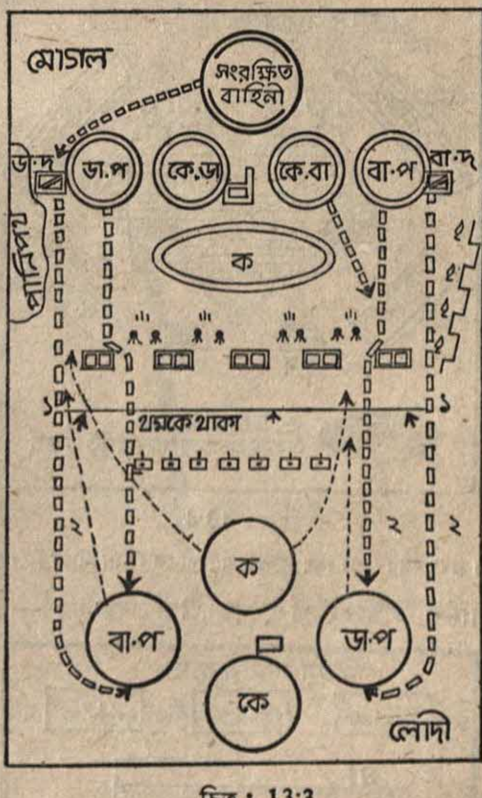


চিত্র : 13·2

এই গ্রন্থের যুদ্ধের নক্সাগুলোতে এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

জন্য পানিপথের থেকে উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে যেতে চাইতেন না, যদিও অধিকাংশ বিদেশী আক্রমণই আসত খাইবার গিরিপথ দিয়ে। তার সম্ভাব্য কারণ বোধকরি পাঞ্জাবের সমতলক্ষেত্র বিভক্ত ছিল পঞ্চনদ ও তাদের শাখা-প্রশাখা দিয়ে। নদ-নদী-নালা দিয়ে বিভক্ত পাঞ্জাবের সমতলক্ষেত্রে বিশাল

সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ঘটানো দুঃসাধ্য ছিল, মধ্যযুগে নদী অতিক্রম করে যুদ্ধকার্য করা অতীব কষ্টকর ছিল, এবং পাঞ্জাব কৃষিপ্রধান অঞ্চল হওয়ার ফলে ঐখানে জনবসতি ঘন—অর্থাৎ ঐখানে যুদ্ধ হলে একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হত অন্যদিকে তেমনি প্রচুর অসামরিক নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হত। সম্ভবতঃ এইসব কারণেই মধ্যযুগে সকল দিল্লীশ্বর পানিপথের প্রান্তরেই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতেন।



চিত্র : 13·3

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ : উভয় পক্ষের ব্যূহ এবং যুদ্ধের প্রথম ও মধ্যদশা।

পানিপথের যুদ্ধের স্যাণ্ড মডেল তৈরি করতে হলে এই ভৌগোলিক তথ্যগুলো কিছুটা সাহায্য করবে।

তারপর পানিপথে সংঘটিত বিখ্যাত যুদ্ধগুলোর স্যাণ্ড মডেল তৈরি করার সময় আরও খুঁটিনাটি ভৌগোলিক তথ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে অংশীদার

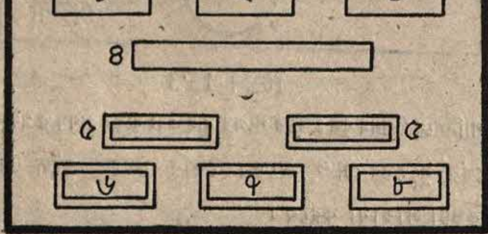
সৈন্যবাহিনীগুলোর অবস্থান, ব্যূহ, এবং যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে সৈন্যদলের গতিবিধি সম্পর্কে সকল সম্ভাব্য সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করতে হয়।



চিত্র : 13·4

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ : শেষ দশা; বাবরের বাহিনী লোদী-বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে।

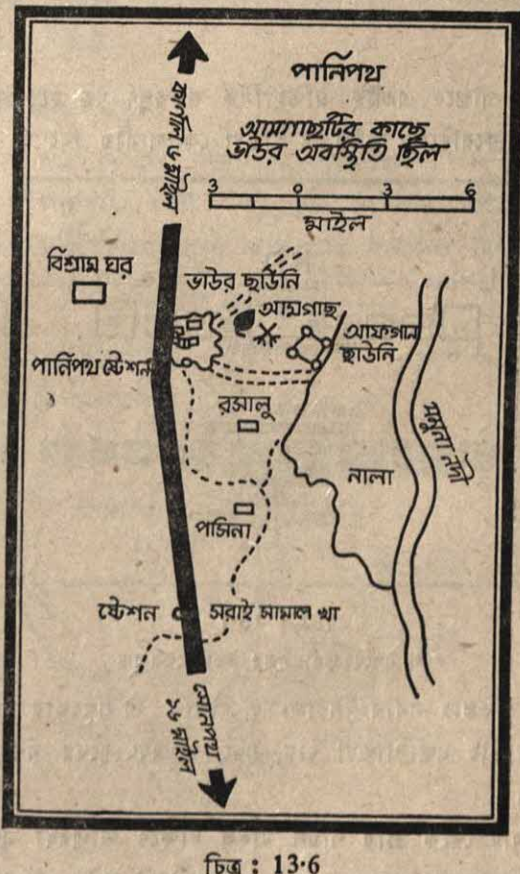
আহরিত তথ্যাদির ভিত্তিতেই স্থাণু মডেল তৈরি করা সম্ভব—এখানে স্মরণ



চিত্র : 13·5

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

রাখতে হবে যে একমাত্র তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ সম্বন্ধে কাশীরাজার বিবরণকে প্রত্যক্ষদর্শীর কিছুটা বিবরণ বলে গ্রাহ্য করা চলে। অন্য কোন যুদ্ধের কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি। অবশ্য যে-কোন



চিত্র : 13·6

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : উভয় পক্ষের ছাউনি

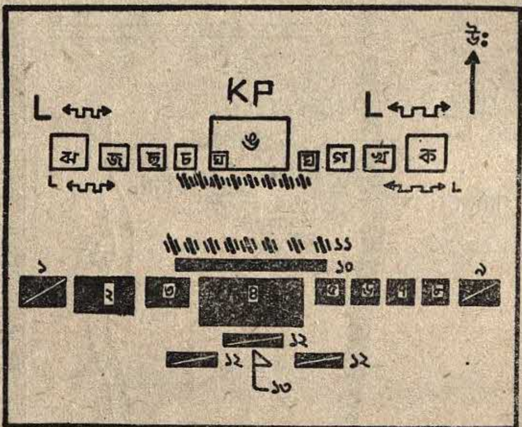
যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও একপেশে হতে বাধ্য, তাই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণকেও অন্যান্য সূত্র থেকে আহরিত তথ্যাদির আলোকে যাচাই করে নিতে হয়।

পানিপথের তিনটি যুদ্ধ (প্রথম : 1526 খ্রীষ্টাব্দ ; দ্বিতীয় : 1556 খ্রীষ্টাব্দ ; তৃতীয় : 1761 খ্রীষ্টাব্দ) সম্পর্কে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে যুদ্ধগুলোর বিভিন্ন

পর্যায় সম্বন্ধে যে-ধারণা করা সম্ভব হয়েছে তারই ভিত্তিতে সামরিক ঐতিহাসিকরা যেসব রূপরেখা তৈরি করতে পেরেছেন সেগুলোর ছবি দেওয়া হল। এই ছবিগুলোর সাহায্যে স্যাণ্ড্ মডেল তৈরি করা বিধেয়।

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীর প্রান্তরে একটিই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয়েছিল 1757 খ্রীষ্টাব্দে; যুদ্ধ করেছিলেন ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালা,



চিত্র : 13·7

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : উভয় পক্ষের ব্যূহ

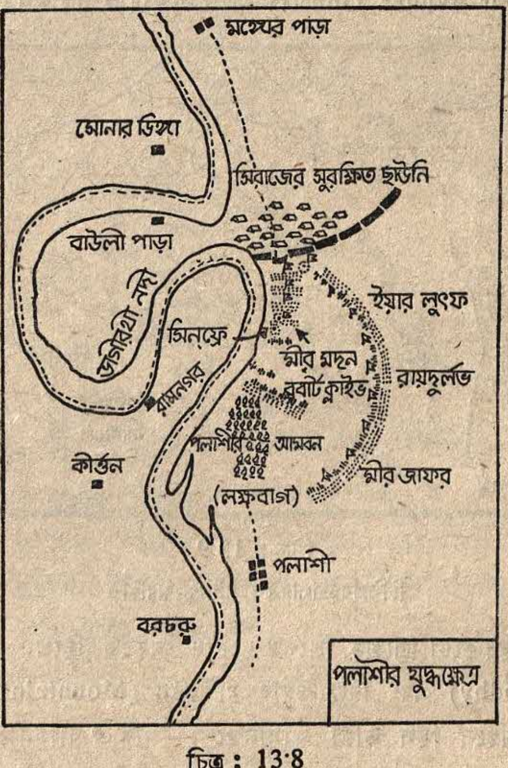
বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা। ঐ সময়কার মানচিত্র বা মানচিত্র জাতীয় নক্সা পাওয়া যায়, যুদ্ধক্ষেত্র এবং যুদ্ধের বর্ণনাও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর ধারে অবস্থিত ছিল পলাশীর প্রান্তর। সেই সময় ভাগীরথী নদীর গতিপথ যা ছিল আজকাল অবশ্য তা নেই, অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সিরাজ তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসেছিলেন কেননা ইংরেজরা আসছিলেন কলকাতা থেকে, তাঁদের কিছু সৈন্য অবশ্য এসেছিল চন্দননগর থেকে। তখন পলাশীর দক্ষিণ দিকে ছিল বিরাট এক আমবাগান, পশ্চিমে ভাগীরথী—পলাশীর প্রান্তরের পূর্ব এবং উত্তরদিকে ব্যূহিত হয়েছিল সিরাজের সৈন্যবাহিনী।

একদিনের ঐ যুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ক্রম সৈন্যবাহিনীদুটোর অবস্থিতির বা ব্যূহের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। যাই হোক আহরিত তথ্যাদির সাহায্যে তৈরী পলাশীর যুদ্ধের উভয় পক্ষের সৈন্য সন্নিবেশের ছবি নীচে দেওয়া হল (চিত্র 13·8)।

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ

ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের অনেকগুলো যুদ্ধ পর পর হয়—চিলিয়ান-ওয়ালার যুদ্ধ তাদের মধ্যে একটি। এই যুদ্ধটি হয় 1849 খ্রীষ্টাব্দের 13ই জানুয়ারী চিলিয়ানওয়ালার গ্রামের কাছাকাছি জায়গায়—ঝিলাম নদীর



চিত্র : 13·8

পলাশীর যুদ্ধ : উভয় পক্ষের ব্যূহ

প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে। শিখদের ব্যূহ তৈরী হয়েছিল একটি বাঁকা তলোয়ারের আকৃতিতে। এর বামবাহুটি ছিল উত্তরদিকে—বাহুর প্রান্ত

পৌঁছে গিয়েছিল রসুল নামক একটি পাহাড়ময় গ্রামে। শিখ বূ্যহের কেন্দ্র-স্থল ছিল ফাতশাহ্-কি-চাল (Fathshah-ke-chal) নামক গ্রামে, আর ডানবাহু ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণদিকে লাখনাওয়ালা গ্রামের খোলা প্রান্তর পর্যন্ত। শিখরা তাঁদের বূ্যহকে বেশ শক্তভাবে গড়ে তুলেছিলেন—তাঁদের বূ্যহের সম্মুখভাগের খোলা প্রান্তরে ছিল প্রচুর ঝোপঝাড়। শিখদের বূ্যহের ডানবাহুর বামপ্রান্ত এবং কেন্দ্রীয় অংশের ডানপ্রান্তের মাঝখানে বেশ কিছুটা জায়গা সুরক্ষিত ছিল না।

ইংরেজ বাহিনী বূ্যহিত হয়েছিল শিখ বূ্যহ থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। ইংরেজ বাহিনীর ডানবাহু গঠিত হয়েছিল স্যার ওয়াল্টার গিলবার্ট (Sir Walter Gilbert)-এর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন দিয়ে—ঐ

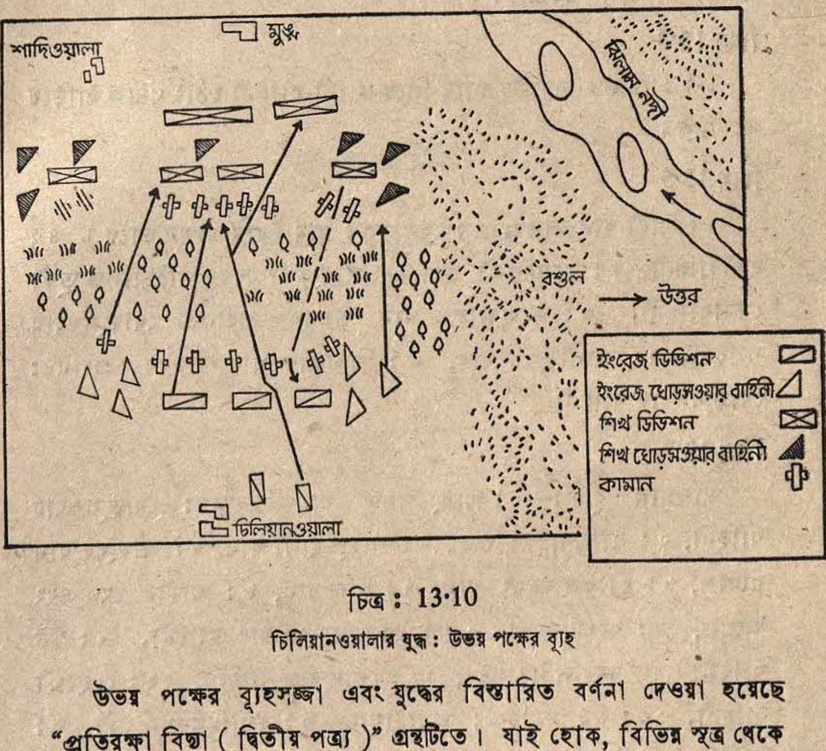


চিত্র : 13·9

চিলিয়ানওয়ালার ভৌগোলিক অবস্থিতি

ডিভিশনে ছিল দুটো ব্রিগ্রেড, ব্রিগেড দুটোর নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার গড্‌বি (Godby) এবং বিগ্রেডিয়ার মাউণ্টেন (Mountain)। ইংরেজ বূ্যহের কেন্দ্রস্থলে ছিল ভারী কামানগুলো—আর ঐ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন মেজর হর্সফোর্ড (Horsford)। জেনারেল কলিন ক্যাম্পবেল (Collin Campbell)-এর নেতৃত্বাধীন পদাতিক ডিভিশনটি তৈরী করেছিল ইংরেজ বূ্যহের বামবাহু—ঐ ডিভিশনে ছিল দুটো ব্রিগেড, ব্রিগেড-

গুলোর পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ব্রিগেডিয়ার পেনিসিক (Pennycuick) এবং ব্রিগেডিয়ার হোগান (Hoggan)-এর উপর। এই ডিভিশনটি ছাড়াও বামবাহুতে ছিল হোয়াইট (White) সাহেবের নেতৃত্বে এক ব্রিগেড ঘোড়সওয়ার এবং ওয়ার্নার (Warner) সাহেবের নেতৃত্বাধীন এক ব্যাটারি ঘোড়ায় টানা কামান।



চিত্র : 13·10

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ : উভয় পক্ষের ব্যূহ

উভয় পক্ষের ব্যূহসজ্জা এবং যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে "প্রতিরক্ষা বিদ্যা (দ্বিতীয় পত্র)" গ্রন্থটিতে। যাই হোক, বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরিত তথ্যের সাহায্যে তৈরী এই যুদ্ধের উভয় পক্ষের সৈন্য সন্নিবেশের নক্সা (চিত্র 13·10) দেওয়া হল।

এই পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত কয়েকটি চিত্রের বিস্তারিত সূচী

চিত্র 13·1

১ : কর্‌ওয়াল, ২ : দুই পাশের ঘোড়্‌সওয়ার বাহিনী, ৩ : জরান্‌ঘর, ৪ : হর্‌ওয়াল, ৫ : বরান্‌ঘর, ৬ : ইলংমিশ, ৭ : কুল বা ঘোল, ৮ : চন্দ্‌-ওয়াল, ৯ : প্রধান ছাউনী।

চিত্র 13·3

১-১ : চিহ্নিত রেখাটির কাছে গিয়ে লোদী-বাহিনী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

চিত্র 13·5

১ : শাদী খান কাকর, ২ : হেমু, ৩ : রামাইয়া (হেমুর ভাগ্নে), ৪ : হস্তীবাহিনী, ৫ : হুসেনকুলী বেগ এবং শাহ্‌কুলী মহরম পরিচালিত তুর্কী সেনাবাহিনী, ৬ : আব্দুল্লাহ্‌ খান উজবক—প্রধানত ঘোড়্‌সওয়ার বাহিনী, ৭ : আলীকুলী খান, ৮ : শিকান্দার খান উজবক—প্রধানতঃ ঘোড়্‌সওয়ার বাহিনী।

চিত্র 13·7

আফগান ব্যূহ :—১ : শাহ্‌ পসন্দ খান—প্রধানতঃ ঘোড়্‌সওয়ার বাহিনী, ২ : নাজিব, ৩ : শুজা, ৪ : শাহ্‌ওয়ালী খান, ৫ : আহ্‌মদ খান বাঙ্গাশ, ৬ : হাফিজ রহমৎ খান, ৭ : দুন্দি খান, ৮ : আমীর বেগ এবং অন্যান্য, ৯ : বরখুর্দার খান—প্রধানতঃ ঘোড়্‌সওয়ার বাহিনী, ১০ : উট বাহিনী এবং কাবুলি পদাতিক, ১১ : গোলন্দাজ বাহিনী, ১২ : দেহরক্ষী বাহিনী, ১৩ : সর্বাধিনায়ক ; মারাঠাব্যূহ—ক : ইব্রাহিম খান গর্দী, খ : দামাজি গাইকোয়াড, গ : শিবদেও প্যাটেল, ঘ : ছোট সেনানায়কের দল, ঙ : কেন্দ্র, চ : যশোবন্ত রাও পুআর, ছ : শমসের বাহাদুর, জ : মালহার রাও হোলকার, ঝ : জাঙ্কোজি সিন্ধিয়া, K : ভাউর অবস্থিতি, L : মারাঠা ব্যূহের পাশে 12 ফুট গভীর এবং 50 ফুট চওড়া পরিখা।

কয়েকটি
অস্ত্র ও অস্ত্রবাহক

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কয়েকটি অস্ত্র

(Some Weapons)

যুদ্ধ চিরকালই হয় অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে। প্রতিযুগেই মানুষ তার সমস্ত বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার প্রয়োগ করেছে অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে এবং নূতন নূতন হাতিয়ার উদ্ভাবন করতে। প্রাচীন যুগে অস্ত্র-শস্ত্র সহজ সরল ছিল, কাজেই সে-সব ব্যবহার করার সময় সৈনিকদের অস্ত্র-শস্ত্রের যান্ত্রিক ক্রিয়া-পদ্ধতি বা বিজ্ঞান জানার প্রয়োজন হতনা। আয়ুধবিজ্ঞান বা আয়ুধ-উৎপাদন কুশলতা অবশ্য কখনই সৈনিকদের শিক্ষাসূচীর মধ্যে পড়ে না, বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরাই এই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সৈনিকদের জানতে হয় অস্ত্র-শস্ত্রের কার্যক্ষমতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, এবং তার উপযুক্ত ব্যবহার ও ব্যবহার কৌশল। কাজেই উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যে-সব আয়ুধ তৈরী হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে সেগুলো সার্থকভাবে ব্যবহার করতে হলেও ঐ অস্ত্র-শস্ত্রগুলোর যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রতি সৈনিকের কিছুটা ধারণা এবং কুশলতা থাকা অপরিহার্য। প্রতিরক্ষা বিদ্যার ছাত্রদের জানা দরকার দুটোই, অর্থাৎ আয়ুধবিজ্ঞান এবং আয়ুধগুলোর যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি।

এ কথা বলা বাহুল্য যে সব অস্ত্র-শস্ত্রের কার্যকারিতা যেমন এক রকম নয়, তাদের যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতিও তেমনি ভিন্ন। অস্ত্রের যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতিকে যন্ত্রপাতির কলাকৌশল বা মেকানিজম (mechanism) বলে। যন্ত্রপাতির কলাকৌশল বলতে ঐ বিশেষ যন্ত্রটির প্রত্যেকটি কার্যকরী অংশের ক্রিয়াপদ্ধতি বোঝায়। কোন অস্ত্র থেকে গোলাগুলী যে-সব যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের সাহায্যে ছোঁড়া হয় ঐসব যন্ত্র বা যন্ত্রাংশগুলোর ধারাবাহিক কার্যপদ্ধতিকেই ঐ বিশেষ অস্ত্রটির যান্ত্রিক কলা-কৌশল বা মেকানিজম বলে।

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে বহু রকমের ছোট-বড় অস্ত্র প্রচলিত আছে। ভারতে প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোতে ব্যবহৃত অস্ত্রের বৈচিত্র্য কিছু কম নয়। তাছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের গবেষণার ফলে নূতন নূতন অস্ত্র সংযোজিত হয়েই চলেছে। প্রত্যেকটি অস্ত্রের যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র। এত রকমের অস্ত্রের যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি ত এখানে আলোচনা করা

সম্ভব নয়ই, এমনকি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী তিনটির প্রধান অস্ত্রগুলোর যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করতেও যথেষ্ট পরিসরের প্রয়োজন।

ভারতের স্থলবাহিনীতে সচরাচর যে-সব অস্ত্র সাধারণ সৈনিকরা ব্যবহার করে থাকেন তাদেরই কয়েকটির যান্ত্রিক কলাকৌশল এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হচ্ছে।

(1) ·303 রাইফেল

এই শ্রেণীর রাইফেলের সাধারণ বিবরণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ 'প্রতিরক্ষা বিদ্যা (দ্বিতীয় পত্র)' গ্রন্থটিতে দেওয়া আছে, তাই এখানে আর সেগুলোর পুনরায় উল্লেখ করা হল না।

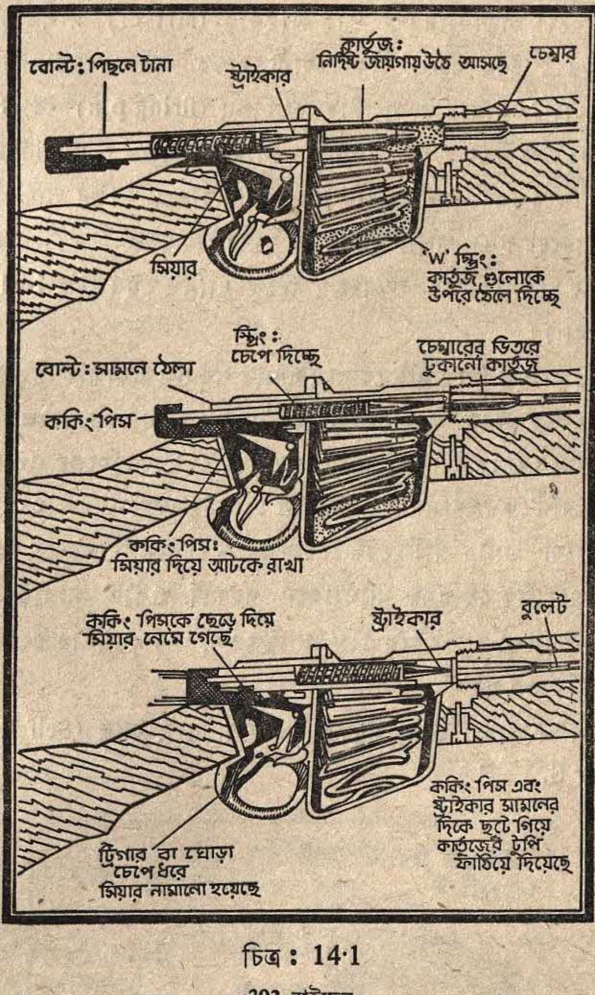
রাইফেলটির ম্যাগাজিনের মধ্যে দশটি কার্তুজ (cartridge) ভরে বোল্ট নবটিকে সামনের দিকে ঠেলে দিলে ব্যারেলের চেম্বারে গুলী ঢোকে না। সে অবস্থায় রাইফেলটির সেফটি ক্যাচ অংশটিকে পিছনের দিকে ঠেলে রাখলে রাইফেলটি 'সেফ্ (safe)' বা নির্বিঘ্ন বা নিরাপদ অবস্থায় থাকে—অর্থাৎ তখন রাইফেলটি থেকে গুলী বের হবে না।

গুলী ছোঁড়ার প্রথম পর্যায়ে সেফটি ক্যাচটিকে আগের (সম্মুখ) দিকে ঠেলে দিতে হয়। তারপর বোল্ট নব্ লীভারটিকে একটু উপরের দিকে ঠেলে বা চেপে রেখে পিছনের দিকে অর্থাৎ অস্ত্রব্যবহারকারীর নিজের দিকে টানতে হয়—তখন বোল্টটি পিছনের দিকে চলে আসে। বোল্টটি পিছনের দিকে চলে যাওয়া মাত্র ম্যাগাজিনের W-স্প্রীংয়ের চাপে একটি কার্তুজ উঁচু হয়ে বোল্টের সমতলে চেম্বারের প্রবেশপথে অবস্থিত হয় (চিত্র 14·1, উপরের ছবি দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বোল্টটিকে আগের দিকে ধাক্কা দিয়ে চেপে রেখে ঠেলে দিলে বোল্টের হেড্ পিসের সাহায্যে চেম্বারের প্রবেশপথে থাকা কার্তুজটিকে চেম্বার ভরে দেওয়া হয়। তখন বোল্টের স্প্রিং এবং ম্যাগাজিনের W-স্প্রিংটি সঙ্কুচিত হয়। আর ট্রিগারের সিয়ার (sear) বোল্টের ককিং পিসকে আটকে রাখে (চিত্র 14·1, মধ্যের ছবি দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় যখন অস্ত্রচালক তর্জনী দিয়ে ট্রিগারকে টিপে ধরেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ট্রিগার টেপার দুটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপে পৌঁছানো যায় ট্রিগারটিকে আলতোভাবে চাপ দিলেই। তখন ট্রিগারটি কিছুটা নড়লেও ট্রিগারের সিয়ার কিন্তু স্থানচ্যুত হবে না। ট্রিগারটিকে জোরে

চাপ দিয়েই ট্রিগার টেপার দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছতে হয়। এখানে খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে রাইফেল চালককে প্রথমে লক্ষ্যবস্তুর উপরে রাইফেলের নিশানা ঠিক করতে হয়। নিশানা ঠিক হলে ট্রিগারটিকে আলতো চাপ দিয়ে প্রথম



চিত্র : 14·1

·303 রাইফেল

ধাপে পৌঁছতে হয় এবং রাইফেলের নিশানা অনড় আছে কিনা যাচাই করতে হয়। নিশানায় রাইফেল অবিচলিত থাকলেই ট্রিগারে জোরে চাপ দিতে হয়—কোন অবস্থাতেই প্রথমবারেই ট্রিগারে জোরে চাপ দিতে নেই।

সে রকম করলে রাইফেলের নিশানা নড়ে যায় এবং স্বাভাবিক কারণেই গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

তর্জনী দিয়ে ট্রিগারে জোরে চাপ দিলে সিয়ার নীচে নেমে আসে, বোল্টটি হঠাৎ ছাড়া পায় এবং তার স্ট্রাইকার (striker) অংশটি ছুটে গিয়ে কার্তুজের পেছনে চেপে থাকা বোল্ট হেডের উপর সজোরে ধাক্কা মারে; তখন বোল্টের মাথায় থাকা ফায়ারিং পিন (firing pin) বোল্ট হেডের ছিদ্রপথের মধ্য দিয়ে গুলীর পিছনে ফালমিনেট ক্যাপে (Fulminate Cap) আঘাত করে এবং গুলীর দেহে চাপে রাখা বারুদে আগুন লাগে। তখন জ্বলন্ত বারুদের চাপে গুলীর সম্মুখভাগে থাকা ধাতব অংশটি সবেগে মাজ্‌লের মধ্য দিয়ে ছুটে বেড়িয়ে লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হয় (চিত্র 14·1, নীচের ছবি দ্রষ্টব্য)।

গুলী মাজ্‌ল্ দিয়ে ছুটে বেড়িয়ে যাবার পর শুরু করা যায় চতুর্থ পর্যায়। এই পর্যায় শুরু করেন অস্ত্রচালক রাইফেলের বোল্ট নব লীভারকে ধরে একটু উপরের দিকে চেপে রেখে পিছনের দিকে অর্থাৎ তাঁর নিজের দিকে টেনে নিয়ে। বোল্টকে পিছনের দিকে টানলে বোল্টের এক্সট্র্যাকটর (extractor)-এর সাহায্যে গুলীর খালি কেস চেম্বার থেকে পিছনে নিয়ে এসে বের করে দেয়; এবং ঠিক সে-সময় ম্যাগাজিনে পরবর্তী গুলীটি আবার বোল্টের সমতলে চেম্বারের প্রবেশপথে এসে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ দ্বিতীয় গুলী ছোঁড়ার প্রথম পর্যায় শুরু হয়।

(2) **সেলফ্‌ লোডিং রাইফেল বা এস. এল. আর** (Self Loading Rifle or S. L. R.)



চিত্র : 14·2

সেলফ্‌ লোডিং রাইফেল

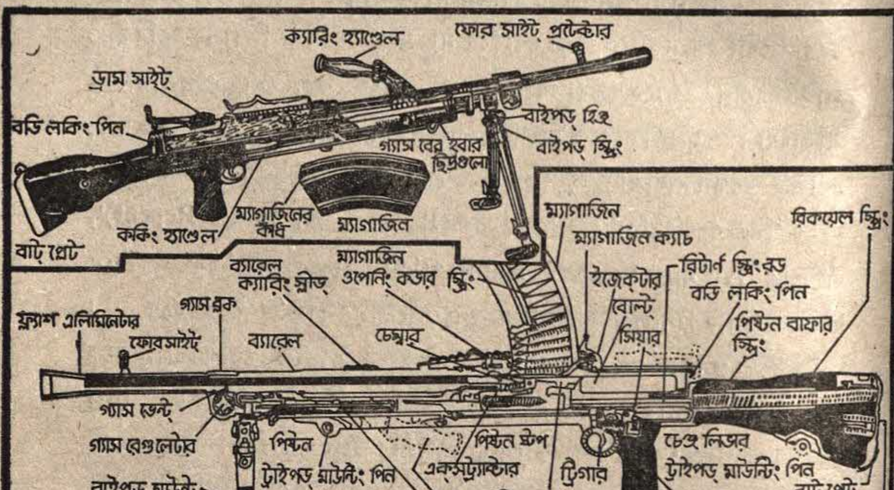
(3) লাইট মেশিনগান বা এল. এম. জি. (Light Machine Gun or L. M. G.)

লাইট মেশিনগানের সাধারণ বর্ণনা এবং তার বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নামগুলো 'প্রতিরক্ষা বিদ্যা (দ্বিতীয় পত্র)' গ্রন্থটিতে দেওয়া হয়েছে, তাই এখানে সে-সবের পুনরুল্লেখ করা হল না। এই অস্ত্রটি দিয়ে ·303 রাইফেলের মত একটি করে গুলী যেমন ছোঁড়া যায়, তেমনি শুধু ট্রিগার চেপে রেখে লাগাতার গুলী ছোঁড়াও যায়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা উচিত যে লাইট মেশিন গানের ম্যাগাজিনে 30টি কার্তুজ ভরা যায়, কিন্তু ম্যাগাজিনের স্প্রিংটির উপর কম চাপ দেবার জন্য সাধারণতঃ 24টি কার্তুজ ভরা হয়। কার্তুজসমেত ম্যাগাজিন লাইট মেশিন গানে লাগানো থাকা সত্ত্বেও যাতে দৈবাৎ মেশিনগান থেকে গুলী বেড়িয়ে না যায় সেরকম নিরাপদ ব্যবস্থাও লাইট মেশিন গানে করা যায়! এই সবই করা হয় চেঞ্জলীভারের সাহায্যে। চেঞ্জলীভারকে তিনটি বিভিন্ন অবস্থানে রাখার ব্যবস্থা আছে, প্রতিটি অবস্থানে রাখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সূচক চিহ্ন আছে যেমন—'এস (S)' মানে 'নিরাপদ (safe)' অবস্থান, 'আর (R)' মানে 'আবার কর (Repeat)', এবং 'এ (A)' মানে 'স্বয়ংক্রিয় (Automatic)'। চেঞ্জলীভার 'এস' অবস্থানে থাকলে ট্রিগার টিপলেও ম্যাগাজিন থেকে কোন কার্তুজ বের হবে না। আবার চেঞ্জলীভারকে 'আর (R)' অবস্থানে রাখলে মেশিন গানটিকে রাইফেলের মত বারবার কক্ করে একটি একটি করে গুলী ছুঁড়তে হয়, কিন্তু চেঞ্জলীভারটিকে 'এ (A)' অবস্থানে রেখে ট্রিগার টিপে ধরলে ম্যাগাজিন থেকে লাগাতার গুলী বের হতে থাকবে—অর্থাৎ আপনা থেকেই মেশিন গানটি কক্ হবে, পিষ্টন-ব্রীচ ব্লক গ্রুপের পথ পরিষ্কার হবে, ফায়ারিং পিন সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং আঘাত করে একটি গুলীকে মাজ্‌ল্‌ ত্যাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করবে, এবং পিষ্টন-ব্রীচব্লক গ্রুপ বিস্ফোরণের চাপে বা ধাক্কায় নিজেই পিছলে চলে আসবে, আর আসার সময় এক্‌স্‌ট্রাকটরের সাহায্যে কার্তুজের খালি কেসটিকে ইজেক্‌সান্‌ স্লটের মধ্য দিয়ে মেশিনগানটির বাইরে ফেলে দেবে।

লাইট মেশিন গানের এতগুলো কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাংশ মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পর্যায়ক্রমে যন্ত্রাংশগুলোর কাজকে সামগ্রিকভাবে লাইট মেশিন গানের যান্ত্রিক কাজ

বা কলাকৌশল বা মেকানিজম্ বলে। এই যান্ত্রিক কাজই এখানে আলোচিত হবে।

একটি লাইট মেশিন গানে গুলীভরা ম্যাগজিন লাগিয়ে ককিং হ্যাণ্ডেলকে পিছনদিকে শেষ পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দিলে গানটি লোড্ করা হয়েছে বলা হয়। ককিং হ্যাণ্ডেলটিকে পিছনে টানার সময় ভিতরের পিষ্টন-ব্রীচ-ব্লক গ্রুপটিও পিছন দিকে আসে, এবং তার বেণ্ট (Bent) নামক খাঁজটিতে সীয়ার (Sear) আটকে যায়। এই অবস্থায় গুলী ছোঁড়ার প্রয়োজন হলে চেঞ্জলীভারটিকে 'আর' বা 'এ' অবস্থানে এনে ট্রিগার টিপতে হয়। চেঞ্জলীভারের এই দুই ভিন্ন অবস্থায় লাইট মেশিন গানের যন্ত্রাংশগুলো বিভিন্নভাবে কাজ করে।



চিত্র : 14·3

লাইট মেশিন গান

চেঞ্জলীভারের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে লাইট মেশিন গানের যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি নীচে বর্ণিত হচ্ছে।

লাইট মেশিন গান বা ব্রেনগানের যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করার আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এই অস্ত্রের অংশগুলো কাজ করে দুটো শক্তির

সাহায্যে—(i) রিটার্নিং রড্-স্প্রিং-এর শক্তি, এবং (ii) কার্তুজের বারুদ ফেটে গেলে যে গ্যাসের সৃষ্টি হয় সেই গ্যাসের শক্তি। রিটার্নিং রড-স্প্রিং-এর শক্তির সাহায্যে ব্রেনগানের যন্ত্রাংশগুলো সম্মুখপানে চালিত হয়, আর গ্যাসের চাপে যন্ত্রাংশগুলো আবার পিছনে চলে আসে।

একটি ব্রেনগানের সম্পূর্ণ যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি নিম্নোক্ত চারটি ভাগে বর্ণনা করা হচ্ছে—(i) যন্ত্রাংশগুলোর আগে চলার পদ্ধতি, (ii) যন্ত্রাংশগুলোর পিছনে চলার পদ্ধতি, (iii) ট্রিগারের কার্যাবলী, এবং (iv) খালি হয়ে যাওয়া ম্যাগাজিনের তাৎপর্য।

(i) যন্ত্রাংশগুলোর আগে চলার পদ্ধতি

যে যন্ত্রাংশগুলো আগে চলার কাজে অংশগ্রহণ করে তাদের নাম—রিটার্নিং স্প্রিং, রিটার্নিং রড্, ফীড্ পিস্, বুলেট গাইড, পিষ্টন পোষ্ট, ফায়ারিং পিন হোল, ফায়ারিং পিন, এবং ম্যাগাজিনের সবচেয়ে উপরের কার্তুজ। লোড্ করা ব্রেনগানের চেঞ্জলীভারকে 'আর' বা 'এ' অবস্থানে এনে ট্রিগার টিপলে আগে চলার কাজ শুরু হয় [চেঞ্জলীভরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থিতিতে ট্রিগারের কাজের বিস্তারিত আলোচনা 'ট্রিগারের কার্যাবলী'-তে করা হয়েছে]। ট্রিগার টিপে ধরলে বেণ্টের খাঁজ থেকে সীয়ার ছাড়া পেয়ে নীচে নেমে আসে। তখন রিটার্নিং রড-স্প্রিং বা রিটার্নিং স্প্রিংটি দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে, তার ফলে রিটার্নিং রডটি সামনের দিকে যেতে থাকে। রিটার্নিং রডের ধাক্কায় ব্রীচব্লক গ্রুপ আগের দিকে চলতে থাকে, আর পথে ফীড্ পিসের সাহায্যে ম্যাগাজিনের সবচেয়ে উপরে থাকা কার্তুজটিকে চেম্বারের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। তখন 'বুলেট গাইড (Bullet guide)' অংশটি কার্তুজটিকে চেম্বারে ঢুকে যেতে সাহায্য করে। এই সময় এক্স্ট্রাকটরের দাঁতের মধ্যে কার্তুজের কেসের উন্নত বেড়ের কিনারা বা রিম (Rim) শক্তভাবে আটকে যায়।

কার্তুজটি চেম্বারের মধ্যে ঢুকে গেলেও কিন্তু পিষ্টনের এগিয়ে যাওয়া বন্ধ হয় না। পিষ্টন পোষ্টের মাথায় ব্রীচ ব্লক আলতোভাবে বসানো থাকে—তাই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে যাবার পরও যখন পিষ্টন এগিয়ে যেতে থাকে, অথচ ব্রীচ ব্লকের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায় তখন ব্রীচ ব্লকের পশ্চাৎভাগ উপরের দিকে উঠে যায় এবং ব্রেনগানের বডির খাঁজে আটকে থাকে। অন্য দিকে পিষ্টনটি এগিয়ে যেতে থাকে বলে পিষ্টন-পোষ্টটি ফায়ারিং পিনের

পিছন দিকে আঘাত করে, ফলে ফায়ারিং পিন হোলের ভিতর থেকে ফায়ারিং পিন বের হয়ে আসে এবং কার্তুজের পশ্চাৎভাগে আঘাত করে।

ফায়ারিং পিনের আঘাতে কার্তুজের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে এবং কার্তুজের ভিতরের বারুদ ফেটে যায়। বারুদের প্রজ্বলনের ধাক্কায় কার্তুজের মাথার দিককার ধাতব অংশটি প্রচণ্ডগতিতে মাজ্‌ল্ ত্যাগ করে সামনের লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে যায়। বারুদ ফাটার সময় উচ্চ চাপে থাকা বেশকিছু পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি হয়।

গ্যাস স্বভাবতঃই প্রসারণ ধর্মী—তার ফলে গ্যাস সবদিকে চাপ দিতে থাকে। কিছুটা গ্যাস ব্যারেলের রাস্তা ধরে গুলীর পিছে পিছে বেড়িয়ে যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, ব্রেনগানের যন্ত্রাংশগুলোর চলাচলে গ্যাসের শক্তির প্রয়োজন হয়—কাজেই সমস্ত গ্যাস যেন মাজ্‌ল্ দিয়ে বেড়িয়ে না যায় সেইজন্য গ্যাস রেগুলেটারের ছিদ্রপথগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যদি গ্যাস রেগুলেটারের বড় ছিদ্রপথগুলো দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাহলে অধিকাংশ গ্যাসই বেরিয়ে যাবে এবং ব্রেনগানের যন্ত্রাংশগুলোকে চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে গ্যাস অস্ত্রটির মধ্যে থাকবে না, অপর পক্ষে যদি গ্যাস রেগুলেটারের সবচেয়ে ছোট ছিদ্রপথগুলো দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করা হয় তাহলে এত বেশী গ্যাস ব্রেনগানের মধ্যে থেকে যাবে তার চাপে ব্রেনগানের যন্ত্রাংশগুলোর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এই সব কারণে গ্যাস রেগুলেটারের মাঝারি আকারের ছিদ্রপত্র দিয়ে যেন গ্যাস বের হয়ে যেতে পারে সেইরকমভাবে গ্যাস রেগুলেটারকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করতে হয়।

গ্যাসের শক্তির সাহায্যে ব্রেনগানের যন্ত্রাংশগুলো পিছনের দিকে চলতে শুরু করে।

(ii) যন্ত্রাংশগুলোর পিছনে চলার পদ্ধতি

পিছনে চলার কাজে ব্রেনগানের যে-সব যন্ত্রাংশ সক্রিয় হয় তাদের নাম—গ্যাস ভেণ্ট, গ্যাস রেগুলেটার, গ্যাস প্যাসেজ, গ্যাস সিলিণ্ডার, পিষ্টন হেড, রিটার্নিং রড, রিটার্নিং রড্-স্প্রিং, এক্স্‌ট্র্যাকটর ইজেক্টার, ইজেক্টার ওয়ে (ejector way) বা ইজেক্টার পথ, ইজেক্টার স্লট (ejector slot) বা ইজেক্টার ছিদ্র, বাফার (buffer), এবং গুলীর খালি কেস।

গ্যাসের কিছু অংশ মাজ্‌ল্ দিয়ে বের হয়ে যায়, কিন্তু বেশীর ভাগ অংশ

যথাক্রমে গ্যাস ভেণ্ট, গ্যাস রেগুলেটার, গ্যাস প্যাসেজ বা গ্যাস এসকেপ রন্ধ্রগুলোর মধ্য দিয়ে এসে পিষ্টন হেডের উপর ধাক্কা মারে। তার ফলে পিষ্টন পিছনের দিকে চলতে শুরু করে—সাথে সাথে ব্রীচ-ব্লক গ্রুপও ব্রেনগানের বডির খাঁজ থেকে মুক্ত হয়ে পিষ্টনের সঙ্গে পিছনদিকে যেতে থাকে। তখন এক্স্ট্রাকটারের সাহায্যে কার্তুজের খালি কেসটিও পিছনে আসতে থাকে। খালি কেসটি পিছনের দিকে আসতে আসতে এক সময় ইজেকটার ওয়েতে এসে ধাক্কা খায়, তখন এক্স্ট্রাকটারের কামড় থেকে মুক্ত হয়ে খালি কেসটি ইজেক্টার স্লট দিয়ে ব্রেনগানের ভিতর থেকে বের হয়ে যায়।

গ্যাসের চাপের ফলে যখন পিষ্টন-ব্রীচব্লক গ্রুপ পিছনে যেতে বাধ্য হয়, তখন তাদের চাপে রিটার্নিং রড্ এবং রিটার্নিং রড্-স্প্রিংও সঙ্কুচিত হতে থাকে। যতক্ষণ না পিষ্টন পিছে এসে বাফারের সঙ্গে ধাক্কা খায় ততক্ষণ তার পশ্চাৎগমন চলতেই থাকে। পিষ্টন যখন সম্পূর্ণ পিছনে চলে আসে তখন রিটার্নিং রড্-স্প্রিংটি পুরোপুরি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় ব্রেনগানের যন্ত্রাংশগুলোর পিছনে যাওয়ার পর্ব শেষ হয়।

(iii) ট্রিগারের কার্যাবলী

ট্রিগারের কার্যধারা নির্ভর করে চেঞ্জলীভারের অবস্থানের উপর—অর্থাৎ চেঞ্জলীভার যদি 'আর' অবস্থানে থাকে ত ট্রিগারের কার্যপ্রণালী একরকম হবে, আবার 'এ' অবস্থানে চেঞ্জলীভার থাকলে ট্রিগারের কাজ হবে অন্য ধারায়। আর চেঞ্জলীভারটি যদি 'এস' অবস্থানে থাকে ত ট্রিগারের কার্যধারা হবে আরেক রকমের।

যাইহোক, ট্রিরারের কার্যাবলীতে যে-সব যন্ত্রাংশ সক্রিয় হয় তাদের নাম —চেঞ্জলীভার, চেঞ্জলীভার স্পিণ্ড্ল্ (Change Lever Spindle), রাউণ্ড সারফেস (Round surface), শ্যালো বেভেল্ (Shallow Bevel) বা অগভীর মাটাম, ডীপ বেভেল (Deep Bevel) বা গভীর মাটাম, সীয়ার, সীয়ার স্প্রিং, সীয়ার স্প্রিং সীট (Sear spring seat), সীয়ার উইনডো, ট্রিপিং লীভার (Tripping Lever), ট্রিপিং লীভার হেড, ট্রিপিং লীভার টেল, ট্রিপিং লীভার প্লাঞ্জার, ট্রিগার, পিষ্টন বেণ্ট, এবং পিষ্টনের নীচু অংশ।

(ক) চেঞ্জলীভার যখন 'এ' অবস্থানে থাকে তখন ট্রিগারের কার্যধারা : যখন চেঞ্জলীভার 'এ' অবস্থানে থাকে তখন স্পিণ্ড্লের রাউণ্ড

সারকেস ট্রিপিং লীভারের উপর চড়ে বসে, যার ফলে অন্যান্য অবস্থানের তুলনায় ট্রিপিং লীভার অনেক নীচে চলে যায় এবং ট্রিপিং লীভার টেলটি সীয়ার উইনডোর নীচের অংশের সাথে লেগে যায়। এই অবস্থায় ট্রিগার টিপলে ট্রিপিং লীভার টেলটি সীয়ার উইনডোর নীচের কিনারার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাকে পিছনের দিকে টানতে থাকে—তার ফলে সীয়ার হেড এবং ট্রিপিং লীভার হেড নীচে চলে যায়। পিষ্টন বেণ্ট তখন সীয়ার থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে চলাচল করার যন্ত্রাংশগুলোর পথের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না—ফলে পিষ্টন-ব্রীচ-ব্লক গ্রুপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগে-পিছে চলতে পারে এবং অনবরত গুলী ছোঁড়া হতে থাকে—অবশ্য যতক্ষণ ম্যাগাজিনে গুলী থাকে এবং ট্রিগার টিপে রাখা হয়। ট্রিগার ছেড়ে দিলে কিন্তু সীয়ার উপরে উঠে আসে আর পিষ্টন বেণ্ট তাতে আটকে যায় ফলে পিষ্টন-ব্রীচ-ব্লক আর আগে যেতে পারে না।

(খ) **চেঞ্জলীভার যখন 'আর' অবস্থানে থাকে তখন ট্রিগারের কার্যধারা :** চেঞ্জলীভার যখন 'আর' অবস্থানে থাকে তখন স্পিণ্ডলের ডীপ বেভেল বা গভীর মাটাম্‌টি থাকে ট্রিপিং লীভারের উপরে। এই অবস্থায় অবশ্য ট্রিপিং লীভারের উপর কোন চাপ থাকে না। তার ফলে ট্রিপিং লীভার টেল (tail)-টি সীয়ার উইনডোর উপরের দিককার অংশের সঙ্গে লেগে যায়, আর ট্রিপিং লীভার হেডটি অনেক উঁচুতে উঠে থাকে। যখন ট্রিগার টিপে ধরা হয় তখন ট্রিপিং লীভার টেলটা সীয়ার উইনডোর উপরের কিনারার সঙ্গে লেগে যায় এবং ওটাকে পিছনের দিকে টানতে থাকে—তার ফলে সীয়ার নীচে চলে যায় কিন্তু ট্রিপিং লীভার হেডটি উপরেই থেকে যায়। পিষ্টন বেণ্ট সীয়ার থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং পিষ্টন-ব্রীচ-ব্লক গ্রুপ আগের দিকে চলতে শুরু করে। আগে যাবার সময় পিষ্টনের নীচের দিককার অংশ ট্রিপিং লীভার হেডকে নীচের দিকে চেপে দেয়, যার ফলে ট্রিপিং লীভার টেল এবং সীয়ার উইণ্ডোর উপরদিককার কিনারার সংযোগ খুলে যায় এবং সীয়ার তার নিজস্ব স্প্রিং-এর জোরে উপরে উঠে যায়। পিষ্টন-ব্রীচ-ব্লক গ্রুপ আবার যখন পিছনে চলে আসে [গ্যাসের ধাক্কা খেয়ে] তখন পিষ্টন বেণ্ট আবার সীয়ারে আটকে যায় এবং আরেকবার ট্রিগার টিপে না ধরা পর্যন্ত আগে যেতে পারে না। ট্রিগারের উপর থেকে চাপ সরিয়ে নিলে আবার ট্রিপিং লীভার টেল ও সীয়ার উইনডোর

উপরের কিনারার সংযোগ হয়ে যায়। তাই প্রতিবার একটি করে গুলী ছোঁড়ার পর ট্রিগার থেকে আঙ্গুল সরিয়ে ট্রিগারকে চাপমুক্ত করতে হয়।

(গ) **চেঞ্জলীভার যখন 'এস' অবস্থানে থাকে:** চেঞ্জলীভারকে 'এস্' অবস্থানে আনলে স্পিণ্ডলের শ্যালো বেভেল বা অগভীর মাটামুটি ট্রিপিং লীভারের উপরে উঠে যায় এবং কিছুটা নীচের দিকে চাপ দেয়, তার ফলে ট্রিপিং লীভার টেলটি সীয়ার উইনডোর কেন্দ্রবিন্দুতে এসে যায় এবং উপর বা নীচের অংশের সঙ্গে কোন সংযোগ হয় না। এই অবস্থায় ট্রিগার টিপলে ট্রিপিং লীভার টেলটি সীয়ার উইনডোর বাইরে চলে আসে, কিন্তু সীয়ারের অবস্থিতির কোন তারতম্য ঘটে না; তাই পিষ্টন-ব্রীচ-ব্লক গ্রুপও আগে যেতে পারে না—ফলে এই অবস্থায় ট্রিগার টিপলেও গুলী বের হয় না।

উপরে বর্ণিত ট্রিগারের কার্যধারা থেকে একটি কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ট্রিগারকে টিপে রেখে চেঞ্জলীভারকে 'আর' অবস্থান থেকে 'এ' অবস্থানে নেওয়া সঙ্গত নয়। চেঞ্জলীভারকে 'এস্' অবস্থানে রেখে ট্রিগার টীপলে ট্রিপিং লীভার টেলটি সীয়ার উইনডো থেকে আলগা হয়ে যায়। এখন ট্রিগার টিপে রেখে চেঞ্জলীভারকে 'এ' অবস্থানে নিয়ে গেলে ট্রিপিং লীভার নীচে চলে যায়, কিন্তু সীয়ার উইণ্ডোর বাইরেই থেকে যায় এবং সীয়ার উইনডোর নীচের কিনারার সঙ্গে ট্রিপিং লীভারের কোন সংযোগ হয় না। ঐ অবস্থায় ট্রিগার টিপলেও যন্ত্রাংশগুলোর অবস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় না এবং ব্রেনগান থেকে কোন গুলীও বের হয় না। ঠিক একই কারণে ট্রিগারকে টিপে ধরে চেঞ্জলীভারকে 'আর' অবস্থান থেকে 'এ' অবস্থানে নিয়ে গেলে ব্রেনগান থেকে কোন গুলী ছোঁড়া যায় না। তাই চেঞ্জলীভারকে 'আর' অবস্থান থেকে 'এ' অবস্থানে নিয়ে যেতে হলে প্রথমেই ট্রিগার থেকে আঙ্গুল সরিয়ে নিতে হয়, অর্থাৎ ট্রিগারকে চাপমুক্ত করতে হয়। তারপর চেঞ্জলীভারকে আনতে হয় 'এস্' অবস্থানে, অবশেষে সেখান থেকে চেঞ্জলীভারকে নিয়ে যেতে হয় 'এ' অবস্থানে।

(iv) খালি ম্যাগাজিনের তাৎপর্য

ব্রেনগান থেকে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক সময় গুলীভরা ম্যাগাজিনটি গুলীশূন্য হয়ে যায়। এই খালি হয়ে যাওয়া ম্যাগাজিনটি কিন্তু ব্রেনগানের যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব বিস্তারের কাজে অংশগ্রহণ করে প্রোজেকশন, ফীড্ পিস, এবং ব্রীচব্লকের উপরের

দিকের অংশ।

ম্যাগাজিনে কার্তুজ ভরা থাকলে ম্যাগাজিনের প্রোজেকশনটি ম্যাগাজিনের ভিতরেই ঢুকে থাকে, কিন্তু খালি হয়ে যাওয়া ম্যাগাজিনে এই অংশটি বাইরে বের হয়ে আসে। তাই ব্রেনগান দিয়ে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে যখন ম্যাগাজিন খালি হয়ে যায় তখন ফীড্ পিসটি ম্যাগাজিনের ঐ বের হয়ে থাকা প্রোজেকশনে ঠোক্কর খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ব্রেনগান থেকে খালি ম্যাগাজিনটিকে সরিয়ে নিয়ে ট্রিগার না টিপলে পিষ্টন-ব্রীচ ব্লক গ্রুপ একটু এগিয়ে যাবে এবং সীয়ারের সঙ্গে পিষ্টন বেল্টের সংযোগ হলে আবার থেমে যাবে। এখন কার্তুজভরা ম্যাগাজিন ব্রেনগানে জুড়ে ট্রিগার টিপলে ব্রেনগান থেকে গুলী বের হবে।

ফীড্ পিসের কাজ ঃ যখন পিষ্টন-ব্রীচ ব্লক গ্রুপ আগে যেতে থাকে তখন ম্যাগাজিনের সবচেয়ে উপরে থাকা কার্তুজটি ব্রীচ ব্লকের উপরের অংশের চাপে নীচে ডাবানো থাকে। কিন্তু যখন পিষ্টন-ব্রীচব্লক গ্রুপ পিছনে চলে যায় এবং খালি হয়ে যাওয়া কার্তুজের কেসটি নীচে পড়ে যায় তখন ম্যাগাজিনে ভরা কার্তুজের উপর থেকে ব্রীচব্লকের চাপ চলে যায়। আর তখন ম্যাগাজিনের স্প্রিং-এর চাপে ম্যাগাজিনের সবচেয়ে উপরের কার্তুজটি ফীড্ পিসের সামনে আসে, আর সময়মত ফীড্ পিস ঐ কার্তুজটিকে চেম্বারে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

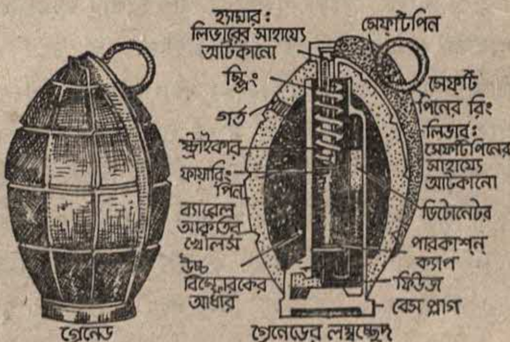
(4) 36নং এইচ. ই. গ্রেনেড বা হাতবোমা (No. 36 H. E. Grenade)

হাতবোমা বা গ্রেনেড দেখতে একটি বড়সড় ডিমের মত। এর খোলটি তৈরী হয় ষ্টিল দিয়ে। খোলের বাইরে একটি জায়গায় কাঁধের মত উঁচু জায়গা আছে—তার নাম 'শোল্ডার (Shoulder)'। শোল্ডারের মুখের কাছে গ্রেনেডের খোলটি সামান্য চাপা। খোলের পাদদেশে ষ্টিলের একটি বৃত্তাকার চাকতি থাকে—তার নাম 'বেস প্লাগ (Base Plug)'। বেস প্লাগটিকে বামাবর্তে ঘুরিয়ে গ্রেনেডের দেহ থেকে আলাদা করা যায়। শোল্ডারের কাছাকাছি খোলের একটি জায়গায় একটি ছিদ্রপথ আছে। ঐ ছিদ্রপথটি দিয়ে খোলের ভিতর উচ্চবিস্ফোরক বারুদ ভরা হয়; আর ছিদ্র পথটিকে বন্ধ করা হয় একটি বিরাট স্ক্রু দিয়ে।

শোল্ডারের ভিতরে ষ্টিলের একটি লীভার ঢোকানো থাকে। লীভারটির

নাম 'সেফ্‌টি লীভার (Safety Lever)'। সেফ্‌টি লীভারটিকে জায়গামত আটকে রাখা হয় একটি পিনের সাহায্যে—ঐ পিনটির নাম 'সেফ্‌টি পিন (Safety Pin)'। সেফ্‌টি পিনটির একপ্রান্তে একটি বড় রিং থাকে—তাকে বলা হয় সেফ্‌টি পিনের রিং (ring of safety pin)।

গ্রেনেডের খোলের অভ্যন্তরে অক্ষের বরাবর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একটি লম্বা ছিদ্রপথ আছে—তার নাম 'সেণ্ট্রাল স্লীভ্ (Central Sleeve) বা লং



চিত্র : 14·4

36নং এইচ. ই. গ্রেনেড

স্লীভ্ (Long Sleeve) বা কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথ'। ঐ কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথের মধ্যে একটি লোহার শলা থাকে। শলাটির নাম 'ষ্ট্রাইকার (striker)'। ষ্ট্রাইকারের নীচের দিকটি ছুঁচলো, আর উপরের দিকে এক পাশে একটি খাঁজ কাটা থাকে। সেফ্‌টি লিভারের একটি প্রান্ত এই খাঁজে আটকে অপর প্রান্তে চাপ দিয়ে বোমার খোলের সঙ্গে চেপে রাখলে ষ্ট্রাইকারটির উপরের প্রান্ত কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথের কিছুটা উপরের দিকে উঠে আসে। এই অবস্থায় ধরে থেকে সেফ্‌টি পিনটি যথাস্থানে আটকে বোমাটিকে নিজ স্বাতন্ত্রে রেখে দিলে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় না। ষ্ট্রাইকারের ছুঁচলো প্রান্তে থাকে 'ফায়ারিং পিন (Firing Pin)'। ষ্ট্রাইকারের সঙ্গে একটি স্প্রিং জড়ানো থাকে—তাকে বলা হয় "ষ্ট্রাইকার স্প্রিং (Striker Spring)'। কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথের পাশে আরেকটি ছিদ্রপথ থাকে—তার নাম 'ডিটোনেটর স্লীভ্ (Detonator Sleeve)'। এই ছিদ্রপথে 'ইগ্নাইটার (Ignitor) বা প্রজ্বালক' থাকে। ইগ্নাইটারের একটি প্রান্তে থাকে একটি '·22 পারকাশন্ ক্যাপ (·22 per-

cussion cap)',—এই ক্যাপটি ঢোকানো থাকে কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথের নীচের অংশে। ইগ্নাইটারে একটি 'ফিউজ (Fuse)' এবং একটি 'ডিটোনেটর (Detonator)' থাকে। এই ডিটোনেটর অংশটি ঢোকানো থাকে ডিটোনেটর স্লীভের মধ্যে উপর দিকের অপর প্রান্তে বোমার ভেতরে প্রায় মাঝ বরাবর। ফিউজের একপ্রান্ত থাকে ডিটোনেটরে, এবং অপর প্রান্তটি সংযুক্ত থাকে পারকাশন্ ক্যাপের সঙ্গে।

এতক্ষণ ত গ্রেনেডের দেহের ভিতরের অংশগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল—গ্রেনেডের সাধারণ বর্ণনা এবং কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য 'প্রতিরক্ষা বিদ্যা (দ্বিতীয় পত্র)' গ্রন্থটিতে দেওয়া আছে। গ্রেনেডের যন্ত্রাংশগুলো কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ কিভাবে একটি গ্রেনেড ফাটে তা নীচে বলা হচ্ছে।

সাধারণ অবস্থায় ষ্ট্রাইকারের খাঁজে সেফ্‌টি লীভারের একটি প্রান্ত ঢুকিয়ে ষ্ট্রাইকারটিকে উপরের দিকে টেনে তুলে সেফ্‌টি পিনের সাহায্যে লীভারটিকে জায়গামত আটকে রাখা হয়। তখন কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথে ষ্ট্রাইকারটি ঝুলে থাকে পূর্ণপ্রসারিত ষ্ট্রাইকার স্প্রিং-এর নিম্নাভিমুখী টানের সম্পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে।

সেফ্‌টি পিনটি খুলে গ্রেনেডটি ছুঁড়লে ষ্ট্রাইকার স্প্রিং-এর দ্রুত সংকোচন শুরু হয়। আর স্প্রিং-এর টানের প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্রাইকারটিও কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথের নীচের দিকে ছুটে যায়। ষ্টাইকারের এই চলনের ফলে লীভারটিতে টান পড়ে এবং সেফ্‌টি পিনের বাঁধন ছাড়া সেফ্‌টি লীভারটি ছিটকে পড়ে যায়।

ষ্ট্রাইকারটি কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথের নীচের দিকে ছুটে গেলে ষ্ট্রাইকারে থাকা ফায়ারিং পিনটি ইগ্নাইটারের ·22 পারকাশন্ ক্যাপটিকে সজোরে আঘাত করে। ঐ আঘাতের ফলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে।

ঐ স্ফুলিঙ্গের আগুন ফিউজের সংলগ্ন প্রান্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই আগুন প্রলম্বিত ফিউজের গা বেয়ে ছড়াতে ছড়াতে এক সময় অপর প্রান্তের ডিটোনেটারে আগুন ধরিয়ে দেয়, ফলে ডিটোনেটর বিস্ফোরিত হয়ে বোমার ভিতরে উপযুক্ত চাপে রাখা উচ্চবিস্ফোরকের সর্বত্র প্রায় একই সময়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই প্রজ্বলনে উৎপন্ন উচ্চমাত্রার তাপ ও চাপের প্রভাবে বোমাটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে যায়। প্রসঙ্গতঃ জানা উচিত যে গ্রেনেডে দুই রকমের ফিউজ ব্যবহার করা হয়। এক শ্রেণীর ফিউজকে

বলা হয় '4-সেকেণ্ড ফিউজ'—এই ফিউজের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে 4 সেকেণ্ড, অর্থাৎ সেই রকম উপযুক্ত দৈর্ঘ্য থাকে ফিউজটির। যে-সব গ্রেনেড হাত দিয়ে ছোঁড়া হয় সেগুলোতে এই 4-সেকেণ্ড ফিউজ ব্যবহার করা হয়। রাইফেল দিয়ে যখন গ্রেনেড ছোঁড়া হয় তখন গ্রেনেডে ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় প্রকৃতির ফিউজ যার প্রজ্বলন সময় 7 সেকেণ্ড—এই প্রকৃতির ফিউজকে বলা হয় '7-সেকেণ্ড ফিউজ'। স্বভাবতঃই 7-সেকেণ্ড ফিউজের দৈর্ঘ্য 4-সেকেণ্ড ফিউজের দৈর্ঘ্য থেকে বড়।

গ্রেনেডের ধাতব খোলটি বাইরের গা বরাবর খাঁজ কেটে 48টি বর্গাকার ক্ষেত্রে ভাগ করা থাকে। খাঁজের জায়গাগুলোতে ধাতব খোলটির পাত অপেক্ষাকৃত পাতলা ও দুর্বল থাকে—ফলে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড চাপে ধাতব খোলটি সাধারণতঃ ঐ খাঁজ বরাবর 48টি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে প্রচণ্ড বেগে চতুর্দিকে ছুটে যায় এবং অদূরবর্তী যে-কোন জীবকে আঘাত হানে এবং ধ্বংস করে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কয়েকটি অস্ত্রবাহক

(Some Weapon-carriers)

যুদ্ধ যখন শুধুই সন্নিকটবর্তী যুদ্ধ ছিল, অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি ছিল সীমিত এবং ছোট, তখন শুধু সৈনিকরাই অস্ত্র-শস্ত্র বহন করতেন; অবশ্য যাঁরা রথে বা হাতীতে চড়ে যুদ্ধ করতেন তাঁরা ঐসব বাহনে কিছু অতিরিক্ত অস্ত্র-শস্ত্রও রাখতেন। সেইদিক থেকে বিচার করলে রথকে ভারতের প্রথম অস্ত্রবাহক বলা যেতে পারে। মহাভারতের যুগ থেকে অবশ্য কেবলমাত্র অস্ত্র-শস্ত্র বহন করবার জন্যই বলদে টানা গাড়ীর ব্যবহার সম্বন্ধে জানা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দূরপাল্লার সব হাতিয়ার তৈরী হতে লাগল। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধিও বড় হতে লাগল। তখন থেকেই অস্ত্রবাহক গাড়ীর প্রাধান্য বেড়ে গেল।

অন্যদিকে ষ্টীম এঞ্জিন উদ্ভাবিত হবার পর থেকে দ্রুতগামী যানের সৃষ্টি হল। ক্রমে আরও শ্রেয়তর যানের নূতন নূতন এঞ্জিন—যথা পেট্রল এঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক এঞ্জিন—তৈরী হল। দ্রুতগামী যানবাহনের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রও সীমিত পরিধিতে স্থির না থেকে চলমান হয়ে বিস্তৃত হয়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল স্থলে, জলে এবং আকাশে। আর ক্রমেই দূরপাল্লার মারাত্মক সব অস্ত্র তৈরী হতে লাগল। ক্রমবর্ধমান দূরপাল্লার ভয়ানক এইসব অস্ত্রকে জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষিপ্রগতিতে পৌছে দেবার জন্য দ্রুতগামী অস্ত্রবাহক হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। অস্ত্রবাহকগুলোর কেবলমাত্র ভারী ভারী অস্ত্রবহনের ক্ষমতা থাকলেই চলবে না, তাদের নিজেদেরও হতে হবে সুরক্ষিত। আবার অস্ত্রবাহক যদি এমন হয় যে তার মধ্যে নিরাপদে থেকেই সৈন্যরা অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে তাহলে তার কার্যকারিতা আরও বেড়ে যায়। অর্থাৎ অস্ত্রবাহকের উৎকর্ষতা থাকতে হবে দূরপাল্লার অস্ত্র বহন করার কাজে, গতির দ্রুততায়, এবং নিজের আরক্ষায়। অস্ত্রবাহকের গতিবিধি এমন হওয়া প্রয়োজন যে শত্রুপক্ষ যেন সহজে অস্ত্রবাহককে দেখতে না পায়, বা তার চলার শব্দ শুনতে না পায়, অর্থাৎ তার গতিবিধির

পূর্বাভাস যেন না পায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সব রাষ্ট্রেই চেষ্টা চলছে স্থলে, জলে এবং অন্তরীক্ষে ব্যবহার্য শ্রেয়তর সব অস্ত্রবাহক তৈরি করতে। ফলে সব দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতেই সংযোজিত হয়ে চলেছে নানাবিধ অস্ত্রবাহক।

স্থলযুদ্ধের অস্ত্রবাহক

স্থলযুদ্ধে ব্যবহার্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রবাহক বলে ট্যাংক স্বীকৃত। সমুদ্রযুদ্ধে ব্যবহার করা হয় বহুরকমের যুদ্ধজাহাজ এবং ডুবোজাহাজ। যেহেতু ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব বা গতিবিধি শত্রুপক্ষ সহসা ঠাহর করতে পারে না, সেহেতু জলযুদ্ধের অস্ত্রবাহকের মধ্যে ডুবোজাহাজের গুরুত্ব যথেষ্ট। বিমান-যুদ্ধে যে-বিমান শত্রুপক্ষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে—অর্থাৎ অনেক উঁচুতে থেকে—শত্রুরাষ্ট্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাড়াতাড়ি স্বরাষ্ট্রের নিরাপত্তার মধ্যে ফিরে যেতে পারে, সে বিমান তত কার্যকর অস্ত্রবাহক। এই কাজে জেট্-জঙ্গী বিমানই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই আজ সমস্ত উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে চেষ্টা চলছে ভীষণতর প্রকৃতির ট্যাংক, জঙ্গী বিমান এবং সাবমেরিন তৈরি বা সংগ্রহ করার। বর্তমান বিশ্বে ট্যাংক, জঙ্গী বিমান এবং সাবমেরিন আছেও বহু আকৃতির ও প্রকৃতির।

এবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রবাহক সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক। স্থলযুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ানক অস্ত্রবাহক হচ্ছে ট্যাংক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বস্তুতঃ ট্যাংকের প্রচলন হয়। সেই থেকে এখনও পৃথিবীর সব কয়টি উন্নত এবং কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নত কলাকৌশলের সাহায্যে ভীষণতর ট্যাংক তৈরির চেষ্টা চলছে প্রতিনিয়ত। প্রতিটি দেশই চাইছে আপন আপন দেশের এবং সীমান্তের ভূ-প্রকৃতি এবং ঋতুবৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রধান যুদ্ধ-ট্যাংক তৈরি করতে। যে-সব দেশ নিজেরা ট্যাংক বানাতে পারে না তারা অন্যদেশ থেকে সংগ্রহ করছে স্বদেশের উপযোগী 'প্রধান যুদ্ধ-ট্যাংক বা মেইন ব্যাট্‌ল্ ট্যাংক (Main Battle Tank)' বা সংক্ষেপে 'এম. বি. টি (MBT)। যে-কোন ট্যাংকেরই প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (1) চলৎ-শক্তি বা মোবিলিটি (Mobility), (2) অগ্নিবর্ষী ক্ষমতা বা ফায়ার

পাওয়ার (Fire Power), এবং (৩) বর্মিত আরক্ষা বা আর্মার্ড প্রোটেকশন (Armoured Protection)।

বাষ্পীয় এঞ্জিন (steam engine) আবিষ্কার হবার পর থেকেই এঞ্জিন চালিত দ্রুতগামী যানের ব্যবহার শুরু হয়েছে যুদ্ধের কাজে। কেবলমাত্র সৈন্যসামন্ত, রসদ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামরিক উপকরণ পরিবহণের জন্যই নয়, এঞ্জিনচালিত দ্রুতগামী যানের ব্যবহার হচ্ছে অগ্নিবর্ষী আয়ুধ সঞ্চালিত করার জন্যও। যে-রকম এঞ্জিনের সাহায্যে এবং যে প্রক্রিয়ায় মোটর-ট্রাক-লড়ী বাহনগুলো চালিত হয়, মূলতঃ তেমনি এঞ্জিনের সাহায্যে ও সেই পদ্ধতিতেই চলে ট্যাংক, কিন্তু অন্যান্য গাড়ীর মত ট্যাংকের চাকা মাটি স্পর্শ করে না। ট্যাংকের চাকাগুলোর নীচে থাকে ইস্পাতের তৈরী চ্যাপ্টা পাতের শিকল বা 'ট্র্যাক (Track)'। ট্যাংকের চাকা ঘুরতে শুরু করলে ঐ ট্র্যাকটি আবর্তিত হয়ে বারবার ট্যাংকের লোহার চাকাগুলোর নীচে চলে এসে ট্যাংকের চাকার জন্য তৈরি করে দেয় লোহার তৈরী চলমান একটি নিজস্ব রাস্তা। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'ক্যাটারপিলার (Caterpillar)' পদ্ধতি। এই পদ্ধতির জন্যই ট্যাংক মাটি, পাথর, কাদা, ঝোপঝাড় থেঁৎলে গুঁড়িয়ে :যেমন চলতে পারে, তেমনি অল্পচওড়া গর্ত, ট্রেঞ্চ বা নালা পার হতেও কোন অসুবিধে হয় না ট্যাংকের। এইভাবে চলার জন্য ট্যাংকের গতি তুলনামূলকভাবে শ্লথ হয়, কিন্তু ট্যাংকের চলৎশক্তি হয় অবাধ। প্রতিটি ট্যাংকেরই দুপাশে থাকে ছোটবড় কয়েকটি লোহার চাকা, ট্যাংকের সামনের দিকে বা পিছনের দিকে আইডলার (idler) চাকা, অন্ততঃ দুটো ট্র্যাক এবং ট্র্যাকগুলোকে আবর্তিত করার জন্য 'ট্র্যাক-রিটার্ণ-রোলার (Track-return-roller)'। কয়েকটি লোহার চাকায় 'দাঁত বা স্প্রকেট (Sprocket) থাকে।

ট্যাংকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তার অগ্নিবর্ষী ক্ষমতা ; আর এই ক্ষমতা নির্ভর করে প্রতিটি ট্যাংকবাহিত কামান, মেশিন গান প্রভৃতি অস্ত্র এবং তাদের গোলাগুলীর উপর। প্রত্যেক শ্রেণীর ট্যাংকেই থাকে একটি প্রধান কামান। একটি বা দুটি 'কো-অ্যাক্সিয়াল (Co-axial)' ছোট কামান, এবং একটি, দুটি বা বেশী এল. এম. জি.। তাছাড়া থাকে একটি ট্যাংকে যে কয়জন সৈন্য থাকে তাদের নিজস্ব হাতিয়ার। প্রতিটি ট্যাংকেই বাহিত হয় প্রধান কামান, কো-অ্যাক্সিয়াল কামান, ও মেশিন গানগুলোর জন্য প্রয়োজনীয়

রকমারি প্রকৃতির গোলাগুলী। এই অস্ত্রগুলো যত দূরপাল্লার হবে সাধারণতঃ তত ভারী হবে। আবার হাতিয়ারের ওজন বেশী হলে ট্যাংকটির সামগ্রিক ওজনও বেড়ে যাবে— আর তার ফলে ট্যাংকের গতি হবে ধীর।

বর্মিত আরক্ষা হচ্ছে ট্যাংকের তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রায় পুরো ট্যাংকটিই ঢাকা থাকে গুলীরোধক ইস্পাতের চাদর দিয়ে। এই ইস্পাতের চাদর যত পুরু হবে তত তার গুলিরোধক ক্ষমতাও বেশী হবে। কিন্তু ইস্পাতের চাদর পুরু হলেই ওজনে ভারী হবে। আর বর্ম ভারী হলে ট্যাংকের গতি যাবে কমে। কম গতিসম্পন্ন ট্যাংকের কার্যকারিতাও কমে যায়।

এই সব কারণে, প্রতি দেশই চেষ্টা করছে গতি, অগ্নিবর্ষী ক্ষমতা এবং আরক্ষার বর্মের মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য তৈরি করতে যাতে সব দিক থেকেই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন হয় তাদের তৈরী প্রধান যুদ্ধ-ট্যাংকটি। আরও একটি বিষয়ে সবাইকে নজর দিতে হয়—ট্যাংকটি চালাতে যেন খরচা বেশী না হয়। যেহেতু অবিরত চেষ্টা চলছে উন্নততর ট্যাংক তৈরির, সেহেতু আজ যে-শ্রেণীর ট্যাংকটি সবচেয়ে ভালো বলে নির্ণীত হচ্ছে, কিছু-দিনের মধ্যেই সে-শ্রেণীর ট্যাংকের চাইতেও উন্নতমানের ট্যাংক কোথাও না কোথাও তৈরী হয়ে যাচ্ছে। তাই কোন শ্রেণীর ট্যাংকই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বেশী দিন থাকতে পারছে না। সদাপরিবর্তনশীল এই পরিস্থিতির মধ্যেই প্রতিটি রাষ্ট্রকে আপন আপন প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বেছে নিতে হয় একটি প্রধান যুদ্ধ-ট্যাংক। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোন উন্নত শ্রেণীর ট্যাংক এসে প্রধান যুদ্ধ-ট্যাংকটি হটিয়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর প্রধান যুদ্ধ-ট্যাংককে কেন্দ্র করেই তৈরী হয় সাঁজোয়া বাহিনীর সংগঠন ও প্রশিক্ষণ। ভারতের প্রধান যুদ্ধ-ট্যাংক হচ্ছে 'বিজয়ন্ত (Vijayanta)' শ্রেণীর ট্যাংক। এই শ্রেণীর ট্যাংক সম্পর্কে কিছু তথ্য নীচে পরিবেশিত হয়েছে।

বিজয়ন্ত ট্যাংক (Vijayanta tank)

1950-এর দশকে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে ভারতীয় স্থল-বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত মানের প্রধান যুদ্ধ-ট্যাংক ভারতেই তৈরি করা হবে। ভারতের জন্য কোন্ শ্রেণীর ট্যাংক সকল রকম বিবেচনায় বিশেষ উপযুক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গড়া কমিটি

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাগ্রসর রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের 'ভাইকার্স (Vickers)' কোম্পানীর তৈরী নক্সাই ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করল ; এবং 1961 খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ঐ কোম্পানীটির সঙ্গে ভারত সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হল। 1963 খ্রীষ্টাব্দে ভাইকার্স কোম্পানী নূতন ট্যাংকের দুটি মডেল বা নমুনা (prototype) ভারত সরকারের কাছে পাঠালেন। ভারতের স্থলবাহিনীর জন্য আদর্শ ট্যাংকের রূপরেখা স্থির করার সময় ভাইকার্স কোম্পানী চেষ্টা করেছিলেন যে ট্যাংকটির সর্বমোট ওজন যেন প্রায় 38 টন (অর্থাৎ 38, 610 কে.জি.)-এর বেশী না হয়, এবং ঐ ট্যাংকটির চলৎশক্তি, অগ্নিবর্ষী ক্ষমতা ও বর্মিত আরক্ষার মধ্যে যেন একটি আদর্শ সমন্বয় সাধন করা যায়। যাই হোক, ভাইকার্স কোম্পানীর পাঠানো দুটো নমুনার মধ্যে ভারত সরকার একটি নমুনা বেছে নিলেন। কারিগরী দুনিয়ায় ঐ মডেলটির নাম হল 'ভাইকার্স এম. বি. টি. মার্ক 1 (Vickers MBT Mk 1)', আর ভারতে তার নাম রাখা হল 'বিজয়ন্ত (Vijayanta)'। মাদ্রাজের কাছে আভাদি নামক স্থানে বিজয়ন্ত ট্যাংক তৈরির জন্য কারখানা স্থাপিত হল। ঐ কারখানা থেকে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে ট্যাংক বের হল 1969 খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম প্রথম ঐ ট্যাংক তৈরি করার জন্য অনেক যন্ত্রাংশ ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা হত, বর্তমানে অবশ্য প্রায় সব যন্ত্রাংশই ভারতে তৈরি হচ্ছে।

বিজয়ন্ত ট্যাংকের মূল নক্সাটি সাধারণভাবে প্রচলিত ব্যবহারসিদ্ধ অন্যান্য ট্যাংকের নক্সার মতই, অবশ্য সামান্য কিছু রূপান্তর করা হয়েছে।

এই শ্রেণীর ট্যাংকে এঞ্জিন থাকে 'হাল (Hull)'-এর পিছনে, কিন্তু ড্রাইভারের আসন থাকে হালের সামনের দিকে ডান পাশে। গোলাগুলীর রাখার জায়গা বা ষ্টোয়েজ (ammunition stowage) থাকে হালের সামনে —বাঁদিকে। এই শ্রেণীর ট্যাংকের 'প্রলম্বন বা সাসপেনসন (suspension)' হচ্ছে 'কুঞ্চিত-হুড়কা বা টরশন-বার (torsion-bar)'-এর মত। ট্যাংকের দুই পাশে ছয়টি করে লোহার চাকা আছে ; চালনা করার 'স্প্রোকেট (sprocket)' থাকে পিছনের চাকায়, আর 'আইড্‌লার (idler)' থাকে সামনে। এই জাতীয় ট্যাংকে ট্র্যাক চালাবার 'রোলার (roller)' থাকে তিনটি। প্রতি ট্যাক-এ 'শু (shoe)' থাকে 96টি। ট্র্যাকের 'পিচ্‌ (pitch)' হচ্ছে 152·4 মি. মি. (6 ফুট), এবং প্রস্থ 495.3 মি. মি. (1 ফুট 7 ইঞ্চি)।

বিজয়ন্ত ট্যাংকের এঞ্জিন 'লেল্যাণ্ড এল-60 মার্ক 4B (Leyland L60 MK 4B)' শ্রেণীর। এই ট্যাংকে 'গীয়ার (Gear)' থাকে আট রকমের—ছয়টি সামনের দিকে যাবার জন্য অর্থাৎ 'ফরোয়ার্ড (Forward)' গীয়ার, এবং দুটো পেছনে যাবার অর্থাৎ 'রিভার্স (Reverse)' গীয়ার। গীয়ারবক্স হচ্ছে 'টি-এন 12 মেরিট উইলসন (TN-12 Gear Box Merrit Wilson)' শ্রেণীর; আর 'ক্লাচ (Clutch)' হচ্ছে 'কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal)' শ্রেণীর।

বিজয়ন্ত ট্যাংক রাস্তার উপর প্রতি ঘণ্টায় 48·3 কিলোমিটার (প্রায় 30 মাইল) বেগে যেতে পারে। এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে চলার কালে স্বভাবতঃই গতি কিছু কম হয়। 28·89 মিটার (94·78 ফুট) ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে ট্যাংকটি ঘুরতে পারে। সর্বোচ্চ 30° ডিগ্রী পর্যন্ত নতি (inclination) সম্পন্ন ঢালুপথ বেয়ে বিজয়ন্ত ট্যাংক উঠতে পারে; আর সমতলভূমিতে 8 ফুটের চাইতে কম চওড়া নালা-ট্রেঞ্চ অতিক্রম করতে পারে। 3 ফুট পর্যন্ত উঁচু কোন উল্লম্ব বাধা (vertical obstacle) এই শ্রেণীর ট্যাংকের অগ্রগতি থামাতে পারে না। একটি বিজয়ন্ত ট্যাংক তার দেহের মধ্যে 1000 লিটার (220 গ্যালন) জ্বালানীতেল বহন করতে পারে। এই শ্রেণীর ট্যাংক বাঁধানো রাস্তায় চলার সময় 1 লিটার তেল পুড়িয়ে 0·637 কিলোমিটার যেতে পারে, কিন্তু এবড়োখেবড়ো জমিতে মাত্র 0·31 কিলোমিটার যেতে পারে।

বিজয়ন্ত ট্যাংকের অগ্নিবর্ষী ক্ষমতা খারাপ নয়। সাধারণতঃ প্রতিটি বিজয়ন্ত ট্যাংকে নিম্নলিখিত অস্ত্রগুলো থাকে: (i) একটি আধা স্বয়ংক্রিয় (semi-automatic) কামান। কামানটির ব্যারেলের ব্যাস হচ্ছে 105 মি. মিটার এবং ব্যারেলটিতে রাইফলিং (Rifling) করা থাকে। আধা স্বয়ংক্রিয় হবার জন্য কামানটি থেকে খুব তাড়াতাড়ি অনেক গোলা বর্ষণ করা সম্ভব হয়। সমতলে 360° ডিগ্রী বৃত্তপথের যে কোন ডিগ্রীতে কামানটির মুখ ঘোরানো সম্ভব, আবার 20° ডিগ্রী পর্যন্ত উর্ধ্বকোণ তৈরি করেও কামানটি থেকে গোলাবর্ষণ সম্ভব। ট্যাংকে বসানো অবস্থায় কামানটিকে 7° ডিগ্রী পর্যন্ত নুইয়ে গোলাবর্ষণ করা চলে। এই কামানটিই বিজয়ন্ত ট্যাংকের প্রধান হাতিয়ার। এই কামান থেকে কার্যকরভাবে 2000 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত গোলা নিক্ষেপ করা যায়। এই কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা 1000 মিটার দূরত্বে

থাকা 350 মিলিমিটার পুরুত্বের প্রায় সব জিনিসকে ভেদ করতে পারে।

(ii) প্রধান হাতিয়ারটির (অর্থাৎ উপরে বর্ণিত কামানটির) অক্ষধুরা বা অক্ষ (axis)-এর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে থাকে 7·62 মিলিমিটার (·30" ইঞ্চি) ব্যাসবিশিষ্ট আরেকটি কামান। এই কামানটিকে বলে 'সমঅক্ষীয় দ্বিতীয় কামান (Coaxial Secondary gun)'।

(iii) ট্যাংক-কম্যাণ্ডারের 'কিউপোলা (cupola)'-তেও সমঅক্ষীয় দ্বিতীয় কামানটির সমশ্রেণীর আরেকটি কামান থাকে। সাধারণতঃ এই তৃতীয় কামানটিকে 'বিমান-বিধ্বংসী (Anti-Aircraft)' কামান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কামান দুটো 1463 মিটার পর্যন্ত কার্যকরভাবে গোলা ছুঁড়তে পারে।

(iv) উপরে উল্লিখিত কামান তিনটি ছাড়াও বিজয়ন্ত ট্যাংকে একটি 'রেঞ্জিং মেশিন গান (Ranging Machine Gun') থাকে। এই মেশিন গানটির ব্যারেলের ব্যাস হচ্ছে 12·7 মিলিমিটার। লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করতে এই মেশিন গানটি খুবই সাহায্য করে—কেননা এই মেশিনগানটি দিয়ে পর পর 'ট্রেসার (Tracer)' বা দূরত্বনির্ণয়ী গুলী ছোঁড়া যায়। অন্ধকারেও ট্রেসার বুলেটের গতিপথ দেখা যায়। মেশিন গানটি থেকে নিক্ষিপ্ত গুলীটি লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করলেই মেশিন গানটি থেকে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নিখুঁতভাবে জানা যায়। সাধারণতঃ প্রধান কামানটির নিশানা লক্ষ্যবস্তুর প্রতি স্থির করে গোলন্দাজ এই মেশিন গানটি দিয়ে ট্রেসারগুলি চলায় এবং লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করে, আর তার পরে প্রধান কামানটি থেকে গোলা ছোঁড়ে।

প্রধান কামানটি দিয়ে দুই রকমের গোলা ছোঁড়া চলে—(i) হাই এক্সপ্লোসিভ স্কোয়াশ হেড (High Explosive Squash Head)' সংক্ষেপে 'এইচ. ই. এস. এইচ. (HESH) ; এবং (ii) 'আর্মার পিয়ার্সিং ডিস-কার্ডিং স্যাবোট (Armour Piercing Discarding Sabot)' বা সংক্ষেপে 'এ. পি. ডি. এস. (APDS)'। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম শ্রেণীর গোলা উচ্চবিস্ফোরক ক্ষমতাসম্পন্ন ; সাধারণতঃ এই গোলা ছোঁড়া হয় শত্রু-সৈন্যদের লক্ষ্য করে। আর শত্রুপক্ষের ট্যাংকের ইস্পাতের চাদর ভেদ করার জন্য ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর গোলা। সাধারণতঃ প্রতিটি বিজয়ন্ত ট্যাংকে থাকে প্রধান কামানে ব্যবহার করার জন্য 44টি গোলা। প্রধান কামানটির

সঙ্গে একটি 'জি. ই. সি.-মার্কনি ষ্টেবিলিজেশন উপকরণ (GEC Marconi Stabilization System)' লাগানো থাকে। ফলে ট্যাংকটি এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে চলার সময়ও প্রধান কামানটির ব্যারেল লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নির্ভুল নিশানায় নির্দিষ্ট থাকে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কামানদুটোর জন্য প্রতিটি বিজয়ন্ত ট্যাংকে 3,000টি 7·62 মিলিমিটার গুলী থাকে, আর রেঞ্জিং মেশিন গানটির জন্য থাকে 600টি 12·7 মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট ট্রেসার-গুলী। কাজেই সব মিলিয়ে একটি বিজয়ন্ত ট্যাংকের অগ্নিবর্ষী ক্ষমতা অর্থাৎ ভয়াবহতা কম নয়।

যে-কোন ট্যাংকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্মিত আরক্ষা। গুলীনিরোধক ইস্পাতের চাদরের সাহায্যে এই আরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইস্পাতের চাদরের পুরুত্ব সব ট্যাংকে বা একই ট্যাংকের সব জায়গায় একরকম থাকে না। বিজয়ন্ত ট্যাংকের 'গম্বুজ বা টারেট (Turret)'-এর সম্মুখ দিকে ইস্পাতের চাদরটির পুরুত্ব থাকে 80 মিলিমিটার, দুইপাশে 60 মিলমিটার, এবং পিছনের দিকে 40 মিলিমিটার। আবার ট্যাংকটির 'খোল বা হাল (Hull)'-এ চাদরটির পুরুত্ব অন্য রকম—ট্যাংকের সম্মুখভাগ এবং নাকের মত ছুঁচলো অংশটিতে চাদরটি 88 মিলিমিটার পুরু। ট্যাংকের দুই পাশে 30 মিলিমিটার এবং পিছনের দিকে 20 মিলিমিটার পুরু ইস্পাতের চাদর থাকে।

একটি ট্যাংকের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ দুইভাবে মাপা হয়—(i) কামানসহ, ও (ii) ট্র্যাকের উপর। কামানসহ একটি বিজয়ন্ত ট্যাংকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 9·788 মিটার (32 ফুট $1\frac{3}{8}$ ইঞ্চি), আর শুধু ট্র্যাকের উপর 7·560 মিটার (24 ফুট $9\frac{1}{16}$ ইঞ্চি)। ট্যাংকটি 3·168 মিটার (10 ফুট 5 ইঞ্চি) চওড়া। মাটি থেকে কম্যাণ্ডারের 'কিউপোলা (Cupola)' পর্যন্ত ট্যাংকটির উচ্চতা 3·099 মিটার (10·16 ফুট)।

সাধারণতঃ একটি ট্যাংক স্ব-পক্ষীয় অন্য ট্যাংক বা পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে। যুদ্ধের সময় এই পারস্পরিক যোগাযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিজয়ন্ত ট্যাংকে বেতার যোগাযোগের জন্য 'সি 42 (C-42)' শ্রেণীর বেতার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গেও এই ট্যাংক থেকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা সম্ভব।

আরও দুটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর ট্যাংক সম্বন্ধে কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হচ্ছে।

প্যাটন (Patton) ট্যাংক

1965 খ্রীষ্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধে প্যাটন ট্যাংকের প্রহার্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্যাটন ট্যাংকের মর্যাদা ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু ভারতীয় জওয়ানেরা অসমসাহসিকতা এবং অভূতপূর্ব কুশলতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন প্যাটন শ্রেণীর ট্যাংককেও ঘায়েল করা যায়। অভিজ্ঞতার আলোকে পুরানো প্যাটন শ্রেণীর ট্যাংকের কিছু অদল-বদল ঘটানো হয়েছে, এবং প্যাটন ট্যাংকের কার্যকারিতা এখনও যথেষ্ট। প্যাটন শ্রেণীর মধ্যেও কয়েক প্রজাতির ট্যাংক আছে। এখানে দুটি প্রজাতির কিছু বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বিবৃত করা হচ্ছে।

প্রজাতির নাম : **প্যাটন এম 48 এ 2 (Patton M-48 A 2)**

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(i) প্রথম কোন দেশে তৈরী হয় : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

(ii) ওজন : 46 টন

(iii) দৈর্ঘ্য

(a) কামানসহ : 8·45 মিটার বা 27′ 9″ ইঞ্চি

(b) ট্র্যাকের উপর : 6·90 মিটার বা 22′ 8″ ইঞ্চি

(iv) প্রস্থ : 3·63 মিটার বা 11′ 11″ ইঞ্চি

(v) মাটি থেকে উচ্চতা : 3·09 মিটার বা 10′ 2″ ইঞ্চি

(vi) ক্রু (crew) বা আরোহীর সংখ্যা : চার জন

এঞ্জিন

(i) প্রকার : বাতাস দিয়ে শীতল করা (aircooled) 12 cyl A VI-1790-8 ; 2800 আর. পি. এম. (R.P.M.)-এ এই এঞ্জিনের বি. এইচ.পি. (b.h.p.) 865

(ii) গীয়ার : সামনে যাবার জন্য 2টি এবং পিছনে যাবার জন্য 1টি

(iii) সর্বোচ্চ গতি : বাঁধানো পথে প্রতি ঘণ্টায় 48 কি. মি. বা 30 মাইল

(iv) কত ডিগ্রী নতি পর্যন্ত উঠতে পারে : 30° ডিগ্রী

(v) জ্বালানী তেল খরচের পরিমাণ : রাস্তায় প্রতি গ্যালন তেলে 0·6 মাইল যেতে পারে

(vi) একটি ট্যাংক সবচেয়ে বেশী কত তেল বহন করতে পারে : 1100 লিটার বা 242 গ্যালন

(vii) প্রতি ট্র্যাকে কয়টি 'শু (shoe)' থাকে : 78টি

(viii) ট্র্যাকের প্রস্থ : 711 মি. মি. বা 2′ 4″ ইঞ্চি

বর্ম

(a) টারেটের পুরুত্ব

(i) সম্মুখভাগে : 110 মি. মি.
(ii) পার্শ্বে : 64 মি. মি.
(iii) পশ্চাৎভাগে : 64 মি. মি.
(iv) শীর্ষদেশে : 25 মি. মি.

(b) হালের পুরুত্ব

(i) সম্মুখভাগে : 100 মি. মি.
(ii) পার্শ্বে : 76 মি. মি.
(iii) পশ্চাৎদেশে : 75 মি. মি.
(iv) শীর্ষদেশে : 50 মি. মি.
(v) মেঝে : 25 মি. মি.

হাতিয়ার

(i) প্রধান কামান : 99 মি. মি. ব্যাস সমন্বিত একটি
(ii) সমঅক্ষীয় দ্বিতীয় কামান : 0·30 ইঞ্চি ব্যাস সমন্বিত একটি
(iii) বিমান বিধ্বংসী কামান : 0·50″ ইঞ্চি ব্যাস সমন্বিত একটি

গোলাগুলী

প্রকার	প্রতি ট্যাংকে কয়টি থাকে	1000 মিটার দূরত্বে ভেদনক্ষমতা	কতদূর পর্যন্ত কার্যক্ষম
(i) ট্যাংকের বর্মভেদকারী (APC—T)	60টি	92 মি. মি.	2286 মিটার
(ii) ট্যাংকের বর্মভেদকারী উচ্চবিস্ফোরক			

প্রকার	প্রতি ট্যাংকে কয়টি থাকে	1000 মিটার দূরত্বে ভেদনক্ষমতা	কতদূর পর্যন্ত কার্যক্ষম
(HVAP—T)	60টি		3200 মিটার
(iii) উচ্চবিস্ফোরক (HE)	60টি		4071 মিটার
(iv) দ্বিতীয় কামানের জন্য	5900টি		1463 মিটার
(v) বিমান-বিধ্বংসী	500টি		—

প্রজাতির নাম : **প্যাটন এম-47** (Patton M-47)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(i) প্রথম তৈরীর দেশ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

(ii) ওজন : 44 টন

(iii) দৈর্ঘ্য

(a) কামানসহ : 8·45 মিটার বা 27′ 9″ ইঞ্চি

(b) ট্র্যাকের উপর : 7·09 মিটার বা 23′ 3″ ইঞ্চি

(iv) প্রস্থ : 3·51 মিটার বা 11′ 6″ ইঞ্চি

(v) মাটি থেকে উচ্চতা : 2·95 মিটার বা 9′ 8″ ইঞ্চি

(vi) ক্রু (crew) বা আরোহীর সংখ্যা : পাঁচ জন

এঞ্জিন

(i) প্রকার : বাতাস দিয়ে শীতল করা কন্টিনেন্টাল ভি-12 (Continental V-12), 2800 আর. পি. এম (R.P.M.)-এ এই এঞ্জিনের বি. এইচ.পি. (b. h.p.) 810

(ii) গীয়ার : সামনে যাবার জন্য 2টি, পেছনে যাবার জন্য 1টি

(iii) সর্বোচ্চ গতি : বাঁধানো রাস্তায় প্রতি ঘন্টায় 60 কি. মি. বা 37 মাইল

(iv) কত ডিগ্রী নতি পর্যন্ত উঠতে পারে : 37° ডিগ্রী

(v) জ্বালানী তেল খরচের পরিমাণ : রাস্তায় 3 গ্যালন তেলে 1 মাইল যেতে পারে

(vi) একটি ট্যাংক সবচেয়ে বেশী কত তেল বহন করতে পারে : 881·91 লিটার বা 194 গ্যালন

(vii) প্রতি ট্র্যাকে কয়টি 'শু' থাকে : 83টি

(viii) ট্র্যাকের প্রস্থ : 635 মি. মি. বা 2′ 1″ ইঞ্চি

বর্ম

(a) টারেটের পুরুত্ব

- (i) সম্মুখভাগে : 110 মি. মি.
- (ii) পার্শ্বে : 64 মি. মি.
- (iii) পশ্চাৎ ভাগে : 76 মি. মি.
- (iv) শীর্ষদেশে : 25 মি. মি.

(b) হালের পুরুত্ব

- (i) সম্মুখভাগে : 90 মি. মি.
- (ii) পার্শ্বে : 75 মি. মি.
- (iii) পশ্চাৎদেশে : 75 মি. মি.
- (iv) শীর্ষদেশে : 25 মি. মি.

হাতিয়ার

(i) প্রধান কামান : 90 মি. মি. ব্যাস সমন্বিত একটি

(ii) সমঅক্ষীয় দ্বিতীয় কামান : 30″ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি

(iii) বিমানবিধ্বংসী কামান : 50″ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি

(iv) হালে রাখা কামান : 30″ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি

গোলাগুলী

প্রকার	ট্যাংকে সাধারণতঃ কয়টি থাকে	1000 মিটার দূরতে ভেদনক্ষমতা	কতদূর পর্যন্ত কার্যক্ষম
(i) ট্যাংকের বর্মভেদকারী (APC—T)	71টি	92 মি. মি.	2286 মিটার
(ii) ট্যাংকের বর্মভেদকারী উচ্চবিস্ফোরক (HVAP—T)	71টি		3200 মিটার

প্রকার		ট্যাংকে সাধারণতঃ কয়টি থাকে	100 মিটার দূরতে ভেদনক্ষমতা	কতদূর পর্যন্ত কার্যক্ষম
(iii)	উচ্চবিস্ফোরক (HE)	71টি		4071 মিটার
(iv)	দ্বিতীয় কার্মানের জন্য	4550টি		1463 মিটার
(v)	বিমান-বিধ্বংসী	600টি		
(vi)	হালের কামানের জন্য	6250টি		

শ্যাফী (Chaffee) ট্যাংক

হাল্কা ট্যাংকগুলোর মধ্যে শ্যাফী ট্যাংকের যথেষ্ট নামডাক আছে। শ্যাফী ট্যাংক পুরানো হলেও অনেক দেশে এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই শ্রেণীরও বেশ কয়েকটি প্রজাতি আছে, এখানে অবশ্য একটি প্রজাতির কিছু বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লেখা হয়েছে।

প্রজাতির নাম : **শ্যাফী এম-24** (Chaffee M-24)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(i) প্রথম কোন দেশে তৈরী হয় : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

(ii) ওজন : 18 টন

(iii) দৈর্ঘ্য

(a) কামান সহ : 5·61 মিটার বা 18′ 5″ ইঞ্চি

(b) ট্র্যাকের উপর : 4·95 মিটার বা 16′ 3″ ইঞ্চি

(iv) প্রস্থ : 2·66 মিটার বা 8′ 9″ ইঞ্চি

(v) মাটি থেকে উচ্চতা : 2·48 মিটার বা 8′ $1\frac{3}{4}$″ ইঞ্চি

(vi) ক্রু বা আরোহীর সংখ্যা : চার জন

এঞ্জিন

(i) প্রকার : পেট্রল চালিত ক্যাডিলাক ভি-8 (Cadilac V-8), 3400 আর. পি. এম. (R.P.M.)-এ এই এঞ্জিনের বি. এইচ.পি. (b. h.p.) 220

(ii) গীয়ার : সামনে যাবার জন্য 5টি, পিছনে যাবার জন্য 1টি

(iii) সর্বোচ্চ গতি : বাঁধানো রাস্তায় প্রতি ঘণ্টায় 56 কি. মি. বা 35

মাইল

(iv) কত ডিগ্রী নতি পর্যন্ত উঠতে পারে : 31° ডিগ্রী

(v) একটি ট্যাংক কত জ্বালানী তেল বহন করতে পারে : 418·23 লিটার বা 92 গ্যালন

(vi) প্রতি ট্র্যাকে কয়টি 'শু' থাকে : 75টি

(vii) ট্র্যাকের প্রস্থ : 406·4 মি. মি. বা 16″ ইঞ্চি

বর্ম

(a) টারেটের পুরুত্ব

(i) সম্মুখভাগে : 30 মি. মি.

(ii) পার্শ্বে : 25 মি. মি.

(iii) পশ্চাৎভাগে : 30 মি. মি.

(iv) শীর্ষদেশে : 10 মি. মি.

(b) হালের পুরুত্ব

(i) সম্মুখভাগে : 25·4 মি. মি.

(ii) পার্শ্বে : 25·4 মি. মি.

(iii) পশ্চাৎদেশে : 19 মি. মি.

(iv) শীর্ষদেশে : 19 মি. মি.

(v) মেঝে : 12 মি. মি.

হাতিয়ার

(i) প্রধান কামান : 75 মি. মি. ব্যাসবিশিষ্ট একটি

(ii) সমঅক্ষীয় দ্বিতীয় কামান : 30″ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি

(iii) বিমান-বিধ্বংসী কামান : °50″ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি

(iv) হালে রাখা কামান : 30″ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি

গোলাগুলী

প্রকার	প্রতি ট্যাংকে কয়টি থাকে	1000 মিটার দূরত্বে ভেদনক্ষমতা
(i) বর্মভেদকারী (AP)	48	67 মি. মি.
(ii) উচ্চবিস্ফোরক (HE)	48	

প্রকার	প্রতি ট্যাংকে কয়টি থাকে	1000 মিটার দূরত্বে ভেদনক্ষমতা
(iii) দ্বিতীয় কামানের জন্য	3750	
(iv) বিমান-বিধ্বংসী	440	
(v) হালে রাখা কামানের জন্য	3750	

আকাশযুদ্ধের বা বিমানযুদ্ধের অস্ত্রবাহক

'রামায়ণ' মহাকাব্যটিতে বলা আছে, আকাশপথে চলাফেরার জন্য রাক্ষসরাজা রাবণের ছিল পুষ্পক রথ, আর ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষ থেকে অস্ত্র-চালনা করে বীর রাম-লক্ষ্মণকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। 'রামায়ণ'-এর যুগে বিমানপোত ছিল কিনা, আর থাকলে তাদের আকৃতি বা প্রকৃতি কেমন ছিল তা নিয়ে বিতর্ক-গবেষণা চলতে পারে, কিন্তু একথা মানতেই হবে যে সে-যুগেও 'রামায়ণ' রচয়িতা কবি আকাশযুদ্ধের উপযোগিতা অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে বিমান-যুদ্ধের প্রাধান্য এবং গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। অন্তরীক্ষ থেকে মারণাস্ত্র প্রয়োগের সুবিধা যে আধুনিক যুদ্ধের গতি ও ফল নির্ধারণে অচিন্ত্যপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে সে কথা আজ আর ব্যাখ্যা করে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। তাই বর্তমানে পৃথিবীর সব উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলোতে গবেষণা চলছে নূতন নূতন শ্রেণীর ভয়ানক সব বিমান তৈরী।

মানুষ একদিকে যেমন আকাশপথে দ্রুতগামী এবং উন্নততর যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় আগ্রহী, অন্যদিকে তেমনি সমরবিশারদরা এই উন্নত ব্যবস্থাকে যুদ্ধের কাজে লাগিয়ে যুদ্ধের গতি ও চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে ব্যস্ত। আধুনিক কালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দুরন্ত অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আজ অতি দ্রুতগামী বিমানপোতের অধিকারী। বায়ুমণ্ডলে বিমানপোতের এই গতি আজ বায়ুমাধ্যমে শব্দের গতিকেও অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই অতিদ্রুতগামী বিমানের গতিবেগ আজকাল এক নূতন এককের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই এককটির নাম "ম্যাক নাম্বার (Mach Number)" বা সংক্ষেপে "ম্যাক নং (Mach No)"। বায়ুমাধ্যমে শব্দের গতিবেগের সমান গতিবেগসম্পন্ন বিমানের

গতিবেগ 'ম্যাক 1 (Mach 1)' দিয়ে নির্দিষ্ট হয়। শব্দের চেয়ে দ্রুততর গতিবেগসম্পন্ন বিমানকে বলা হয় 'সুপারসোনিক (supersonic)' বিমান। স্বভাবতঃই এই শ্রেণীর বিমানের 'ম্যাক নং (Mach No)' থাকে 1-এর বেশী, যেমন বায়ুমাধ্যমে শব্দের গতির দেড়গুণ গতিসম্পন্ন বিমানের গতিবেগ হচ্ছে 'ম্যাক 1·5'। বর্তমান বিশ্বে বায়ুমাধ্যমে শব্দের গতিবেগের চারগুণ গতিবেগসম্পন্ন বিমানও আছে, তাদের গতিবেগ 'ম্যাক 4'।

অন্যদিকে বায়ুমাধ্যমে শব্দের গতিবেগের কাছাকাছি কিন্তু কম গতিবেগসম্পন্ন বিমানকে বলা হয় 'সাবসোনিক (subsonic)'। যদি কোন সাবসোনিক বিমানের গতিবেগ বায়ুমাধ্যমে শব্দের গতিবেগের নয়-দশমাংশ হয়, তাহলে তার গতিবেগ হবে 'ম্যাক 0·9'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিমানের এই সব গতিবেগ হচ্ছে আকাশপথে বিমানের স্বাভাবিক পরিক্রমার কালে সর্বোচ্চ গতিবেগ। কোন কোন বিমানের গতিবেগ আবার উন্নয়নের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শব্দের গতিবেগকে অতিক্রম করে যেতে পারে। ঐসব বিমানকে বলা হয় 'ট্রানসোনিক (transonic)' বিমান। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে সামরিক বিমানের দ্রুতগতি বিমানযুদ্ধে সাফল্যলাভের একটি প্রধান সহায়।

আকাশযুদ্ধে বিভিন্ন সামরিক কৌশলগত দায়িত্ব পালনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিমান প্রয়োজন হয়। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিমানে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য সংযোজিত করা হয় বিমানের বিশেষ বিশেষ অংশের আকৃতির তারতম্য ঘটিয়ে। আবার বিমানে প্রয়োজনীয় আয়ুধ এবং যন্ত্রপাতি উপযোগী জায়গায় স্থাপন করার জন্যও কিছু কিছু সংযোজন করতে হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিমানের গঠনে যে বৈচিত্র্য এবং সংযোজন ঘটাতে হয় তা যেমন কখনও একপ্রকার নয়, তেমনি অনেক সময় পরস্পর বিরোধী হতেও দেখা যায়। কাজেই একই বিমানের গঠনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংযোজন বা আকৃতির রূপান্তর ঘটানো যায় না। যেমন আকাশপথে শত্রুর বিমানকে বাধা দেওয়া (Intercept) এবং আকাশযুদ্ধে নিয়োজিত থেকে শত্রুর বিমানকে ধ্বংস করা এই দুটি কাজের জন্যই বিমানের অতি দ্রুতগতি গতিস্বাচ্ছন্দ্য (Mobility) এবং গতিতৎপরতা (Manoeuverability) বা অতি অল্প জায়গার মধ্যে সুকৌশলে যেকোন দিকে চকিতে দিক-পরিবর্তন করার যোগ্যতা থাকা

একান্ত প্রয়োজন। আবার পূর্ণসজ্জিত বিমানটির ওজনও হাল্কা হওয়া দরকার—অর্থাৎ বিমানে সজ্জিত আবশ্যক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালানী-আধারের ওজন সীমিত রাখতে হয়। ফলে জ্বালানীর সীমিত সঞ্চয়ের জন্য বিমান বেশীক্ষণ আকাশে থাকতে পারে না। অতএব অপেক্ষাকৃত কম হারে জ্বালানী খরচের বিনিময়ে উচ্চশক্তি উৎপাদনকারী অথচ বেশী ওজনের নয় এমন উচ্চযোগ্যতা সম্পন্ন এঞ্জিন বিমানে সংস্থাপন করা দরকার। তেমনি বিমানের গতিবিধি নির্ধারক নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশগুলিকেও উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী আকার দিতে হয়। সীমিত বহনযোগ্য ওজনের অথচ নিশ্চিত লক্ষ্যে প্রচণ্ড আঘাতকারী বিধ্বংসী অস্ত্রসম্ভারে বিমানকে সজ্জিত করা দরকার। মোট কথা, শত্রু বিমানের আক্রমণকে আকাশপথে সার্থকভাবে বাধা দেওয়ার যোগ্য (Intercepter) এবং আকাশযুদ্ধে শত্রু-বিমানকে ঘায়েল করার উপযুক্ত জঙ্গী (Fighter) বিমানকে অতিদ্রুতগতিসম্পন্ন, গতিস্বাচ্ছন্দ্য যুক্ত এবং নিশ্চিত লক্ষ্যগামী ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন প্রচণ্ড আঘাতকারী অস্ত্র-পদ্ধতিতে সজ্জিত অথচ হাল্কা ও ছোট আকারের হতে হবে। কেননা দ্রুত-গতিতে পরিক্রমণশীল শত্রু-বিমানকে নিজ নিশানায় আনতে বিমানচালককে মুহূর্তে নিজবিমানের গতি পরিবর্তিত করে তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থাপন করতে হবে। এই নিশানা স্বভাবতঃই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী নিশানাতেই বৈমানিককে অস্ত্রের আঘাত হানতে হয়। যেহেতু ক্ষেপণাস্ত্র-গুলো বিমানের দেহে স্থির নিশানায় সন্নিবেশিত থাকে সেই কারণেই বিমান-চালকের পক্ষে নিজ অস্ত্রপদ্ধতির স্থির নিশানাকে অতিদ্রুত অবস্থান পরি-বর্তনশীল শত্রুবিমানের অবস্থানের লক্ষ্যে পৌছে দিতে গোটা বিমানকেই সামগ্রিকভাবে চকিতে দিক পরিবর্তন করিয়ে লক্ষ্যভেদের জন্য ক্ষণস্থায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থাপন করতে হয়। অর্থাৎ সমগ্র বিমানটিকে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে পরিচালনা করা প্রয়োজন।

অন্যদিকে বোমারু (Bomber) বিমানকে যেতে হয় শত্রুর দেশের অভ্যন্তরে যে-সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকে শত্রুসৈন্যের ঘাঁটি এবং শিল্প-কারখানাগুলো; কেননা বোমা ফেলে ঐ সব ঘাঁটি ও কারখানা ধ্বংস করা বোমারু বিমানের একটি মুখ্য দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য বোমারু বিমানকে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হয়, আবার লক্ষ্যবস্তুতে বোমা ফেলা হয়ে গেলে ঐ দূরত্ব অতিক্রম করে স্ব-রাষ্ট্রের নিরাপদ ঘাঁটিতে ফিরে আসতে হয়।

তার এই যাতায়াতের পথের মধ্যে কিন্তু সাধারণতঃ এমন কোন জায়গা থাকে না যেখানে বোমারু বিমানটি জ্বালানী সংগ্রহ করতে পারে। তাই বোমারু বিমানকে এমনভাবে গঠিত করতে হয় যাতে বিমানটি একবার জ্বালানী সংগ্রহ করেই দূরপাল্লা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে পারে। আবার সাধারণতঃ যে বোমা যতবেশী কার্যকর তার ওজন তত বেশী। একটি বোমারু বিমানকে বেশ কয়েকটি বোমা বহন করে নিয়ে যেতে হয়। তাই একটি বোমারু বিমানকে যেমন দূরপাল্লায় যাতায়াত করার যোগ্য হতে হয়, তেমনি তার অনেক ওজন বহন করার ক্ষমতাও থাকতে হয়। এই সব কারণে বোমারু বিমানের জ্বালানীর ট্যাংকের আকার, ডানার আয়তন, এঞ্জিনের প্রকৃতি, এমনকি গোটা বিমানটির আকৃতিই হয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাধারণতঃ বোমারু বিমান ভারী হয় এবং তার গতিও জঙ্গী বিমানের তুলনায় শ্লথ হয়।

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত দুই শ্রেণীর বিমানের গঠন বৈচিত্র্য এবং অস্ত্রসম্ভার একই বিমানে এনে দেওয়া দুঃসাধ্য। তবে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে এমন ফাইটার/ইণ্টারসেপ্টার প্রভৃতি শ্রেণীর বিমানে তাদের নিজস্ব বিশিষ্ট অস্ত্রসজ্জার সঙ্গে অতিরিক্ত অস্ত্র হিসাবে কিছু হাল্কা বোমা সংযোজন করে ঐ বিমানগুলোকে বহুবিধ কাজের—যেমন আকাশপথে শত্রুর বিমানকে বাধা দেওয়া, আকাশযুদ্ধে ঐ বিমানকে ঘায়েল করা, এবং প্রয়োজনে হাল্কা বোমা বর্ষণ করা—উপযোগী করে বিমান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। উপরে উল্লিখিত প্রতিটি শ্রেণীর বিমানেই কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ও জটিল নানাবিধ যন্ত্রপাতি সংযুক্ত থাকে।

বিমান চলাচলের মাধ্যম হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় কিন্তু এই মাধ্যমের প্রকৃতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট হারে বায়ুর ঘনত্ব, বায়ুমণ্ডলের চাপ ও তাপমাত্রা কমে যায়। অনেক উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব এত কমে যায় যে বায়ু পাতলা হয়ে যায় এবং ঐ বায়ুমধ্যস্থ অক্সিজেনের পরিমাণও তাৎপর্যময়ভাবে কমে যায়। অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য বিমানের এঞ্জিনের কার্যকারিতা কমে যায়, আবার বায়ুর ঘনত্ব কমার জন্য বিমানের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাও (control system) শিথিল হয়ে পড়ে। এই সব কারণে

দেখা যায় যে, বায়ুমণ্ডলের মাঝামাঝি অঞ্চলে অর্থাৎ মধ্য-আকাশে যে-বিমানের কর্মকুশলতা প্রশংসনীয় সেই বিমানেরই কর্মতৎপরতা কিন্তু উচ্চ-আকাশে বা নিম্ন-আকাশে অত্যন্ত কমে যায়। আবার মানুষের দেহও ত একটি যন্ত্রবিশেষ—এই যন্ত্রটি ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ ও পর্যাপ্ত-ভাবে অক্সিজেনসমৃদ্ধ পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে কাজ করার উপযুক্ত এবং সেই পরিবেশেই অভ্যস্ত। অতি ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুমণ্ডলের কম চাপ এবং প্রাপ্য অক্সিজেনের ভয়ানক স্বল্পতার জন্য বিমান-চালকের দেহে নানাপ্রকার বিকার ও অসুস্থতা দেখা দেয়, এবং ক্রমেই সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে অতি উর্দ্ধাকাশে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে গতি-তৎপরতা ও বিমানচালকের কর্মকুশলতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অতি ঊর্ধ্বাকাশ-চারী বিমানগুলোর গঠন ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন ও সংযোজন আবশ্যক। যেমন 'পর্যবেক্ষণ (reconnaissance)' কাজে নিযুক্ত, অর্থাৎ শত্রু-রাষ্ট্রের বিভিন্ন সামরিক প্রস্তুতির প্রাথমিক তথ্যচিত্র সংগ্রহকারী বিমানকে আত্মরক্ষার তাগিদেই শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্রের দূরতম পাল্লার বাইরে অতি ঊর্ধ্বা-কাশপথে চলাচল করতে হয়। এই সব বাস্তব প্রয়োজনে এই বিশেষ শ্রেণীর বিমানের গঠন-প্রকৃতি ও সাজসরঞ্জামে ভিন্নতা দেখা দেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী আধুনিক সামরিক বিমানের বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে প্রতিটি শ্রেণীর বিমানই বায়ুমণ্ডলে একটি বিশেষ উচ্চতার উপরে নিজ উদ্দেশ্যসাধনে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বজায় রাখতে পারে। যে-বিশেষ উচ্চতার উপরে উঠলে বিমান আপনকাজের প্রয়ো-জনীয় কুশলতা হারিয়ে ফেলে সেই নির্দিষ্ট উচ্চতাকেই বলা হয় ঐ বিমানটির আকাশপথের 'ঊর্ধ্বসীমা (ceiling)'।

প্রত্যেক শ্রেণীর সামরিক বিমানের গঠনবৈশিষ্ট্য, গতিশীলতা, পাল্লা (range), অস্ত্রসম্ভার, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ, সঞ্চিত জ্বালানীর পরিমাণ, এঞ্জিনের ক্ষমতা ও জ্বালানী খরচের হার, ডানার আকৃতি বিস্তার ও আয়তন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রকৃতি, আকাশপথের ঊর্ধ্বসীমা, অবতরণকালে ভূমিস্পর্শকরাকালীন সম্ভাব্য নিম্নতম গতিবেগ, প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন। কোন শ্রেণীর বিমানের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের যোগ্যতা ও কার্য-কারিতা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা পেতে হলে ঐ বিমানটির এই সব বৈশিষ্ট্য-

গুলো জানা দরকার।

বর্তমান দ্রুত উন্নতিশীল যুগে আকাশপথে আধুনিক যুদ্ধে উপযোগী অতিদ্রুতগামী প্রচণ্ড আঘাতকারী অস্ত্রবাহক ও অস্ত্রপদ্ধতিকে বিভিন্ন সুযোগসন্ধানী উন্নত প্রযুক্তির অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সহায়তায় যথাসময়ে সার্থকভাবে নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া নিয়ে গোটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি এতই ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে যে উন্নতিশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে সর্বাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তার কর্মকুশলতা যুগোপযোগী রাখা দুঃসাধ্য ত বটেই, প্রায় সাধ্যাতীত। কালোপযোগী সর্বাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আবশ্যক শিল্পবিন্যাস এবং উন্নতমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাবিশারদ মানবসম্পদ তৈরি করা যেমন ব্যয়সাপেক্ষ তেমনি সময়সাপেক্ষও বটে। কিন্তু ভারতের মত উন্নতিশীল ও বিশাল দেশের পক্ষে আধুনিক কালের জন্য প্রয়োজনীয় আকাশপথের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকাও ত বাস্তববুদ্ধিসম্মত কাজ নয়। কাজেই গোড়ার দিকে বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের উৎস থেকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিমান আনা হচ্ছিল,—যেমন ফ্রান্সের উৎস থেকে 'মিষ্টিয়ার (Mystere)', 'ওরাগণ (Oragon)', যুক্তরাজ্যের উৎস থেকে 'ভ্যাম্পায়ার (Vampire)', 'হান্টার (Hunter)', 'ন্যাট (Gnat)', 'ক্যানবেরা (Canberra)', 'এ্যাভ্রো 748 (Avro 748)', প্রভৃতি। কিন্তু পররাষ্ট্রনির্ভরশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কখনও সবল হতে পারে না। তাই ভারত প্রতিরক্ষার এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে স্বদেশে উপযুক্ত প্রাথমিক শিল্পবিন্যাস গড়ে তুলেছে। এমনকি 'ন্যাট্' বিমানের কর্মকুশলতা উন্নত করে নিজ কারখানায় উন্নতমানের 'অজিত (Ajita)' বিমান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আবার ভিন্ন এক শিল্পবিন্যাস গড়ে তুলে ভারত রাশিয়ার উৎস থেকে সংগ্রহ করা নক্সা, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং রাশিয়ার সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির 'মিগ্ (Mig)' বিমান তৈরি করতে শুরু করেছে। তেমনি যুক্তরাজ্যের উৎস থেকে 'হান্টার (Hunter)' বিমানের উন্নততর প্রজাতি 'জাগুয়ার (Jaguar)' শ্রেণীর বিমানের অংশসমূহ এনে 'হিন্দুস্থানের এ্যারোনটিক্স লিমিটেড (Hindusthan Aeronautics Limited)'-এর কারখানায় গোটা বিমান তৈরি করে চালু করার কাজ চলছে। ফ্রান্স থেকেও ভারত কিছু অত্যাধুনিক 'মিরাজ-2000 (Mirage-2000)' বিমান চালু অবস্থায় সংগ্রহ করেছে, এবং ফ্রান্সের উৎস

থেকেই 'মিরাজ-2000' বিমানের অংশগুলো এনে হিন্দুস্থান এ্যারোনটিক্স লিমিটেডের কারখানায় সম্মিলিত করে পুরো প্লেনটি তৈরীর কাজ চলছে। বিভিন্ন উন্নত দেশ থেকে এই সব অতি আধুনিক বিমানের অংশগুলো এনে সুচারুভাবে সম্মিলিত করে বিমান তৈরীর কাজের মধ্য দিয়ে দেশে উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যায় কুশল মানবসম্পদ বাড়ানোর কাজ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, এবং ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সাহায্যে সম্পূর্ণ দেশজ উপাদানে গঠিত উন্নততর প্রজাতির সামরিক বিমান উৎপাদনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অবশ্য বর্তমানে ভারতে সামরিক বিমান নির্মাণের শিল্পবিন্যাস প্রধানতঃ উন্নততর বিভিন্ন প্রজাতির 'মিগ' বিমান উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই বিকাশ লাভ করছে। তাই এই গ্রন্থে কেবলমাত্র কয়েক প্রজাতির 'মিগ' বিমানের গঠনবৈচিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

মিগ্ (MiG)

পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রথম শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী জঙ্গী বিমান বা ফাইটার তৈরী হয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ায়। ঐ শ্রেণীর জঙ্গী বিমানের নাম 'মিগ-19 (MiG-19)'। আকাশে নিকট যুদ্ধে (close combat) 'মিগ-19' শ্রেণীর জঙ্গী বিমান এখনও সমানভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করে—কেননা এই শ্রেণীর বিমান যেমন অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দিক পরিবর্তন করতে পারে, তেমনি ভয়াবহ এই বিমানের যুক্ত কামানগুলো। অবশ্য মিগ-19 শ্রেণীর বিমান-গুলোর সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল যে কেবলমাত্র অনুকূল আবহাওয়াতেই এরা কাজ করতে পারত।

স্বভাবতঃই মিগ-19 শ্রেণীর বিমানের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করার কাজে প্রবৃত্ত হলেন বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়াররা। ফলে দিনে দিনে নানা রকমের এবং উন্নতমানের 'মিগ' বিমান তৈরী হতে লাগল ; যেমন—মিগ-19, জে-6 ফার্মার (MiG-19, J-6 'Farmer'), মিগ-21 জে-7 ফিশবেড, মঙ্গোল (MiG-21 J-7 'Fishbed', Mongol), মিগ-21 বিস্ (MiG-21 bis), মিগ-23 (MiG-23), মিগ 25 ফক্সবোট (MiG-25 'Foxboat'), মিগ 27 ফ্লগার (MiG-27 'Flogger') মিগ-29 ফালক্রাম (MiG-29 'Fulcrum') মিগ-31 ফক্সহাউণ্ড (MiG-31 'Foxhound'), ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের মিগ বিমানগুলোর নানাবিধ পার্থক্য থাকলেও দুটো প্রধান

বৈশিষ্ট্য কিন্তু সব রকমের বিমানগুলোতেই রয়েছে। যেমন, এই বিমানগুলো মূলতঃ জঙ্গী বিমান এবং এদের এঞ্জিনগুলো টারবোজেট (turbojet)।

জঙ্গীবিমানের প্রধান কাজ হলো আকাশ-পথে যুদ্ধ করে স্ব-রাষ্ট্রের আকাশ-সীমাকে শত্রুমুক্ত রাখা, শত্রুরাষ্ট্রের আকাশে স্বপক্ষের বৈমানিক আধিপত্য বিস্তার করা, স্বপক্ষীয় বোমারু বিমানগুলোকে প্রহরা দিয়ে শত্রু-রাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে নিয়ে আসা, এবং স্বপক্ষীয় পরিবহণ বিমান-গুলোকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

সাধারণতঃ 'জেট (jet)' বলতে বোঝায় সঙ্কীর্ণ নলপথে তীব্র স্রোতের আকারে তরল কিংবা বায়বীয় পদার্থের পরিচলন ও নির্গমন প্রক্রিয়া। বিমান-বিজ্ঞানে বিমানের দেহের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে সঙ্কীর্ণ নলপথে বেরিয়ে যাওয়া তীব্র গতিসম্পন্ন গ্যাসীয় স্রোতকে জেট্ বলে।

সাধারণতঃ বাতাসের মধ্য দিয়ে যে সম্মুখগামী 'বল (force)' একটি বিমানকে চালিত করে তাকে বলে 'থ্রাষ্ট (Thrust) বা ধাক্কা'। বাতাসের প্রতিঘাত (resistance) অতিক্রম করতে এবং বাতাসের মধ্যে বিমানের গতি ত্বরান্বিত করতে এই বলের বিশেষ প্রয়োজন হয়। স্বয়ংচালিত যা কিছুই ভাসে বা উড়ে তারা কোন কিছুকে স্থানচ্যুত করেই আপন গতি লাভ করে। মজা হচ্ছে যে ভাসমান বা উড়ন্ত বস্তুটি যে-মাধ্যমের সাহায্যে ভাসে বা উড়ে থাকে, সাধারণতঃ সেই-মাধ্যমেরই কিছু অংশকে পিছনের দিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ভেসে বা উড়ে আগের দিকে চলতে পারে। বিমান উড়ে বাতাসের মধ্যে। কাজেই কিছু পরিমাণ বাতাসকে সজোরে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েই বিমান সামনের দিকে যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি স্মর্তব্য—সব ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। কাজেই একটি বিমান যদি বেশ কিছু পরিমাণ বাতাসকে কোন উপায়ে খুব জোরে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে পারে তাহলেই বিমানটির পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

কাজেই বিমানের এগিয়ে যাবার ক্ষমতাকে বলা যেতে পারে 'থ্রাষ্ট'। যে-সব বিমানে পিষ্টন এঞ্জিন আছে সেখানে 'প্রচালিকা বা প্রপেলার (Propeller)' এই বল যোগায়; কিন্তু জেট্ চালিত বিমানে এই থ্রাষ্ট তৈরী হয় কিছু পরিমাণ বাতাসকে খুব দ্রুত 'বেগ (Velocity)'-এ 'স্রোত নিষ্ক্রমণ বা জেট্ এক্সহষ্ট (Jet Exhaust)'-এর পথে পিছনে ঠেলে দেওয়ার

মধ্য দিয়ে।

জেট্ পরিচালনের নীতি (Jet Propulsion Principle)

সম্মুখবর্তী বায়ুকে নজ্‌ল্ (nozzle)-এর মধ্যে দিয়ে টেনে এনে বিমানের দেহের ভিতরে জেট্ এঞ্জিনের মধ্যে প্রবেশ করান হয়, সেখানে চাপ দিয়ে বাতাসকে সঙ্কুচিত (compressed) করা হয়। পরে জ্বালানী প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করে বায়বীয় পদার্থে উচ্চচাপ সৃষ্টি করা হয়; এই প্রচণ্ড চাপের প্রভাবে প্রজ্বলনে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থ তীব্রবেগে 'গ্যাস এক্সহষ্টে'র সরু নলপথে ধাবিত হয়ে পিছনদিকের বায়ুমণ্ডলে তীব্র স্রোতের আকারে নির্গত হয়। এই সময় তাপ শক্তি (heat energy) রূপান্তরিত হয় গতি শক্তি বা গতীয় শক্তিতে (kinetic energy)। শেষ পর্যন্ত জেট এক্সহষ্টের মধ্য দিয়ে খুব জোরে ঠেলে বায়বীয় পদার্থটিকে পিছনের দিকে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তীব্র স্রোতের আকারে প্রবাহিত করে দেওয়া হয়। বায়বীয় পদার্থ বের হয়ে যাবার সময় বিমানটিকে সামনের দিকে প্রচণ্ড বল প্রয়োগে ঠেলে দেয়।

একটি পিষ্টন-এঞ্জিনের কাজের চক্রের সঙ্গে জেট্-এঞ্জিনের কাজের আবর্তের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জেট্-এঞ্জিনের কাজের জন্য 'টারবাইন (turbine)' যুক্ত হয়েছে বলে একে বলা হয় 'টারবোজেট (Turbojet)'। টারবোজেটে পিষ্টনের কোন প্রয়োজন হয় না। আবার এঞ্জিনের ক্ষমতা দিয়ে 'প্রচালিকা বা প্রপেলার (Propeller)' পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

'কম্প্রেসার (Compressor)'-এর সাহায্যে 'এয়ার ইনটেক (Air intake) বা বায়ুর প্রবেশপথ' দিয়ে জেট-এঞ্জিনের মধ্যে খুব দ্রুত বেগে—ধরা যাক ঘণ্টায় 300 মাইল বেগে—বাতাস টেনে নেওয়া হয়। তারপর কম্প্রেসারের সাহায্যে বাতাসকে সঙ্কুচিত করে হঠাৎ চাপ বৃদ্ধি করা হয়, ঘটনাক্রমে সেখানে 'তাপরুদ্ধ (Adiabatic)' পদ্ধতিতে উত্তপ্ত করে বায়বীয় পদার্থকে প্রায় 200° সেন্টিগ্রেড তাপাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলো 'দাহিকা প্রকোষ্ঠ বা কম্বাশন চেম্বার (Combustion chamber)'-এর মধ্য দিয়ে বাতাসকে সঞ্চালিত করা হয় এবং ভেঞ্চুরি ক্রিয়ার (ventury effect) ফলে এই সময় তাপমান এবং জ্বালানী প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎপন্ন ও নলপথে পশ্চাৎগামী বায়বীয় পদার্থের গতিবেগ আরও

বেড়ে যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে এখানে 'তাপীয় প্রসারণ (Thermal expansion)'-এর ফলে সঙ্কীর্ণ নলপথগামী গ্যাসের চাপ কিছুটা হ্রাস পায়, কিন্তু গ্যাসের গতিবেগ খুব বেড়ে যায়। জেট্ এক্সহষ্টের প্রান্তভাগ বা 'নজ্‌ল্ (Nozzle)' শঙ্কুর আকারের হবার জন্য সেখানে 'ভেঞ্চুরি ক্রিয়া (Venturi effect)' হয় এবং শঙ্কুপথে নিষ্ক্রান্ত গ্যাসের চাপ আবার বৃদ্ধি পায়—ফলে বায়ুমণ্ডলে বাতাস প্রক্ষিপ্ত হবার সময় গ্যাসের গতিবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় প্রায় 600 মাইল। এই বর্ধিত গতিবেগ বিমানটিকে আনুপাতিক ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে দেয়।

একটি টারবোজেট-এঞ্জিনের এই ধাক্কা দুভাবে বাড়ানো যায়—(i) প্রবাহিত বায়ুর পরিমাণ বাড়িয়ে, এবং (ii) পশ্চাৎ-প্রজ্বলন (after burning) বাড়িয়ে।

বিমান যত উঁচুতে উঠে টারবোজেট এঞ্জিনের দক্ষতা তত বাড়ে। উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের চাপ এবং তাপ ক্রমশঃ কমতে থাকে, ফলে টারবাইনের ভিতরে বাতাসের সম্প্রসারণ বাড়তে থাকে। আর সম্প্রসারিত বাতাস যখন শাঙ্কব নজলের মধ্য দিয়ে প্রক্ষিপ্ত হয় তখন ভেঞ্চুরি ক্রিয়ার জন্য নির্গমনশীল বায়ুস্রোতের চাপ বেড়ে যায়, এবং সেই অনুপাতে বেড়ে যায় বিমানটিকে সামনের দিকে ধাক্কা দেবার বল—অর্থাৎ বিমানটির অগ্রগতি বেড়ে যায়।

কয়েকটি চলিত পদ এবং শব্দ (Some Common Terms)

এঞ্জিনের প্রকৃতি, ক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে কতকগুলো শব্দ এবং পদ যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকেই বলা হয় চলিত শব্দ এবং পদ। তাদেরই কয়েকটি খুব সংক্ষেপে নীচে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

বোর (Bore) বা **রন্ধ্র**: একটি সিলিণ্ডারের ভিতরকার ব্যাস; সাধারণতঃ এই ব্যাস মাপা হয় মিলিমিটার বা ইঞ্চির এককে।

ষ্ট্রোক (Stroke): যে-পথে একটি পিষ্টন আগে-পিছে চলে তার দুই প্রান্তের অন্তর্বর্তী দূরত্বকে ষ্ট্রোক বলে।

টপ ডেড সেন্টার বা টি. ডি. সি. (Top Dead Centre or T. D. C.): পিষ্টনের সবচেয়ে ভিতরে অবস্থিতির জায়গা। প্রজ্বলন প্রকোষ্ঠের সবচেয়ে ভিতরে পিষ্টনের পরিক্রমণ পথের প্রান্ত-অবস্থিতি—যেখানে পিষ্টন মুহূর্তের জন্য স্থির থেকে বিপরীত দিকের পথে তার যাত্রা শুরু করে।

বটম ডেড সেন্টার বা বি. ডি. সি. (Bottom Dead Centre or B. D. C.) ঃ পিষ্টনের সবচেয়ে বাইরে অবস্থিতির জায়গা। প্রজ্বলন প্রকোষ্ঠে পিষ্টন পথের বিপরীত প্রান্তস্থ অবস্থিতি।

সোয়েপ্ট ভল্যুম (Swept Volume) ঃ একটি ষ্ট্রোক সম্পূর্ণ করার সময় একটি পিষ্টন যে ঘন আয়তন জায়গা অতিক্রম করে তার নাম সোয়েপ্ট ভল্যুম। এই ভল্যুম মাপা হয় ঘন লিটার বা ঘন ইঞ্চিতে (cubic litres or inches)।

ক্লিয়ারেন্স ভল্যুম (Clearence Volume) ঃ পিষ্টন যখন সিলিণ্ডারের শীর্ষদেশে অবস্থান করে তখন যতটা জায়গা খালি থাকে তাকে ক্লিয়ারেন্স ভল্যুম বলে। অন্য কথায়, টি.ডি.সি.-তে অবস্থানরত পিষ্টন ও প্রজ্বলন প্রকোষ্ঠের গভীরতম তল (bottom)-এর মধ্যে যে ফাঁক থাকে সেই জায়গার ঘন আয়তনকে বলা হয় ক্লিয়ারেন্স ভল্যুম।

কম্প্রেশন রেশিও বা সি. আর (Compression Ratio or C. R.) **বা সংনমন অনুপাত** ঃ পিষ্টন বটম ডেড সেণ্টারে থাকা কালে যে জায়গা খালি থাকে, সেই জায়গার সঙ্গে পিষ্টন টপ ডেড সেণ্টারে থাকার সময় খালি জায়গার অনুপাতকেই সংনমন অনুপাত বা কম্প্রেশন রেশিও বা সি. আর. বলে। অন্য ভাষায় বলা চলে যে প্রজ্বলন প্রকোষ্ঠের যে মোট আয়তন তার সঙ্গে পিষ্টন টপ ডেড সেণ্টারে থাকা কালীন প্রজ্বলন প্রকোষ্ঠের কার্যকরী আয়তন (অর্থাৎ ক্লিয়ারেন্স ভল্যুম)-এর অনুপাতকে সি. আর. বলে।

অর্থাৎ,

$$\text{সি. আর.} = \frac{\text{সোয়েপ্ট ভল্যুম} + \text{ক্লিয়ারেন্স ভল্যুম}}{\text{ক্লিয়ারেন্স ভল্যুম}}$$

পাওয়ার (Power) **বা শক্তি এবং আশ্ব বা অশ্বশক্তি বা হর্সপাওয়ার** (Horse Power) ঃ এক একক সময়ে যতটা কাজ করা যায় তাকে বলে শক্তি বা পাওয়ার। শক্তির একককে বলে আশ্ব বা অশ্বশক্তি বা হর্সপাওয়ার। এক মিনিট সময়ে 33,000 ফুটপাউণ্ড কাজ করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাই এক হর্সপাওয়ার বা অশ্বশক্তি বা আশ্ব। সাধারণতঃ হর্সপাওয়ারকে সংক্ষেপে লেখা হয় এইচ.পি. (hp)।

ব্রেক হর্সপাওয়ার বা বি. এইচপি. (Break Horse Power or

b. hp) ঃ একটি এঞ্জিনের 'স্তম্ভদণ্ড (shaft)'-কে চালাতে যে পরিমাণ এইচ-পি. (এঞ্জিন উৎপন্ন শক্তি) কাজ করে তাকে বলে ব্রেক হর্সপাওয়ার বা বি. এইচপি.। কোন অন্তঃদহন (internal combustion) এঞ্জিনে স্তম্ভদণ্ডের আবর্তিত হবার গতির উপর বি. এইচপি. নির্ভরশীল—অর্থাৎ গতি যত দ্রুত হবে, বি. এইচপি. তত বেশী হবে।

ইণ্ডিকেটেড হর্সপাওয়ার বা আই. এইচপি. (Indicated Horse Power or i.hp.) ঃ সিলিণ্ডারের ভিতরে দাহ্য গ্যাসগুলো জ্বলনের ফলে যে শক্তি তৈরী হয়, তাকে বলে ইণ্ডিকেটেড হর্সপাওয়ার বা আই. এইচপি.।

ইণ্ডিকেটেড মিন এফেক্টিভ্ প্রেসার বা আই. এম. ই. পি. (Indicated Mean Effective Pressure or i.m.e.p.) ঃ কার্যচক্রের সময় একটি পিষ্টনে প্রদত্ত চাপের গড়কে এই নামে অভিহিত করা হয়।

মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি (Mechanical efficiency) **বা যান্ত্রিক দক্ষতা** ঃ সিলিণ্ডারগুলোতে যে হারে যে শক্তি তৈরী হয় তার শতকরা কতভাগ এঞ্জিন দ্বারা প্রয়োজনীয় কৃতকার্য্য সাধিত হয়, সেই ক্ষমতাকে যান্ত্রিক দক্ষতা বলে। যান্ত্রিক দক্ষতাকে একটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়; সূত্রটি হচ্ছে— $\frac{\text{বি.এইচ.পি.}}{\text{আই.এইচ.পি.}} \times 100$।

ব্রেক্ এম.ই.পি. (Brake m.e.p.) ঃ একটি পিষ্টনের কার্যকর ষ্ট্রোকের সময় পিষ্টনটির উপর প্রদত্ত চাপকে ব্রেক্ এম.ই.পি. বলে। এটি নির্ণয় করা হয় সাধারণতঃ আই.এম.ই.পি.-র সঙ্গে যান্ত্রিক দক্ষতা গুণ করে।

এবার কয়েক শ্রেণীর মিগ বিমানের কিছু বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সকল শ্রেণীর মিগ বিমানের উৎস রাশিয়া (USSR)।

প্রজাতির নাম ঃ **মিগ-19, জে-6 'ফার্মার'**

শ্রেণী ঃ এক আসনবিশিষ্ট ফাইটার, আক্রমণ ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে পারে, এবং সম্মুখ-যুদ্ধে খুবই তৎপর।

এঞ্জিন ঃ দুটো টুমানস্কি (Tumanskii) R-9BF-811 টার্বোজেট—

প্রতিটিতে পশ্চাৎ-প্রজ্বলন পদ্ধতিতে 3,250 কে.জি. অর্থাৎ 7,167 পাউণ্ড থ্রাষ্ট তৈরী হতে পারে।

দৈর্ঘ্য : 12·6 মিটার বা 41·33 ফুট।

স্প্যান বা দুই প্রধান ডানার দুই প্রান্তবিন্দুর মধ্যেকার সরল রৈখিক দূরত্ব : 9·2 মিটার বা 30·28 ফুট।

উচ্চতা : 3·88 মিটার বা 12·73 ফুট।

পাখার ক্ষেত্রফল (Wing Area) : 25 বর্গমিটার বা 269·1 বর্গফুট

ওজন :

(i) খালি অবস্থায় : 5,760 কে.জি. অর্থাৎ 12,700 পাউণ্ড ;

(ii) ভর্তি অবস্থায় : 8,965 কে.জি. বা 19,764 পাউণ্ড ;

(iii) সর্বোচ্চ ওজন বহন ক্ষমতা : 10,000 কে.জি. বা 22,046 পাউণ্ড।

গতি :

(i) সর্বোচ্চ গতি (পরিষ্কার উচ্চাকাশে) : প্রতি ঘণ্টায় 1540 কি.মি. বা 957 মাইল ;

(ii) শত্রুঅন্বেষণের গতি (cruising speed) : প্রতি ঘণ্টায় 950 কি.মি. বা 590 মাইল ;

(iii) উঠা এবং নামার গতি : 25 মিটার বা 82 ফুট।

উর্ধ্বাকাশে উচ্চতম সীমা (Ceiling) : 30,000 ফুটেরও উপরে।

হাতিয়ার :

(i) তিনটি 30 মি.মি. ব্যাসবিশিষ্ট নুডেলমানন (Nudelmann) বা সংক্ষেপে NR-30 কামান, এবং প্রতিটি কামানের জন্য 80টি করে গোলা ;

(ii) 4টি এয়ার টু এয়ার (Air to Air) মিজাইল্ বা সংক্ষেপে AAM ;

(iii) 227 কে.জি. (500 পাউণ্ড) পর্যন্ত বোমা ;

(iv) রকেট এবং রকেট প্রক্ষেপক (Rocket launcher)।

উল্লেখ্য

ওয়ারশ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সব কয়টি রাষ্ট্র, আফগানিস্থান, অ্যাংগোলা, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, বাংলাদেশ, চীন, মিশর, ইরাণ, ইরাক, পাকিস্তান, কাম্পুচিয়া, ট্যাঞ্জানিয়া, ভিয়েৎনাম, জিম্বাবোয়ে, ইত্যাদি প্রায় 25টি রাষ্ট্রে

সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক এই প্রজাতির বিমান সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রজাতির নাম : **মিগ-21 জে-7 'ফিশবেড'**

শ্রেণী : অধিকাংশই ফাইটার, কিছু অবশ্য ফাইটার/বোম্বার—পর্যবেক্ষণের কাজও করতে পারে।

ভারতে যে ধরনের MiG-21 বিমান ব্যবহৃত হয়, তাঁর নাম MiG-21 (bis)।

এঞ্জিন : সাধারণতঃ 5,100 কে. জি. (11,243 পাউণ্ড) থ্রাষ্ট ক্ষমতার একটি টুমানস্কি R-11 টার্বোজেট পশ্চাৎ-প্রজ্বলন (after burning) ব্যবস্থাসম্পন্ন এঞ্জিন থাকে। কিন্তু MiG-21 (bis) শ্রেণীর বিমান থাকে 7,500 কে. জি. (16,535 পাউণ্ড) থ্রাষ্ট ক্ষমতার একটি টুমানস্কি R-25 এঞ্জিন।

দৈর্ঘ্য : 15·76 মিটার বা 51·71 ফুট।

স্প্যান : 7·15 মিটার বা 23·46 ফুট।

উচ্চতা : 4·1 মিটার বা 13·45 ফুট।

পাখার ক্ষেত্রফল : 23 বর্গমিটার বা 247·57 বর্গফুট।

ওজন :

(i) খালি অবস্থায় : 5,634 কে. জি. বা 12,440 পাউণ্ড ;

(ii) ভর্তি অবস্থায় : 8,200 কে. জি. বা 18,078 পাউণ্ড ;

(iii) সর্বোচ্চ ক্ষমতা : 9,400 কে. জি. বা 20,725 পাউণ্ড।

গতি :

সর্বোচ্চ গতি : 36,000 ফুট বা 11,000 মিটার উচ্চতায় পরিষ্কার আকাশে প্রতি ঘণ্টায় 2230 কি. মি. বা 1385 মাইল বা ম্যাক্ 2·1 (Mach 2·1)।

উর্ধ্বাকাশে উচ্চতম সীমা (Ceiling) : 50,000 ফুটের অর্থাৎ 15,240 মিটারের উপরে, তবে সাধারণতঃ 40,000 ফুটের উপরে উঠে না।

সবচেয়ে বেশী পাল্লা (Maximum range) **:** 118 কি.মি.।

হাতিয়ার :

(i) একটি, দুটি, কখনও বা তিনটি NR 30 কামান, এবং প্রতিটি কামানের জন্য 200 গোলা ;

(ii) দুটো AAM অথবা রকেট ;

(iii) কয়েকটি এয়ার টু সার্ফেস (Air to surface) মিসাইল বা ASM ;

(iv) 1500 কে.জি. (3,307 পাউণ্ড) পর্যন্ত বোমা, এবং আরও কিছু কিছু হাতিয়ার।

উল্লেখ্য

এই শ্রেণীর বিমান প্রথমে রাশিয়ায় তৈরী হয় ; বর্তমানে রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতেও তৈরী হচ্ছে। ভারতে অবশ্য বিমানটির কিছু রূপান্তর করা হয়েছে—ভারতে তৈরী বিমানশ্রেণীটির নাম রাখা হয়েছে মিগ-21 বিস বা MiG-21 bis।

প্রজাতির নাম : **মিগ-23**

শ্রেণী : আক্রমণসহ বহুরকম ভূমিকা পালনযোগ্য ফাইটার।

এঞ্জিন : অধিকাংশ মিগ-23 বিমানে থাকে 12,5000 কে. জি. (27,560 পাউণ্ড) পুষ্ট ক্ষমতার একটি R-29 টুমানস্কি পশ্চাৎ-প্রজ্বলন (after burning) ব্যবস্থাসহ টার্বোজেট এঞ্জিন।

দৈর্ঘ্য : 16·8 মিটার বা 55·1 ফুট।

স্প্যান : 72° ডিগ্রী 'সুইপ'-যুক্ত প্রধান ডানার ক্ষেত্রে 8·17 মিটার বা 26·8 ফুট, কিন্তু 16° ডিগ্রী 'সুইপ'-যুক্ত প্রধান ডানার ক্ষেত্রে 14·25 মিটার বা 46·75 ফুট।

উচ্চতা : 4·35 মিটার বা 14·33 ফুট।

পাখার ক্ষেত্রফল : 28·00 বর্গমিটার বা 301·4 বর্গফুট।

ওজন :

(i) খালি অবস্থায় : 11,000 কে. জি. বা 24,250 পাউণ্ড ;

(ii) ভর্তি অবস্থায় : 15,600 কে. জি. বা 34,390 পাউণ্ড ;

(iii) সর্বোচ্চ ক্ষমতা : 20,100 কে. জি. বা 44, 312 পাউণ্ড।

গতি :

সর্বোচ্চ গতি : পরিষ্কার উচ্চাকাশে প্রতি ঘণ্টায় 2,500 কি. মি. বা 1553 মাইল বা 'ম্যাক্ 2·35 (Mach 2·35)'।

উর্ধাকাশে উচ্চতম সীমা : 18,600 মিটার (61,000 ফুট) পর্যন্ত উঠতে পারে।

হাতিয়ার :

(i) একটি 23 মি. মি. ব্যাসযুক্ত কামান এবং তার জন্য 200 গোলা ;

(ii) 6টি AAM মানে আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ;

(iii) 2টি ASM মানে বিমান থেকে স্থলে আক্রমণ করার জন্য 2টি ছোট কামান বা মেশিনগান।

উল্লেখ্য

বর্তমানে আলজিরিয়া, কিউবা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইরাক, লিবিয়া, সুদান, সিরিয়া, ভিয়েৎনাম, ভারত এবং ওয়ারশ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সব কয়টি রাষ্ট্রে এই বিমান ব্যবহৃত হচ্ছে। আরো অনেক দেশ এই শ্রেণীর বিমান কিনতে আগ্রহী।

প্রজাতির নাম : **মিগ-25 'ফক্সব্যাট'**

শ্রেণী : ইন্টারসেপ্টার—অর্থাৎ আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে শত্রু-বিমানকে বাধা দিয়ে ধ্বংস করার তৎপরতা সম্পন্ন বিমান, এবং বহুমুখী পর্যবেক্ষক ; উচ্চাকাশে কার্যক্ষম।

এঞ্জিন : দুটো টুমানস্কি R-31 পশ্চাৎ-প্রজ্জ্বলন ব্যবস্থাসম্পন্ন টার্বো-জেট—যেগুলোর প্রতিটি পশ্চাৎ-প্রজ্বলন পদ্ধতিতে 12,250 কে. জি. (27,010 পাউণ্ড) থ্রাষ্ট তৈরি করতে পারে।

দৈর্ঘ্য : 23·82 মিটার বা 78·15 ফুট।

স্প্যান : 13·95 মিটার বা 45·75 ফুট।

উচ্চতা : 6·10 মিটার বা 20 ফুট।

পাখার ক্ষেত্রফল : 56·83 বর্গমিটার বা 611·7 বর্গফুট।

ওজন :

(i) খালি অবস্থায় : 20,000 কে. জি. বা 44,090 পাউণ্ড ;

(ii) ভরা অবস্থায় : 36,200 কে. জি. বা 79,800 পাউণ্ড।

গতি :

(i) নিম্ন উচ্চতায় : প্রতিঘণ্টায় 1050 কি. মি. বা 650 মাইল বা বা ম্যাক্ 0·85 (Mach 0·85) ;

(ii) 11,000 মিটার বা তার চেয়ে বেশী উচ্চতায় : প্রতি ঘণ্টায়

13,400 কি. মি. বা 2,115 মাইল বা 'ম্যাক্ 3·2 (Mach 3·2)'।

উর্ধ্বাকাশে উচ্চতম সীমা : সাধারণত: 24,400 মিটার বা 80,000 ফুট, তবে কতগুলো প্রকরণ (variety) 27,000 মিটার বা 88,580 ফুট পর্যন্ত উঠে।

হাতিয়ার :

চারটি AAM, মানে আকাশ থেকে আকাশপথে প্রক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র।

উল্লেখ্য

(i) এই শ্রেণীর বিমান ক্ষিপ্রতম যুদ্ধবিমান ;

(ii) এই শ্রেণীর বিমানকে দূরপাল্লার ইণ্টারসেপ্টার এবং বহুমুখী পর্যবেক্ষণ (multisensor strategic reconnaissance) বিমান বলা হয় ;

(iii) রাশিয়ায় চার রকমের মিগ-25 বিমান ব্যবহার করে, যথা : মিগ-25, মিগ-25R, মিগ-25U এবং মিগ-25M ; ভারত ব্যবহার করে মিগ-25R এবং মিগ-25U, কিন্তু আলজিরিয়া, লিবিয়া এবং সিরিয়াতে ব্যবহৃত হয় মিগ-25 ও মিগ-25R।

প্রজাতির নাম : মিগ-29 'ফালক্রাম'

শ্রেণী : বহুমুখী আক্রমণক্ষম ফাইটার।

এঞ্জিন : দুটো এঞ্জিন—প্রতিটিই পশ্চাৎ-প্রজ্বলন পদ্ধতিতে 7,500 কে. জি. (16,535 পাউণ্ড) থ্রাষ্ট তৈরি করতে পারে।

দৈর্ঘ্য : 15·5 মিটার বা 50·83 ফুট।

স্প্যান : 12 মিটার বা 39·3 ফুট।

উচ্চতা : 4·9 মিটার বা 16 ফুট।

পাখার ক্ষেত্রফল : 35·5 বর্গমিটার বা 380 বর্গফুট।

ওজন :

(i) খালি অবস্থায় : 8,200 কে. জি. বা 18,000 পাউণ্ড ;

(ii) ভর্তি অবস্থায় : 12,700 কে. জি. বা 28,000 পাউণ্ড ;

(iii) সর্বোচ্চ ক্ষমতা : 4000 কে. জি. অস্ত্রসজ্জার ওজন সহ 16,700 কে. জি. বা 36,800 পাউণ্ড।

গতি ঃ

সর্বোচ্চ গতি ঃ পরিষ্কার উচ্চাকাশে প্রতি ঘণ্টায় 2,450 কি. মি. বা 1520 মাইল।

হাতিয়ার ঃ

(i) ছয়টি AAM এবং একটি প্রান্তীয় অনুভূতিগ্রহণযোগ্য যন্ত্র ;

(ii) 4,000 কে. জি. বা 8,820 পাউণ্ড পর্যন্ত ওজনের হাতিয়ার বহন করতে পারে ;

(iii) একটি মেশিনগান থাকতে পারে।

উল্লেখ্য

আকৃতিগত কারিগরিতে এবং দক্ষতায় এই শ্রেণীর বিমান মিগ-25 থেকে অনেক উন্নত, অনেকে অনুমান করছেন এই শ্রেণীর বিমান মিগ-25 এর উপযোগিতা কমিয়ে দেবে।

ভারতে এইচ. এ. এল. (H. A. L.)-এর কারখানায় এই শ্রেণীর বিমানের অংশগুলো সংযোজিত করে পুরো বিমান তৈরী হত। তবে রাশিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে যাতে দেশীয় উপকরণের সাহায্যে ভারতেই এই বিমান তৈরি করা চলে।

প্রজাতির নাম ঃ **মিগ-31 'ফক্সহাউণ্ড'**

শ্রেণী ঃ দূরপাল্লার ইণ্টারসেপ্টার।

এঞ্জিন ঃ পশ্চাৎ-প্রজ্বলন পদ্ধতিযুক্ত দুটো বড় টার্বোজেট।

দৈর্ঘ্য ঃ 25·57 মিটার বা 83·89 ফুট।

স্প্যান ঃ 14 মিটার বা 45·87 ফুট।

উচ্চতা ঃ 6·1 মিটার বা 20 ফুট।

পাখার ক্ষেত্রফল ঃ 57 বর্গমিটার বা 615 বর্গফুট।

ওজন ঃ

(i) খালি অবস্থায় ঃ 21,500 কে. জি. বা 47,400 পাউণ্ড ;

(ii) পুরো ভর্তি অবস্থায় ঃ 41,000 কে. জি. বা 90,400 পাউণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

গতি ঃ

সর্বোচ্চ গতি ঃ প্রতি ঘণ্টায় 25,53 কি. মি. বা 1,586 মাইল

বা 'ম্যাক্ 2·4'।

ঊর্ধ্বাকাশে উচ্চতম সীমা ঃ 23,000 মিটার (75,500 ফুট) পর্যন্ত এই শ্রেণীর বিমান উঠতে পারে।

হাতিয়ার ঃ আটটি AAM।

উল্লেখ্য

এই শ্রেণীর বিমান যেমন খুব উঁচুতে কাজ করতে পারে তেমনি সমুদ্র-পৃষ্ঠেও কার্যকর। এই শ্রেণীর একটি বিমান একই সঙ্গে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালাতে পারে।

জলযুদ্ধের অস্ত্রবাহক

বর্তমান যুগে সমুদ্রপথের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এখন কোন রাষ্ট্রই বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া বাঁচতে পারে না—আর বিদেশের সঙ্গে পণ্যের লেনদেন প্রধানতঃ হয় সমুদ্রপথে। কাজেই সমুদ্রপথের উপর যে-রাষ্ট্রের আধিপত্য যত বেশী, সে-রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের নিরাপত্তা—অন্য ভাষায় আর্থিক ভারসাম্যের নিশ্চয়তা তত সুদৃঢ়। সহজ কথায় নৌযুদ্ধের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে।

সাবমেরিন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই নৌযুদ্ধে সাবমেরিন-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ নৌযুদ্ধে অন্যতম ভয়ানক অস্ত্রবাহক হচ্ছে সাবমেরিন। যখন তখন সাবমেরিন জলের গভীরে লুকিয়ে আশ্রয় নিতে পারে বলে সাবমেরিনকে ঘায়েল করা কষ্টসাধ্য। জলের গভীরে নেমে গিয়েও সাবমেরিন মোটামুটি দ্রুতগতিতে চলাফেরা করতে পারে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসমান শত্রুপক্ষের বাণিজ্যপোত ও যুদ্ধ-জাহাজ আক্রমণ করতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক যে সমুদ্রপৃষ্ঠে যে গতিতে একটি সাবমেরিন চলতে পারে, সমুদ্রের গভীরে ঠিক তত তাড়াতাড়ি এই জলযানটি চলতে পারে না—কেননা জলের প্রতিবন্ধকতা বাতাসের প্রতিবন্ধকতার চাইতে বেশী জোরদার। প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন চেষ্টা করছে আপন আপন নৌবাহিনীতে অধিকসংখ্যক এবং বহুপ্রকারের সাবমেরিন সংযোজিত করতে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে পারমাণবিক শক্তিতে চালিত

সাবমেরিন (Nuclear Submarine) উদ্ভাবিত হবার পর একটা ধারণা তৈরী হয়েছিল যে অন্যান্য প্রথাগত এঞ্জিনের শক্তিতে চালিত সাবমেরিনের সামরিক উপযোগিতা ও কদর কমে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে পারমাণবিক সাবমেরিন (Nuclear Submarine)-এ বলীয়ান রাষ্ট্রগুলোও অন্যান্য এঞ্জিনচালিত বহুশ্রেণীর সাবমেরিন আপন আপন নৌবহরে সংযোজিত করছে। তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিটি শ্রেণীর সাবমেরিনেরই নিজ নিজ সামরিক ভূমিকায় যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। সব কয়টি উন্নত রাষ্ট্র এবং কয়েকটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র অবশ্য সকল শ্রেণীর সাবমেরিনেরই যান্ত্রিক কুশলতা বাড়াতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অনলসভাবে।

সাধারণতঃ চার রকম সামরিক কাজে সাবমেরিন ব্যবহৃত হয়, যথা: (i) সমুদ্রে প্যাট্রল (patrol) বা ঘুরেফিরে প্রহরা দিতে, (ii) শত্রুপক্ষের জলযান আক্রমণ করতে, (iii) সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় এবং শত্রুরাষ্ট্রের বন্দর-পোতাশ্রয়-বেলাভূমির কাছে 'মাইন (Mine)' স্থাপন করতে, এবং (iv) স্বরাষ্ট্রের বন্দর-পোতাশ্রয়-সাগরসৈকতে প্রহরা দিয়ে নিরাপদ রাখতে।

সাবমেরিনের প্রচালন (Propulsion of Submarine)

সাধারণতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠে ডিজেল (diesel) এঞ্জিনের সাহায্যে সাবমেরিন চলে। এই এঞ্জিনের সাহায্যেই ডাইনামো (dynamo) ঘুরিয়ে বিদ্যুতশক্তি সঞ্চয়কারী ব্যাটারিগুলোকে আধানিত (charged) করা হয়। এই ব্যাটারিগুলো তৈরি করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যেন ব্যাটারির সেলগুলো থেকে কোনমতেই অ্যাসিড চুঁইয়ে বা অন্য কোনভাবে বেড়িয়ে গিয়ে জ্বালানী ট্যাংক (fuel tank) বা ব্যালাষ্ট (ballast) ট্যাংক-গুলোর অথবা সাবমেরিনের খোল বা হাল (hull)-এর সংস্পর্শে যেতে না পারে। কেননা সাধারণতঃ সাবমেরিনের খোল এবং ঐ ট্যাংকগুলো তৈরী হয় ইস্পাত দিয়ে। আর অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে ইস্পাত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—এবং ঐ ক্ষয়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে শেষ পর্যন্ত ছিদ্র হয়ে যেতে পারে।

আভ্যন্তরিণ দহন বা ইণ্টারনাল কম্বাশন (Internal Combustion) এঞ্জিনে বাতাসের সরবরাহ থাকা আবশ্যক। কিন্তু সাবমেরিন যখন জলের

গভীরে চলে যায় তখন বাতাস সরবরাহ করা যাবে কিভাবে? এখানে বলে রাখা দরকার যে, সাবমেরিনের ডায়নামোগুলো এমনভাবে গঠিত যে ভিন্ন প্রয়োজনে সেগুলো মোটর হিসাবে কাজ করতে পারে। তাই তখন ব্যাটারির বিদ্যুতের সাহায্যে ডায়নামোগুলো বৈদ্যুতিক মোটর (electric motor)-এর কাজ করে এবং জলের গভীরে সাবমেরিনকে চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। সাবমেরিনের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত প্রচালক যন্ত্রপাতি (propelling machinery) ও প্রচালিকা স্তম্ভদণ্ড (propeller shaft)-গুলোর সঙ্গে এই মোটরগুলো সংযুক্ত থাকে। বৈদ্যুতিক মোটর বা তেলের এঞ্জিন (oil engine) স্তম্ভদণ্ডের মাথায় লাগানো ক্লাচ (clutch)-এর সাহায্যে প্রচালিকা স্তম্ভদণ্ডগুলোকে এককভাবে বা যৌথভাবে চালিত করে।

আবার সাবমেরিন যখন সমুদ্রপৃষ্ঠে ভেসে উঠে তখন স্তম্ভদণ্ডগুলোর সঙ্গে এঞ্জিনগুলোর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন ডিজেল এঞ্জিনগুলো বৈদ্যুতিক ব্যাটারিগুলোকে পুনরায় আধানিত করে।

এই পদ্ধতির প্রচালনকে 'তৈল-বৈদ্যুতিক বা ডিজেল-ইলেকট্রিক (Diesel-Electric)' প্রচালন বলে। আজকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রে তৈরী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সাবমেরিনে নানা 'আশ্ব বা হর্সপাওয়ার (hosepower)' শক্তির এক বা একাধিক ডিজেল এঞ্জিন, বিভিন্ন কিলোওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ এবং এক বা একাধিক স্তম্ভদণ্ড ব্যবহার করে সাবমেরিন চালাবার যান্ত্রিক ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে।

সাবমেরিন জলের গভীরে যায় কিভাবে (How a submarine submerges)

সাবমেরিন খুব তাড়াতাড়ি জলের গভীরে ডুবে যেতে পারে এবং এই কাজে বেশী সময়ও লাগে না। কোন কোন সাবমেরিন তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই নির্ধারিত গভীরতায় ডুবে যেতে পারে। একটি সাবমেরিন জলে ভাসে তার দেহের ভিতরে ঢোকানো বাতাসের সাহায্যে। সাবমেরিনের দেহের অভ্যন্তরের অনেকখানি জায়গাই অধিকার করে থাকে 'প্লবতা বা বয়েন্সী (buoyancy)' ট্যাংক। এই ট্যাংকগুলোকে জলে ভর্তি করলে সাবমেরিন ভারী হয় এবং জলের গভীরে চলে যায়। ট্যাংকগুলোতে ভরা

জলের ওজনের উপর নির্ভর করে সাবমেরিনটি কত গভীরে যেতে পারবে। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে কোন ঘনবস্তু (solid) জলে পড়লে কিছু পরিমাণ জলকে সে স্থানচ্যুত করে ; ঐ স্থানচ্যুত জলের ওজন যদি ঘনবস্তুটির ওজনের চাইতে কম হয় তবে কঠিন বস্তুটি ডুবে যাবে ; আর যদি স্থানচ্যুত জলের ওজন কঠিন বস্তুটির ওজনের চাইতে বেশী হয় তাহলে ঘনবস্তুটির জলে আংশিক নিমজ্জিত অংশ ভেসে থাকে। যদি বয়েন্সী ট্যাংকে ভরা জলের পরিমাণ এমন হয় যে ঐ জলসহ সাবমেরিনটির ওজন সমুদ্রের নির্দিষ্ট গভীরতায় সাবমেরিন দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজনের সমান হয়, তাহলে সাবমেরিনটি এই স্বাভাবিক অবস্থায় সেই নির্দিষ্ট গভীরতার অধিক যেতে পারবে না।

বাতাস এবং জলের ভাল্‌ভ্‌ (Air and Water Valves) **:** বয়েন্সী ট্যাংকের উপরে ও নীচে ভাল্‌ভ্‌ থাকে—উপরেরটি বাতাসের জন্য, আর নীচেরটি জলের জন্য। একটি সাবমেরিন যখন সমুদ্রপৃষ্ঠে চলাফেরা করে তখন নীচের ভাল্‌ভ্‌ খোলা থাকে এবং উপরের ভাল্‌ভ্‌ বন্ধ থাকে। নীচের ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে জল ট্যাংকের ভিতরে প্রবেশ করে যে পর্যন্ত না ভাল্‌ভের মুখে নিম্নমুখী চাপ সমতলে অবস্থিত বাইরের সমুদ্রজলের গভীরতায় চাপের সমান চাপ সৃষ্টি করে। সাবমেরিনটিকে জলের গভীরে যেতে হলে উপরের ভাল্‌ভ্‌টি খুলে দেওয়া হয় এবং ঐ পথ দিয়ে ট্যাংকের ভিতরের বাতাস বেরিয়ে যায়, আর নীচের খোলাপথ দিয়ে জল ট্যাংকের ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে। বৈদ্যুতিক মোটরগুলো চালু হয়, হ্যাচ্‌ (hatch) বা অর্ধদ্বার বন্ধ হয়ে যায়, এবং সাবমেরিনটি দ্রুতগতিতে জলের গভীরে চলে যায়।

সাবমেরিনটি জলের গভীরে চলে গেলে উপরের ভাল্‌ভ্‌গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার সাবমেরিনটিকে জলের উপরে ভাসাতে হলে উপরের ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে সঙ্কুচিত বাতাস (compressed air) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্কুচিত বাতাস হঠাৎ ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি প্রসারিত হতে চায়, আর তার ফলে ট্যাংকের জলের উপর চাপ পড়ে। বাতাসের ঐ চাপের ফলে নীচের ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে জল ট্যাংকের বাইরে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ট্যাংক থেকে যত জল বেরিয়ে যাবে সাব্‌মেরিনের ওজন তত কমবে ; এবং সাব-মেরিনটি উপরের দিকে উঠতে থাকবে। প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত যে বয়েন্সী ট্যাংকগুলোর পাশেই কতকগুলো সিলিণ্ডারের মধ্যে সঙ্কুচিত বাতাস

সংগৃহীত থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠে সাবমেরিন ভেসে উঠলে ঐ সিলিণ্ডারগুলোতে পুনরায় উচ্চচাপে বাতাস ভরা হয়।

সাবমেরিনের 'কোনিং টাওয়ার (Conning tower)' জলের উপর ভেসে উঠলে অর্ধদ্বার বা 'হ্যাচ (hatch)' খুলে দেওয়া হয় এবং পাম্পগুলো বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ু টেনে নিয়ে ভাল্‌ভের মধ্য দিয়ে ট্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। ব্যালাষ্ট ট্যাংকের জলকে একটি ভাল্‌ভের মধ্য দিয়ে ঠেলে পিছনের পাইপ বা 'পুচ্ছনল (tail pipe)'-এ তুলে দেওয়া হয়। আভ্যন্তরীণ ট্যাংকগুলোর সাহায্যেই 'ধনাত্মক প্লবতা বা পজিটিভ বয়েন্সী (positive buoyancy)' বজায় রাখা সম্ভব হয়। পজিটিভ বয়েন্সী বলতে বুঝায় এমন একটি প্লবতা যার সাহায্যে সাবমেরিনের চালক তাঁর প্রয়োজনমত জলের যে কোন গভীরতায় সাবমেরিনকে রাখতে পারেন। মূল চাপ অবশ্য বহন করতে হয় বাইরের সারির ট্যাংকগুলোকে। কোনিং টাওয়ারের মাঝামাঝি উচ্চতায় কতকগুলো ট্যাংক থাকে, তাদের নাম 'স্যাড্‌ল্ (Saddle)' ট্যাংক। সাবমেরিনকে স্থির রাখতে এবং জলের গভীরে নিয়ে যেতে স্যাড্‌ল্ ট্যাংকগুলোর কার্যকর ভূমিকা থাকে। এই ট্যাংকগুলো সরাসরি সমুদ্রের জলের সংস্পর্শে থাকে।

সাবমেরিনকে জলের গভীরে নিয়ে যেতে বা জলে ভাসাতে সাবমেরিনের মোটর এবং হাইড্রোপ্লেন (Hydroplane)-গুলোর ভূমিকা থাকে। হাইড্রোপ্লেনগুলোকে বলা চলে সাবমেরিনের নিমজ্জন-হাল (diving rudder)। মাছের চলনশীল পার্শ্বপাখনার মত হাইড্রোপ্লেনগুলো সাবমেরিনের সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে দুই পাশে লাগানো থাকে। প্রয়োজন মত হাইড্রোপ্লেনগুলোকে হেলিয়ে বা কাত করে জলের গভীরে সাবমেরিনের অবস্থিতি এবং গতিপথ ঠিক করা হয়।

সাবমেরিনকে জলের গভীরে নিয়ে যেতে যৌথভাবে কাজ করে মোটর, হাইড্রোপ্লেন এবং ট্যাংকগুলো। ট্যাংকগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা যায় যে শুধু তাদের সাহায্যেই জলের বিশেষ কোন গভীরতায় সাবমেরিন এঞ্জিন বন্ধ করেও নিজস্ব ভারসাম্য বজায় রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সাবমেরিনের আনুভূমিক দিক নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ হালের মত একটি 'রাডার (rudder)'।

সাবমেরিন জলের গভীরে চলে গেলে 'পেরিস্কোপ (Periscope)' নামক

একটি যন্ত্রের সাহায্যে উপরের দৃশ্য দেখতে পায়। এই যন্ত্রের দেহনলটিকে বাড়ানো-কমানো যায়। সাবমেরিন জলের যত গভীরে যায় পেরিস্কোপের নলটিকে তত লম্বা করতে হয়। এই নলের মাথাটি যতটা সম্ভব সরু করা হয়। স্বভাবতঃই এই নলটিকে সমুদ্রের জলের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে হয়।

পেরিস্কোপের ব্যবহার

একটি পেরিস্কোপে প্রধানতঃ থাকে একটি লম্বা নল—যার দৈর্ঘ্য বাড়ানো-কমানো যায়। নলটির প্রত্যেক প্রান্তের গায়ে উল্লম্বতল বরাবর একটি করে চতুষ্কোণ জানালাপথ খোলা থাকে। জানালা দুটির খোলাতল নলের গায়ের উল্লম্বতলে পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে অবস্থিত। সেখানে একটি করে সমকোণী প্রিজম বসান থাকে। প্রিজমদুটোর আপতন তলের দৃষ্টিপথ জানালার খোলামুখ দিয়ে সমুদ্রতলের সমান্তরাল দুই বিপরীত দিকে প্রসারিত থাকে। নীচের প্রিজমটির মধ্য দিয়ে সাবমেরিনের কম্যাণ্ডার বা অন্যকোন অফিসার সমুদ্রপৃষ্ঠের দৃশ্য দেখতে পান। আলোকের 'আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের নীতি' অনুসরণ করে সমুদ্রপৃষ্ঠের দৃশ্যের প্রতিবিম্ব উপরের প্রিজমটির সাহায্যে নীচের প্রিজমে আসে। নলের মধ্যে রাখা লেন্সের সাহায্যে প্রতিবিম্বকে বিবর্ধিত এবং প্রকট করা হয়। নলের উচ্চতা যেমন বাড়ানো-কমানো যায়, তেমনি পেরিস্কোপে প্রতিবিম্বিত হবার 'দৃশ্যক্ষেত্রের (field of view)' পরিধিও ছোট-বড় করা যায়। পেরিস্কোপের সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের স্কেল লাগানো থাকে—যার সাহায্যে সাবমেরিনটি থেকে দৃশ্যবস্তুর বেয়ারিং সহজেই মাপা যায়।

সাবমেরিনের হাতিয়ার (Weapons in Submarine)

সাবমেরিনে কয়েকটি ছোট কামান থাকলেও সাবমেরিনের মুখ্য হাতিয়ার হচ্ছে 'টর্পেডো (Torpedo)'। টর্পেডোগুলো থাকে 'টর্পেডো টিউব (Torpedo tube)'-এর মধ্যে ; আর ঐ টিউবগুলো থাকে সাবমেরিনের দেহে সাবমেরিনের মূল অক্ষধুরা বা অক্ষ (axis) বরাবর। কাজেই কোন শত্রুজাহাজের প্রতি টর্পেডো ছুঁড়তে হলে সাবমেরিনটির মুখ নির্দেশিত করতে হয় শত্রুজাহাজটির দিকে। এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন—শত্রুর জাহাজটি চলমান এবং সেই জাহাজটির গতিও বাড়ানো

যায়। অতএব যদি শত্রুজাহাজের পিছন বা পাশের দিক থেকে টর্পেডো ছোঁড়া যায় আর শত্রুজাহাজটি গতি হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়, তাহলে টর্পেডোটি শত্রুজাহাজে আঘাত করতে পারবে না। কিন্তু শত্রুজাহাজের সামনের দিক থেকে টর্পেডো ছুঁড়লে সেই সম্ভাবনা কমে যায়। অথচ একেবারে ঠিক সামনের দিক থেকে টর্পেডো ছোঁড়া সব সময় সম্ভব হয় না—তাই শত্রু-জাহাজের গতিপথের সামনের দিকে একটু তেরছাভাবে সাবমেরিনটিকে নিয়ে গিয়ে টর্পেডো ছোঁড়াই বিধেয়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সাবমেরিনটি থেকে শত্রুজাহাজটি সাধারণতঃ বেশ কয়েক মাইল দূরে থাকবে। তাই টর্পেডো ছোঁড়ামাত্রই সেটি শত্রুজাহজকে আঘাত করতে পারছে না—জলের প্রতিবন্ধকতা ও পথের দূরত্ব অতিক্রম করে যেতেও টর্পেডোটির কিছু (কয়েক মিনিট হলেও) সময় নেবে। এই সময়ের মধ্যে শত্রুজাহাজটিও কিছুদূর এগিয়ে যাবে। তাই শত্রুজাহাজটি দেখা গেলে তার গতিপথ, গতিবেগ এবং সাবমেরিন থেকে তার দূরত্ব বুঝে নিতে হয়। তারপর হিসাব করতে হয় যে নিক্ষিপ্ত হবার পর শত্রুজাহাজে পৌঁছতে টর্পেডোটির কতক্ষণ সময় লাগবে। তারপর চলমান শত্রুজাহাজটির গতিপথে শত্রুজাহাজটির কিছুটা সামনের দিকে টর্পেডোর নিশানা ঠিক করতে হয়—যেন একই সময়ে শত্রুজাহাজ এবং নিক্ষিপ্ত টর্পেডোটি সেই জায়গায় পৌঁছোয়।

পোতাশ্রয় থেকে সাবমেরিন বেরিয়ে যাবার আগেই টর্পেডো টিউবের মধ্যে টর্পেডো ভরা হয়। টর্পেডো টিউবে টর্পেডো ভরতে হলে প্রথমেই টিউবের পিছন দিককার-বৃত্তাকার দরজা 'ব্রীচ ব্লক (breech block)' খুলে দিতে হয়। তারপর টর্পেডোর আধার থেকে টর্পেডোটিকে তুলে নিয়ে টিউবটি মধ্যে ভরে দিয়ে টর্পেডোর দরজাটি বন্ধ করে দিতে হয়। টর্পেডো টিউবের সামনের দিকে একটি টুপীর মত ঢাকনা থাকে। ঐ ঢাকনাটি বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণাধীন। টর্পেডো ছোঁড়ার আগে বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে ঐ ঢাকনাটি খোলা হয়, আবার টর্পেডোটি বের হয়ে গেলে ঐ ঢাকনাটি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ পাত্রে নির্দিষ্ট চাপে রাখা সঙ্কুচিত বাতাসের সাহায্যে টর্পেডো ছোঁড়া (Fire) হয়। টিউবের মধ্যে ভরা অবস্থায় টর্পেডোর একটি ট্রিগারে চাপ দিলে টর্পেডোর ভিতরকার যন্ত্রপাতি কাজ করতে শুরু করে এবং টর্পেডোটি টিউব থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে।

সাবমেরিন থেকে একটি টর্পেডো বেরিয়ে যাবার সময় সাবমেরিনটিতে বেশ ঝাঁকানি লাগে, আর টর্পেডোটি বেরিয়ে গেলে সাবমেরিনটি কিছুটা ভারমুক্ত হয়। তাই টর্পেডো ছোঁড়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যে ঐ ঝাঁকুনিতে এবং হঠাৎ কিছুটা ওজন কমে যাওয়ায় সাবমেরিনটি যেন ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠে ভেসে না উঠে।

একটি টর্পেডোর দেহে থাকে অনেক যন্ত্রপাতি আর কিছুটা বিস্ফোরক (explosive)। আসলে টর্পেডোর দেহের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ স্থান অধিকার করে বিস্ফোরক, আর সব জায়গা জুড়ে থাকে নানা রকমের যন্ত্র, যেমন প্রচালন যন্ত্র (driving mechanism), ষ্টীয়ারিং গীয়ার (steering gear), এবং প্লবতা কক্ষ (buoyancy compartment)। টর্পেডো টিউব থেকে বেরিয়ে এসে যাতে সমুদ্রের জলে ডুবে না গিয়ে টর্পেডোটি ভেসে থাকতে পারে তার জন্যই প্লবতা কক্ষ অপরিহার্য।

প্রক্ষিপ্ত টর্পেডোটি সমুদ্রপৃষ্ঠের কিছু নীচ দিয়ে লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হয়। একটি পেণ্ডুলাম এবং একটি 'হাইড্রোষ্ট্যাটিক ভাল্‌ভ্ (hydrostatic valve)'-এর সাহায্যে টর্পেডো জলের মধ্যে নির্দিষ্ট উচ্চতায় চলে। যদি টর্পেডো বেশী নীচে নেমে যায় তাহলে পেণ্ডুলামটি টর্পেডোর দেহের পাখনাগুলোর নতি পরিবর্তন করে টর্পেডোটিকে উঠিয়ে দেয়। আর টর্পেডোটি যদি প্রয়োজনীয় গভীরতা ছেড়ে উপরে উঠে যায় তখন হাইড্রোষ্ট্যাটিক ভাল্‌ভ্‌টি আবার পাখনাগুলোর নতি উপযুক্ত দিকে পরিবর্তিত করে টর্পেডোটিকে নীচে নামিয়ে দেয়।

কিন্তু জলের মধ্যে কেবল নির্দিষ্ট উচ্চতায় টর্পেডোটিকে রাখলেই ত চলবে না—টর্পেডোটিকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়েও যেতে হবে। এই কাজটি করে টর্পেডোর হালের সঙ্গে সংযুক্ত 'জাইরোস্কোপ (gyroscope)'। জাইরোস্কোপে একটি ছোট 'গতিনিয়ামক চক্র বা ফ্লাই হুইল (fly wheel)' থাকে। এই চক্রটি স্বাধীনভাবে আবর্তিত হতে পারে। টর্পেডো টিউব থেকে টর্পেডো ছোঁড়ার সময়ই একটি স্প্রিং খুলে ফেলে এবং সঙ্কুচিত হাওয়া ঠেলে দিয়ে গতিনিয়ামক চক্রটিকে আবর্তিত করা হয়। এক সেকেণ্ডের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে গতিনিয়ামক চক্রটি যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে আবর্তিত হতে থাকে এবং ষ্টীয়ারিং গীয়ারটির কাজ শুরু হয়ে যায়।

জাইরোস্কোপ কীভাবে টর্পেডোর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে ? কাজটি সোজা।

যে কোন ঘুর্নায়মান চক্র যে অক্ষপথে থেকে আবর্তিত হতে শুরু করে সেই অক্ষপথ থেকে চক্রটিকে সহজে সরানো যায় না। আবর্তনকারী চক্রটি আপন অক্ষপথ ধরেই এগোতে থাকে। গতিনিয়ামক চক্রটিও একটি আবর্তনকারী চক্র—টর্পেডো টিউব থেকে টর্পেডো প্রক্ষেপনের সময় যে-অক্ষপথে টর্পেডোটি বসানো হয়, গতিনিয়ামক চক্রটি সব সময় সেই অক্ষ-পথেই টর্পেডোটিকে নিয়ে যায়। যদি কখনও টর্পেডো আপন কক্ষপথ থেকে সরে যায় তাহলেই জাইরোস্কোপ একটি 'ক্যাম (cam)'-এ ধাক্কা খাবে। ক্যাম হচ্ছে এমন একটি যন্ত্রাংশ যা চক্রাকার গতিকে সরল গতিতে পরিবর্তিত করে। ক্যাম একটি ছোট 'ঠেলা ঢাকনি বা স্লাইড ভাল্‌ভ্ (slide valve)'কে ধাক্কা দেয়। ঐ ঢাকনিটি সরে গিয়ে ষ্টীয়ারিং সিলিণ্ডারে বায়ু ঢুকিয়ে দেয়। বায়ুর চাপে 'উল্লম্ব হালগুলো (vertical rudder)' নড়াচড়া করে। তার ফলে টর্পেডোটি আবার আপন অক্ষপথে এসে যায়।

টর্পেডোর এঞ্জিন চালাবার জন্য নূতন নূতন সব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রথমে এঞ্জিনটি চলত সঙ্কুচিত বাতাসের সাহায্যে, পরে প্রয়োগ করা হল 'অত্যন্ত উত্তপ্ত বাষ্প (super-heated steam)'।

যে-মুহূর্তে টর্পেডোর ছুঁচলো নাক কোন একটি শক্ত পদার্থে আঘাত করে সেই মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে—আঘাতের সঞ্চারিত বল বা সংঘর্ষ (impact) যদি খুব বেশী না হয় তাহলে অবশ্য বিস্ফোরণ ঘটে না। ভারী লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সজোরে সংঘর্ষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ ঘটে বলে টর্পেডো শত্রু-জাহাজের ইস্পাতের চাদর ভেদ করতে পারে না; কিন্তু শত্রুজাহাজের তলদেশে বিস্ফোরণ ঘটবার ফলেই জাহাজে আগুনও লাগে এবং কোন কোন অংশ ফেটে যায়—আর ঐ ফাটল দিয়ে সবেগে সমুদ্রের জল শত্রু-জাহাজে ঢুকে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত জাহাজটি ডুবে যায়।

আজকাল বিভিন্ন বর্গের সাবমেরিনে ভিন্ন ভিন্ন মাপের নানাসংখ্যক টর্পেডো থাকে।

কিছু কিছু সাবমেরিন পারমাণবিক শক্তিতে চালিত হয়—তাদের বলে 'নিউক্লীয়ার পাওয়ার্ড (Nuclear powered)' সাবমেরিন বা পারমাণবিক শক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ। এই সব সাবমেরিনে টর্পেডো ছাড়াও নানাবিধ 'নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বা গাইডেড মিসাইল' থাকে।

আধুনিক কয়েক প্রকার সাবমেরিনের কিছু যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নীচে বলা হল।

অ্যাগোষ্টা শ্রেণী (Agosta class)

কোন দেশে প্রথম তৈরী হয়ঃ ফ্রান্স

প্রকৃতি (type)ঃ আক্রমণাত্মক—এক আঘাতে খতম করার সম্ভাব্য যোগ্যতাসম্পন্ন।

দৈর্ঘ্যঃ 6·76 মিটার বা 221'7 ফুট

বীম (beam)ঃ 6·8 মিটার বা 22·3 ফুট

পোত নিমজ্জিত হবার যোগ্য জলের গভীরতা বা ড্রাফ্‌ট (drought)ঃ 5·4 মিটার বা 17·7 ফুট

প্রচালন (Propulsion)

(i) 3,600 বি.এইচপি (b.hp) ক্ষমতাযুক্ত দুটি ডিজেল এঞ্জিন, (ii) 4,600 আশ্ব (hp) ক্ষমতাযুক্ত বৈদ্যুতিক এঞ্জিন, (iii) একটি স্তম্ভদণ্ড (shaft)

গতি (i) ভাসমান অবস্থায় 12 নট্‌

(ii) সমুদ্রের গভীরে 20 নট্‌

কতটা জল স্থানচ্যুত করতে পারে

(i) সমুদ্রপৃষ্ঠেঃ 1,450 টন

(ii) সমুদ্রের গভীরেঃ 1,725 টন।

হাতিয়ারঃ 533 মি.মি. (21·0 ইঞ্চি) ব্যাস সমন্বিত চারটি টর্পে'ডো টিউব এবং মোট 24টি টর্পে'ডো

উল্লেখ্য

(i) প্রায় নিঃশব্দে এবং প্রয়োজন হলে অতি ধীর গতিতে চলতে পারে;

(ii) ফ্রান্স, পাকিস্তান এবং স্পেনের নৌবহরে এই প্রকার সাবমেরিন সংযোজিত হয়েছে।

কিলো (Kilo) শ্রেণী

কোন দেশে প্রথম তৈরী হয়ঃ রাশিয়া

প্রকৃতি : আক্রমণাত্মক—এক আঘাতে খতম করার সম্ভাব্য যোগ্যতাসম্পন্ন।

দৈর্ঘ্য : 70 মি. বা 229·6 ফুট

বীম : 9 মি. বা 29·5 ফুট

ড্রাফ্‌ট : 7 মি. বা 23 ফুট

প্রচালন : ডিজেল—বৈদ্যুতিক

কতটা জল স্থানচ্যুত করতে পারে

(i) ভাসমান আবস্থায় : 2,500 টন

(ii) নিমজ্জিত অবস্থায় : 3,200 টন

গতি : সমুদ্রের গভীরে 16 নট্‌

হাতিয়ার : 533 মি.মি. (21·0 ইঞ্চি ব্যাস সমন্বিত আটটি টর্পেডো-টিউব

উল্লেখ্য

(i) খুব অগভীর জলেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে ;

(ii) কাজ করার সময় শব্দ বা জলে আলোড়ন প্রায় হয় না বললেই চলে ;

(iii) রাশিয়া খুব সম্ভবতঃ প্রশান্ত মহাসাগর, পীত সাগর এবং ওখোট্‌স্‌ক্‌ (Okhotsk) সাগরে প্রতিরক্ষার কাজের জন্য এই জাতীয় সাবমেরিন ব্যবহার করবে। এই শ্রেণীর সাবমেরিন সাম্প্রতিক কালে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করছে।

নাকেন (Näcken) শ্রেণী

কোন দেশে প্রথম তৈরী হয় : সুইডেন

প্রকৃতি : আক্রমণাত্মক

দৈর্ঘ্য : 40·5 মিটার বা 162·4 ফুট

বীম : 5·7 মিটার বা 18·7 ফুট

ড্রাফ্‌ট্‌ : 55 মিটার বা 18·0 ফুট

প্রচালন :

(i) 2,000 বি. এইচপি. ক্ষমতাযুক্ত ডিজেল এঞ্জিন একটি, (ii) বৈদ্যুতিক এঞ্জিন একটি, (iii) স্তম্ভদণ্ড একটি

কতটা জল স্থানচ্যুত করতে পারে

(i) ভাসমান অবস্থায় : 1,030 টন

(ii) নিমজ্জিত অবস্থায় : 1,125 টন

গতি

(i) ভাসমান অবস্থায় : 12 নট্,

(ii) সমুদ্রের গভীরে : 20 নট্

হাতিয়ার : 533 মি.মি. (21 ইঞ্চি) ব্যাস সমন্বিত টর্পে'ডো টিউব ছয়টি, এবং 406 মি.মি. (16 ইঞ্চি) ব্যাস সমন্বিত টর্পে'ডো টিউব তুইটি

উল্লেখ্য

(i) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 300 মিটার (984 ফুট) গভীরেও এই সাবমেরিন কাজ করতে পারে।

(ii) এই শ্রেণীর সাবমেরিন আকারে ছোট এবং প্রয়োজন হলে অল্প সময়ের জন্য 18 জন লোক দিয়েই এই জাহাজের সব রকম কাজ করানো যায়, যদিও সাধারণত 23 জন নাবিক কাজ করে।

ট্যাঙ্গো (Tango) শ্রেণী

কোন দেশে প্রথম তৈরী হয় : রাশিয়া

প্রকৃতি : আক্রমণাত্মক

দৈর্ঘ্য : 92 মিটার বা 301·8 ফুট

বীম : 9 মিটার বা 29·5 ফুট

ড্রাফ্‌ট্ : 7 মিটার বা 23 ফুট

প্রচালন

(i) 6,000 বি. এইচপি. সমন্বিত তিনটি ডিজেল এঞ্জিন, (ii) 6,000 আশ্বক্ষমতা সমন্বিত একটি বৈদ্যুতিক এঞ্জিন, (iii) স্তম্ভদণ্ড তিনটি

কতটা জল স্থানচ্যুত করতে পারে

(i) ভাসমান অবস্থার : 3000 টন

(ii) নিমজ্জিত অবস্থায় : 3,700 টন

হাতিয়ার : 533 মি.মি. (21 ইঞ্চি) ব্যস সমন্বিত আটাটি টর্পে'ডো টিউব

উল্লেখ্য

(i) অগভীর জলেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে।

(ii) অ-পারমাণবিক (nonnuclear) সাবমেরিন শ্রেণীগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ দীর্ঘতম।

টাইপ 209 (Type 209) শ্রেণী

কোন দেশে প্রথম তৈরী হয় : ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্মানী
প্রকৃতি : আক্রমণাত্মক
দৈর্ঘ্য : 54·4 মিটার বা 178·4 ফুট
বীম : 6·2 মিটার বা 20·3 ফুট
ড্রাফ্‌ট্ : 5·5 মিটার বা 17·9 ফুট
গতি : (i) ভাসমান অবস্থায় 10 নট্
(ii) জলের গভীরে 17 নট্

প্রচালন

(i) 7040 কিলো ওয়াট (KW) ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি ডিজেল এঞ্জিন, (ii) 3,070 কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বৈদ্যুতিক এঞ্জিন, এবং (iii) একটি স্তম্ভদণ্ড

কতটা জল স্থানচ্যুত করতে পারে

(i) ভাসমান অবস্থায় : 1,100 টন
(ii) নিমজ্জিত অবস্থায় : 1,210 টন

হাতিয়ার : 533 মি.মি, (21 ইঞ্চি) ব্যাসসমন্বিত আটটি টর্পে'ডো-টিউব

উল্লেখ্য

(i) তুরস্ক, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডার, গ্রীস, পেরু, চিলি, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ার নৌবহরে এই জাতীয় সাবমেরিন ব্যবহৃত হচ্ছে। তুরস্কতে এই শ্রেণীর সাবমেরিন তৈরীও হচ্ছে ; ভারতেও তৈরি করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

(ii) জলের গভীরেও বেশী দ্রুতগতিতে চলাফেরা করতে পারে।

(iii) একনাগাড়ে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত প্রহরার কাজ করতে পারে।

য়ুশিও (Yuushio) শ্রেণী

কোন দেশে প্রথম তৈরী হয় : জাপান

প্রকৃতি : আক্রমণাত্মক

দৈর্ঘ্য : 76 মিটার বা 249·3 ফুট

বীম : 9·9 মিটার বা 32·5 ফুট

ড্রাফ্‌ট্ : 7·5 মিটার বা 24·6 ফুট

প্রচালন

(i) 4,200 বি. এইচপি. ক্ষমতাযুক্ত দুটো ডিজেল এঞ্জিন, (ii) 7,200 আশ্বক্ষমতাসম্পন্ন একটি বৈদ্যুতিক এঞ্জিন, এবং (iii) একটি স্তম্ভদণ্ড

কতটা জল স্থানচ্যুত করতে পারে

(i) ভাসমান অবস্থায় : 2,200 টন, এবং সমুদ্রের 577 ফুট গভীরে 2500 টন

গতি

(i) ভাসমান অবস্থায় 12 নট্

(ii) জলের গভীরে 20 নট্

হাতিয়ার : 533 মি.মি. (21 ইঞ্চি) ব্যাসসমন্বিত ছয়টি টর্পে'ডো টিউব এবং একাধিক সাব-হার্পুন (Sub-Harpoon) মিসাইল

উল্লেখ্য

(i) এই শ্রেণীর সাবমেরিন 1,000 মিটার অর্থাৎ 3,280 ফুট জলের গভীরে গিয়েও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে।

(ii) শুধুমাত্র লাগাতার দীর্ঘসময় সমুদ্রের গভীরে অবস্থান করার ক্ষমতা ছাড়া নিউক্লীয়ার সাবমেরিনের প্রায় সমস্ত গুণই এই শ্রেণীর সাবমেরিনে আছে।

(iii) এই শ্রেণীর ডুবোজাহাজ দীর্ঘকাল জলের গভীরে কাজ করতে পারে—অন্যান্য শ্রেণীর ডুবোজাহাজের মত এগুলোকে প্রায়ই সমুদ্রপৃষ্ঠে ভেসে উঠতে হয় না।

অনুশীলনী

1. একটি মানচিত্রের প্রান্তদেশে কী কী সংবাদ সাধারণত দেওয়া থাকে ? একটি নক্সা এঁকে প্রতিটি সংবাদের স্থান নির্দেশ কর।
2. সাধারণ মানচিত্রের সঙ্গে সামরিক মানচিত্রের কি কোন পার্থক্য থাকে ? থাকলে সেগুলোর সচিত্র বর্ণনা কর।
3. স্কেল ও স্কেললাইনের পার্থক্য কি ?
4. সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলতে কি বোঝ ? সাঙ্কেতিক চিহ্নের বৈশিষ্ট্য কি ? নীচে লেখা বিষয়গুলোর সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁক :
   (ক) কলাগাছ, (খ) ঘাস, (গ) ইদগাহ্, (ঘ) মন্দির, (ঙ) স্রোতবতীনদী, (চ) দেয়ালঘেরা গ্রাম, (ছ) রেলষ্টেশন, (জ) লেভেল ক্রশিং, (ঝ) যুদ্ধক্ষেত্র, (ঞ) দুর্গ।
5. স্কেল প্রকাশের কয়টি পদ্ধতি আছে ? পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
6. একটি মানচিত্রের স্কেলের প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ হচ্ছে 1/50,000 ;—এই মানচিত্রের এক ইঞ্চি দূরত্ব ভূমির কত মাইল দূরত্ব সূচিত করে ?
7. কোন স্কেলের বিবরণীতে যদি লেখা থাকে "4 ইঞ্চি মানে 1 মাইল", তাহলে তার প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ কত হবে ?
8. একটি মানচিত্রের আর. এফ. (RF) হচ্ছে 1/10,000। ঐ মানচিত্রটির 'রৈখিক স্কেল' তৈরি কর।
9. একটি মানচিত্রের স্কেল হচ্ছে 1/100,000—মানচিত্রটির জন্য এমন একটি রৈখিক স্কেল তৈরি কর যার সাহায্যে 200 গজ পর্যন্ত মাপা যেতে পারে।
10. একটি মানচিত্রের স্কেল 1/100,000। এই মানচিত্রটি একটি সৈন্যবাহিনীকে দেওয়া হল ; ঐ সৈন্যবাহিনীটি ঘণ্টায় তিন মাইল যেতে পারে। এই সৈন্যবাহিনীটির জন্য একটি 'সময়ের স্কেল' তৈরি কর।
11. একটি চৌম্বক কম্পাসের যে-কোন দশটি অংশের নাম লিখ।
12. কম্পাস কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় ?
13. কম্পাসের কাঁটা সব সময়ই উত্তর দিকে মুখ করে থাকে কেন ?

14. বেয়ারিং বলতে কি বোঝায় ?
15. 'চৌম্বক তারতম্য' কথাটার অর্থ কি ?
16. একটি গ্রামের চৌম্বক উত্তর 1970 খ্রীষ্টাব্দে যথার্থ উত্তর থেকে 3° ডিগ্রী পূর্বে ছিল। এই চৌম্বক তারতম্য প্রতি বছরে 5 মিনিট করে কমে। ঐ গ্রামে 1980 খ্রীষ্টাব্দে ঐ চৌম্বক তারতম্য কত ছিল ?
17. একটি গ্রামের যথার্থ উত্তর থেকে 5° ডিগ্রী পশ্চিমে গ্রিড্ উত্তর অবস্থিত। ঐ গ্রামের চৌম্বক তারতম্য 4°35′ মিনিট পূর্ব। সেই গ্রামটি থেকে একটি লক্ষ্যবস্তুর চৌম্বক বেয়ারিং 230° ডিগ্রী—তাহলে ঐ গ্রামটি থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুটির গ্রিড্ বেয়ারিং এবং যথার্থ বেয়ারিং কত হবে ?
18. 1980 খ্রীষ্টাব্দে একটি জায়গার যথার্থ উত্তর থেকে 1°4′′ মিনিট পূর্বে ছিল ঐ জায়গার গ্রিড্ উত্তর, আর চৌম্বক উত্তরটি ছিল গ্রিড্ উত্তর থেকে 3°20′ মিনিট পশ্চিমে। ঐ জায়গাটিতে চৌম্বক তারতম্য প্রতিবছরে 2′ মিনিট করে কমে। যদি 1985 খ্রীষ্টাব্দে ঐখান থেকে একটি গির্জার গ্রিড বেয়ারিং 190° হয়ে থাকে, তবে ঐ সময় গির্জাটির চৌম্বক বেয়ারিং এবং যথার্থ বেয়ারিং কত ছিল, এবং 1990 খ্রীষ্টাব্দে ঐ বেয়ারিং দুটো কত হবে ?
19. ভূমির বন্ধুরতা বলতে কি বোঝ ? মানচিত্রে ঐ বন্ধুরতা কী কী ভাবে প্রকাশ করা যায় ? সামরিক মানচিত্রে সাধারণত কিভাবে বন্ধুরতা প্রকাশিত হয় ?
20. সমোন্নতি রেখা বলতে কি বোঝায় ? সমোন্নতি রেখা ব্যবহার করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে প্রকাশ কর।
গিরিসঙ্কট, ক্লিফ্, অবতল ঢাল, পল্যায়ন, নোল, গিরিপথ, রি-এন্ট্র্যান্ট।
21. পারস্পরিক দৃশ্যমানতা বলতে কি বোঝ ? একটি গিরিচূড়ার উচ্চতা 4730 ফুট। ঐ পাহাড়টি থেকে 5000 গজ পূর্বে আরেকটি পাহাড় আছে—এই দ্বিতীয় পাহাড়টির উচ্চতা 3250 ফুট। প্রথম পাহাড়টি থেকে 1000 গজ পূর্বে আরও একটি পাহাড় আছে—এই তৃতীয় পাহাড়টির উচ্চতা 3000 ফুট। প্রথম এবং দ্বিতীয়

পাহাড়ের চূড়াদুটো কি পরস্পর দৃশ্যমান ?

22. কি কি পদ্ধতিতে পারস্পরিক দৃশ্যমানতা নির্ণয় করা যায় ? পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

23. আবহচিত্র কাকে বলে ? আবহচিত্র কিভাবে তৈরি করা হয় ? আবহচিত্রের প্রয়োজনীয়তা কি ?

24. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে উভয়পক্ষের তৈরী ব্যূহ একটি স্যাণ্ড মডেলে দেখাও, এবং তার ছবি আঁক।

25. একটি ·303 রাইফেলের যান্ত্রিক কাজের ধারাবাহিক পদ্ধতি নক্সার সাহায্যে বুঝাও।

26. একটি লাইট মেশিন গানের যন্ত্রাংশগুলোর পিছনে চলার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

27. একটি নক্সা এঁকে নং 36 এইচ. ই. গ্রেনেডের দেহের বিভিন্ন অংশ দেখাও এবং তাদের কাজের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

28. একটি ছবি এঁকে বিজয়ন্ত ট্যাংকের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দেখাও।

29. একটি ছবির সাহায্যে জেট্ পরিচালনের নীতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

30. সাবমেরিন কিভাবে জলের গভীরে প্রবেশ করে ? ঐ কাজে বাতাস এবং জলের ভাল্‌ভ্‌গুলোর কি ভূমিকা তা ছবির সাহায্যে বোঝাও।

31. একটি ছবি এঁকে টর্পেডোর মূল যন্ত্রাংশগুলো দেখাও, এবং তাদের কাজ সম্বন্ধে যা জান লিখ।

32. পেরিস্কোপের কার্যপদ্ধতি একটি ছবির সাহায্যে বোঝাও।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

[নির্বাচিত বইয়ের তালিকা]

1. Bonds, Ray : *The Illustrated Directory of Modern Weapons.*
2. Chatterjee, B. B. : *A Complete Text Book for NCC Cadets.*
3. Chatterjee, K. S. : *Handbook of Military Science*
4. Esson, C. C. and G. S. Phillip : *Map Reading made easy.*
5. Foss, C. F. : *Encyclopedia of Tanks and Fighting Vehicles*
6. Gunston, Bill : *Jane's All the World's Aircrafts*
7. Gupta, J. K. S. : *Learn to Fly*
8. Hawks, Capt. E. : *Britain's Fighting Forces*
9. Her Majesty's Stationary Office, London : *Manual of Map Reading, Photo Reading, and Field Sketching*
10. Hinks, A. R. : *Maps and Survey*
11. Jordan, John : *Balance of Military Power*
12. Joshi, A. B. : *Anmol Map Reading*
13. Lal, Shiam and P. K. Mukherjee : *Text Book of Military Science*, Vols. I & II
14. Lobeck, A. K. and W. J. Tellington : *Military Maps and Air Photographs*
15. Mann, J. C. : *Map Reading and Field sketching*
16. Miller, David : *Modern Submarines*
17. Sarma, P. S. : *Pocket Book of Map Reading*
18. Sarma, P. S. : *Introductory Military Science*
19. Singh, Gopal : *An Introduction to Map Reading*
20. Singh, Lt. Col. G. : *A Practical Guide to Weapon Training and Good Shooting*

21. Smith, W. H. B. : *Small Arms of the World*
22. Thornton, Lt. Col. G. E. : *A Handbook of Weapon Training*
23. Ward, Lock & Co : *The Wonder Book of the Army*
24. Wintringham : *Weapons and Tactics*
25. প্রিয়দর্শন সেনশর্মা : প্রাথমিক যুদ্ধবিদ্যা

পরিভাষা

প্রতিরক্ষা বিদ্যা বিষয়টি নিয়ে বাংলা ভাষায় বিশেষ আলোচনা হয় না, প্রবন্ধ-গ্রন্থাদিও রচিত হয়না, যদিও বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ইংরাজি বা হিন্দী ভাষাগুলোতে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাদের বাংলা পরিভাষাও তৈরী হয়ে উঠেনি। কাজেই বর্তমান গ্রন্থটি লেখার সময় মাঝে মাঝেই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। অবশ্য 'প্রতিরক্ষা বিদ্যা—প্রথম পত্র' এবং 'প্রতিরক্ষা বিদ্যা —দ্বিতীয় পত্র' গ্রন্থ দুটোতে যে-সব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, এই গ্রন্থটিতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সে-গুলো কাজে লাগানো হয়েছে। তৎসত্ত্বেও অনেক শব্দেরই পরিভাষা নূতন করে তৈরি করতে হয়েছে—কেন না ঐ শব্দগুলো পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটোতে ব্যবহৃত হয়নি। পরিভাষা তৈরি করার সময় অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষাগুলো যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয়েছে। আবার যে-সব ইংরাজি শব্দ আমাদের দেশেও বহুল প্রচলিত সে-গুলোর বাংলা পরিভাষা করা হয়নি, সেগুলো বাংলা হরফে লেখা হয়েছে।

এই গ্রন্থটিতে যে-সব শব্দের পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাদের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল ; প্রসঙ্গত নিবেদন করা হচ্ছে যে এই শব্দগুলোর উন্নততর বাংলা পরিভাষা যদি কোন সুধী পাঠক জানান তাহলে সেগুলো যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে বিবেচিত হবে, এবং পরবর্তী সংস্করণে ব্যবহৃত হবে।

Adiabatic : তাপরুদ্ধ

After-burning : পশ্চাৎ-প্রজ্বলন

Ammunition stowage : গোলাগুলী রাখার জায়গা

Axis : অক্ষধুরা বা অক্ষরেখা

Backward বা **Back Bearing :** পশ্চাৎ বেয়ারিং

Base line : ভিত্তিরেখা বা ভূমিরেখা

Basin : অববাহিকা বা পর্যঙ্ক

Brow : ভ্রূ

Buoyancy Compartment : প্লবতা কক্ষ

Cartridge : কার্তুজ

Causeway : উঁচু বাঁধানো রাস্তা
Cliff : ভৃগু বা খাড়া পাহাড়
Clockwise : দক্ষিণাবর্ত
Col : পল্যয়ণ
Comparative scale : তুলনামূলক স্কেল
Compression Ratio : সংনমন অনুপাত
Concave : অবতল
Cone : শঙ্কু
Constant : ধ্রুব
Contour : সমোন্নতি রেখা
Conventional sign : সাঙ্কেতিক চিহ্ন
Convex : উত্তল
Crest : চূড়া বা তরঙ্গ কিরীট
Dead ground : অপজমি
Defile : গিরিসংকট
Diagonal scale : কর্ণমাপনী বা তির্যক স্কেল
Driving mechanism : প্রচালন যন্ত্র
Dune : বালিয়াড়ি
Escarpment : প্রবণভূমি বা উপলম্ব
Feature : বস্তু বা বিষয়
Force : বল
Forward Bearing : সম্মুখ বেয়ারিং
Frame work : কাঠাম
Glacier : হিমবাহ
Gorge : গিরিখাত
Gradient : নতিমাত্রা
Graduations : সমান্তর বা সমান্তরাল রেখা
Graduated : অংশাঙ্কিত
Graphic scale : রৈখিক স্কেল
Grid : ঝাঝরি রেখা বা জালিরেখা

Hachures : ভ্রূলেখ

Horizontal : অনুভূমিক বা আনুভূমিক

Horizontal Equivalent : আনুভূমিক সমতুল্যাঙ্ক

Horse power : অশ্ব বা আশ্বশক্তি

Identification : সনাক্তকরণ

Inclination : নতি

Index to Sheets : পৃষ্ঠার সূচক

Informative : সংবাদ সম্বন্ধীয়

Internal combustion : অন্তঃদহন

Intersection : ছেদবিন্দু

Intervisibility : পারস্পরিক দৃশ্যমানতা

Knoll : ঢিবি বা টিলা

Layer tints : স্তরজ্ঞাপক বর্ণালী

Magnetic variation : চৌম্বক পরিবর্তন

Magnetized : চৌম্বকায়িত

Manoeuverability : গতিতৎপরতা

Marginal information : প্রান্তিয় তথ্য

Mobility : গতিস্বাচ্ছন্দ্য

Model : প্রতিরূপ

Numerical digit : অঙ্কবিষয়ক সংখ্যাক্ষর

Observation Post : পর্যবেক্ষণ বিন্দু

Pass : গিরিপথ

Plateau : মালভূমি

Propellar : প্রচালিকা

Re-entrant : পুনঃপ্রবিষ্ট

Relief Feature : বন্ধুরতাসূচক বা বন্ধুর গঠন

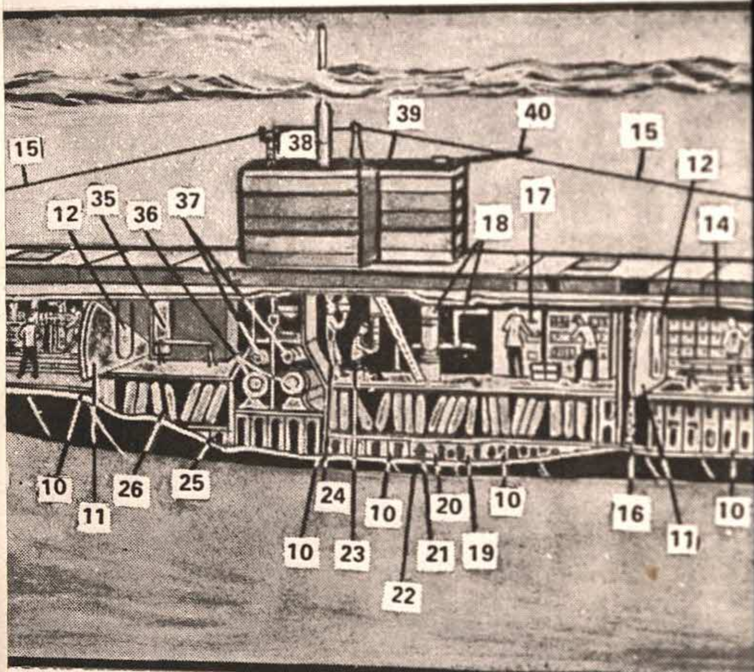
Relief Map : উচ্চাবচ মানচিত্র

Representative fraction : প্রতিনিধিত্বমূলক ভগ্নাংশ

Resistance : প্রতিঘাত

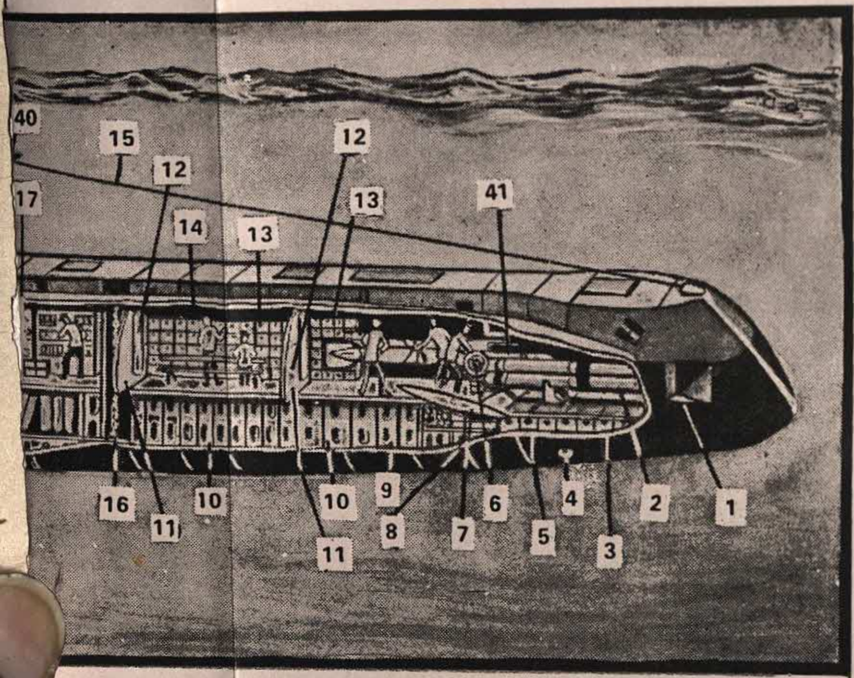
Resultant : লব্ধি

Ridge : শৈলশিরা
Saddle : পল্যয়ণ
Salient : শৈলবাহু
Scale : স্কেল
Scale line : স্কেলরেখা
Scale of paces : পদক্ষেপের স্কেল
Scale of time : সময়ের স্কেল
Section : ছেদ
Setting : সন্নিবেশন
Shaft : স্তম্ভদণ্ড
Sheet Number : পৃষ্ঠা নম্বর
Sheet reference : পৃষ্ঠা উল্লেখ
Sketching : নক্সা আঁকা
Slide valve : ঠেলা ঢাকনি
Slope : ঢাল
Spot height : উচ্চতাসূচক চিহ্ন
Spur : শৈলবাহু
Standard : প্রমাণ
Starting Point : যাত্রাস্থল
Strategy : রণকৌশল
Tactical : কৌশল সম্বন্ধীয়
Terrain : জমি
Terrestrial disturbance : স্থানীয় উপদ্রব
Thermal Expansion : তাপীয় প্রসারণ
Thrust : ধাক্কা
Torsion-bar : কুঞ্চিত হুড়কা
Underfeature : অপ্রধান গঠন
Undulated ground : তরঙ্গিত ভূমি
Velocity : বেগ
Vertical Interval : উল্লম্ব অবকাশ
Viscosity : সান্দ্রতা
Water course : জলের গতিপথ
Water shed : জল বিভাজিকা

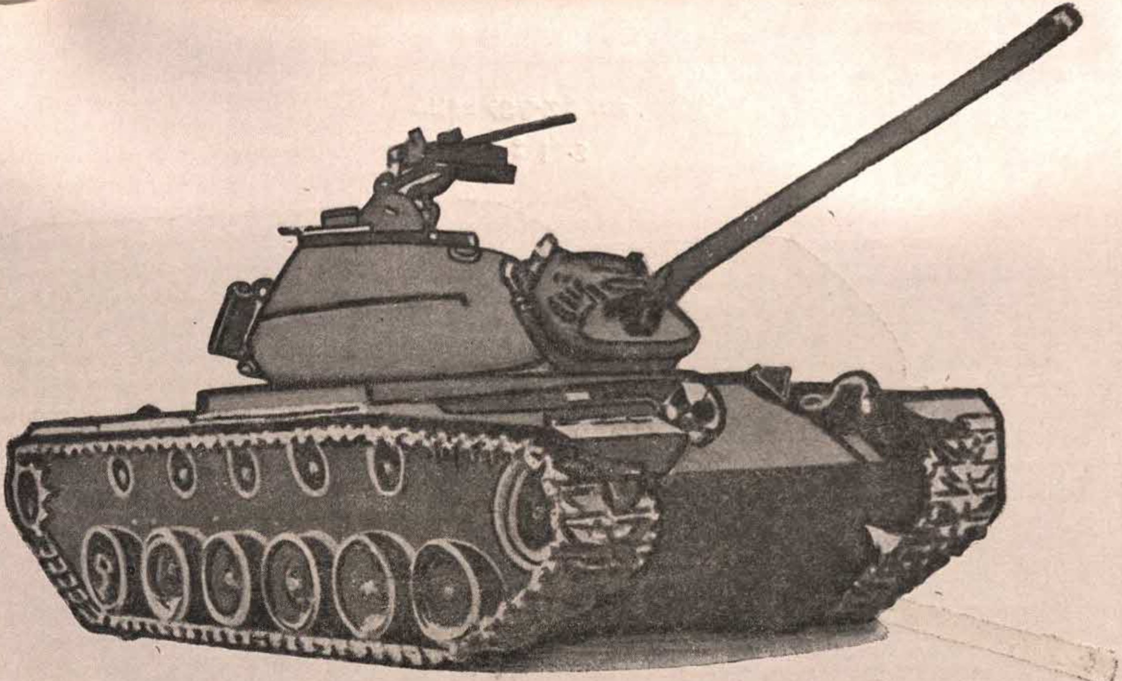


চিত্র ঃ 15·5

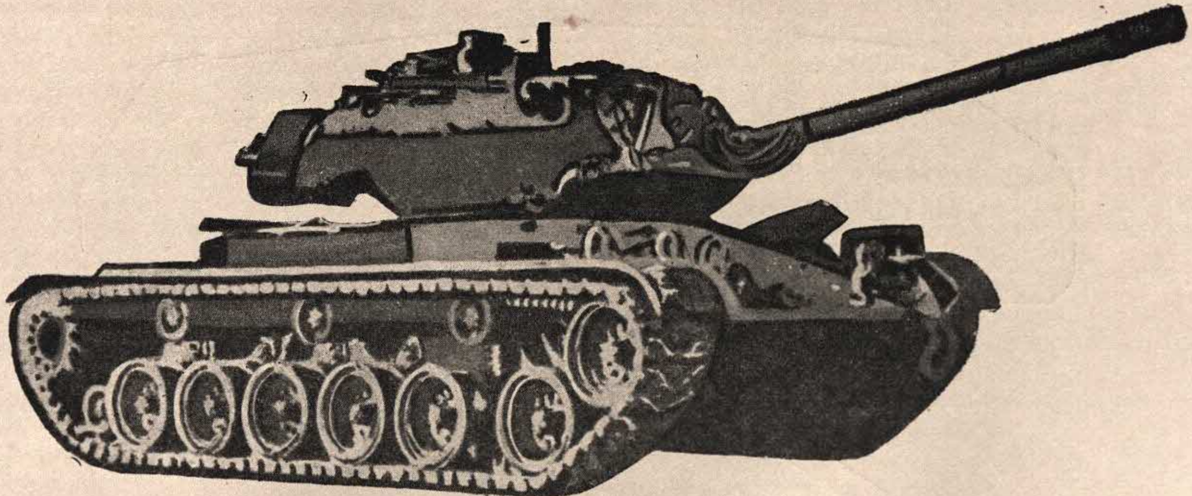
—ষ্টারবোর্ড (টর্পেডো টিউবের দরজা), 2—টর্পেডো টিউবসমূহ, 3—স
7—হাইড্রোপ্লেন, 8—টর্পেডো টিউব ধোয়ার ট্যাংক, 9—জ্বালানীর ১ন
ারে না, 13—লকার, 14—অফিসারদের মেস, 15—লাফানো তার :
র্ড, 18—হাইড্রোপ্লেনসমূহ নিয়ন্ত্রণের গীয়ার, 19—চাপনিয়ন্ত্রিত বাতা
-অপস্থতযোগ্য কুব্জপৃষ্ঠ, 23—হালের মাঝি, 24—পেরিস্কোপ সহ ক্যা
বস্থায় চলার মোটর, 28—ডুবন্ত অবস্থায় জলের মধ্যে চলার বৈদ্যুতিক মে
র টর্পেডো টিউব, 34—প্রধান মোটরের সুইচবোর্ড, 35—ওয়ারলেসের
38—পেরিস্কোপ, 39—কোনিং টাওয়ার, 40—কামান, 41—ট



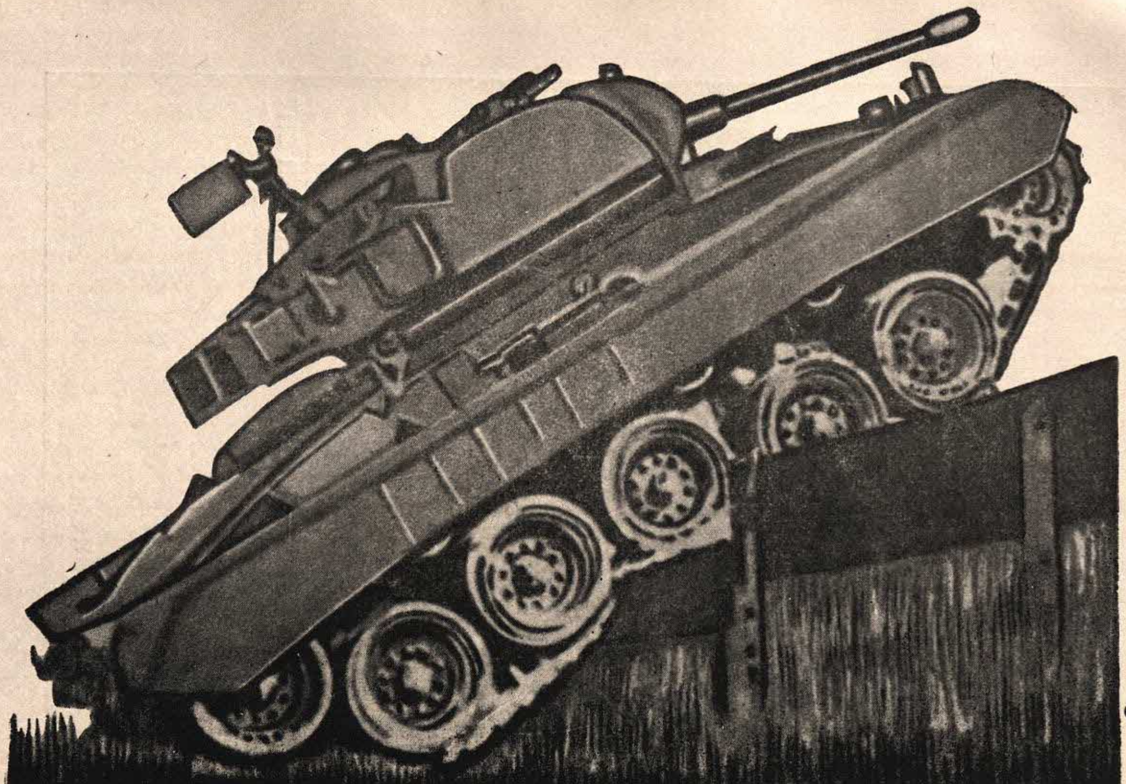
তা টিউবসমূহ, 3—সামনের ট্যাংক, 4—হাইড্রোপ্লেন, 5—কম্‌পেনসেটিং ট্যাংক,
, 9—জ্বালানীর ১নং ট্যাংক, 10—ভিতরের ব্যালাষ্ট ট্যাংক, 11—বাল্কহেড,
—লাফানো তার : এর সাহায্যে মাছ ধরার জাল থেকে সাবমেরিন রক্ষা পায়,
চাপনিয়ন্ত্রিত বাতাসের বোতল, 20—প্লবতা ট্যাংক, 21—ডুবোজাহাজের
পরিস্কোপ সহ ক্যাপ্টেন, 25—জ্বালানীর দ্বিতীয় ট্যাংক, 26—চাপনিয়ন্ত্রিত
চলার বৈদ্যুতিক মোটর, 29—প্রচালিকা স্তম্ভদণ্ড, 30—পেছনের হাইড্রোপ্লেন,
5—ওয়ারলেসের অফিস, 36—টর্পেডো টিউব, 37—সাজিয়ে রাখা টর্পেডো,
—কামান, 41—টর্পেডো



চিত্র ঃ 15·2
প্যাটন M 47 ট্যাংক

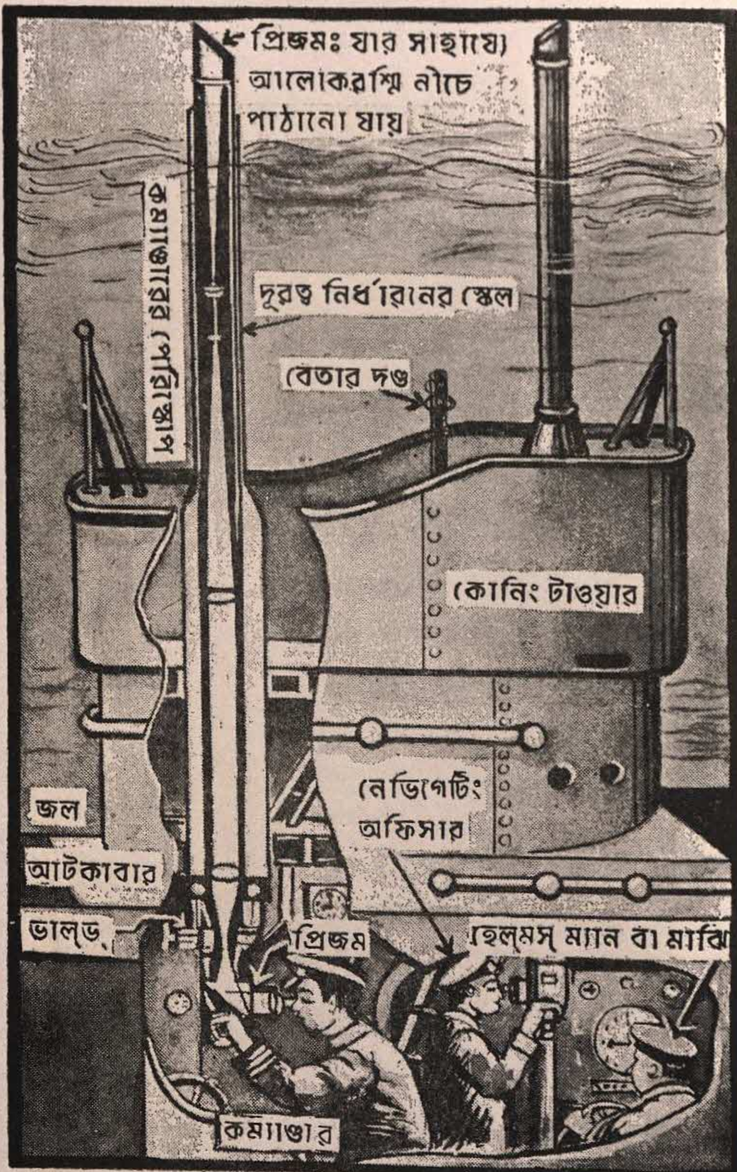


চিত্র ঃ 15·3
প্যাটন 48A-2 ট্যাংক



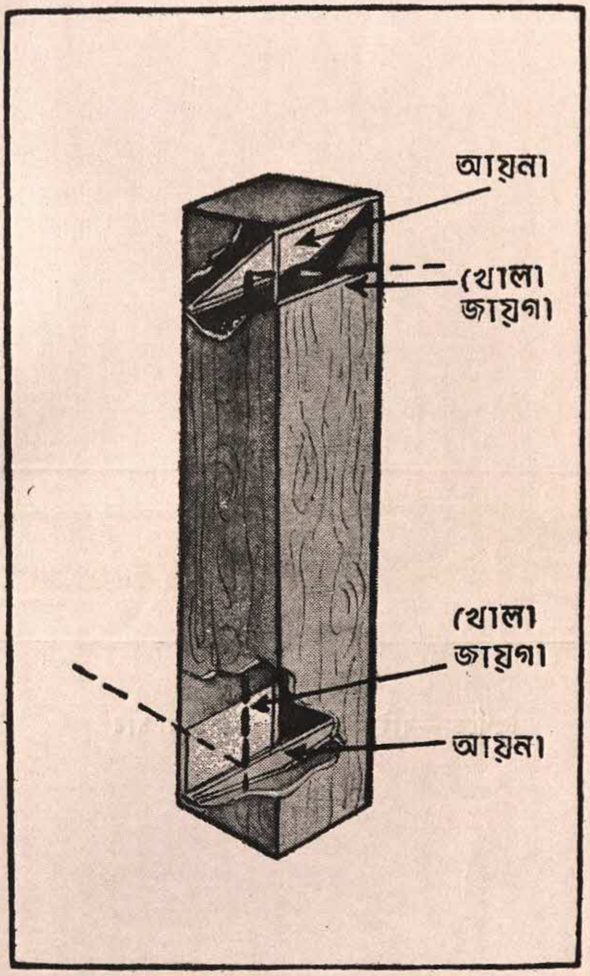
চিত্র : 15·4

ভারী ট্যাংক



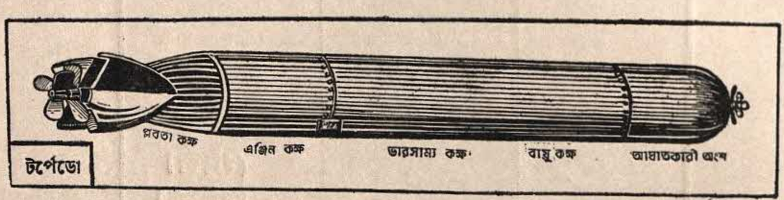
চিত্র : 15·6

ডুবোজাহাজের পেরিস্কোপ : জলে ডুবে থাকা অবস্থায় পেরিস্কোপের সাহায্যেই জলের উপরের দৃশ্য ডুবোজাহাজের কম্যাণ্ডার দেখতে পান



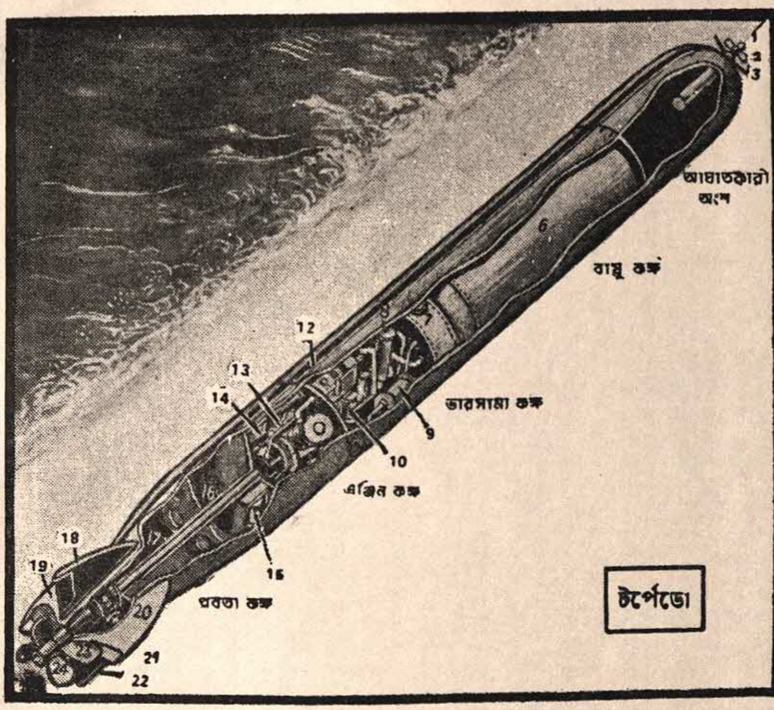
চিত্র ঃ 15·7

পেরিস্কোপেরকার্যপদ্ধতি ঃ পেরিস্কোপ সাধারণতঃ কাজ করে তেরছা-ভাবে রাখা দুটো আয়নার সাহায্যে—উপরের আয়নাটিতে দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, নীচের আয়নায় সেটিই আবার প্রতিবিম্বিত হয়



চিত্র ঃ 15·8

টর্পেডো—বাইরের থেকে যেমন দেখা যায়



চিত্র : 15·9

টর্পেডোর প্রধান অংশসমূহ : 1—ফায়ারিং পিন, 2—সেফ্‌টি স্ক্রু, 3—দ্রুত ঝাড়ুদার, 4—ডিটোনেটার, 5—উচ্চ বিস্ফোরক, 6—চাপ-নিয়ন্ত্রিত বায়ুকক্ষ, 7—জলের কক্ষ, 8—হাইড্রোষ্ট্যাটিক গভীরতা নিয়ন্ত্রণের গীয়ার, 9—আনুভূমিক হালের ষ্টিয়ারিং, 10—প্যারাফিনের বোতল, 11—ভাল্‌ভ্‌, 12—ট্রিগার চালক, 13—গরম বাতাস চালিত এঞ্জিন, 14—সার্ভো মোটর, 15—জাইরোস্কোপিক হাল নিয়ন্ত্রক, 16—প্রচালিকা স্তম্ভদণ্ড, 17—সুড়ঙ্গপথ, 18—উপরের লম্বপাখ্‌না এবং হাল, 19—আনুভূমিক পাখ্‌না এবং হাল, 20—বিপরীতমুখী প্রচালিকা চালাবার গীয়ারের বাক্স, 21—ষ্টারবোর্ড আনুভূমিক পাখ্‌না এবং হাল, 22—নীচের লম্ব পাখ্‌না এবং হাল, 23—সম্মুখ প্রচালিকা, 24—পশ্চাৎ প্রচালিকা ; সাধারণ একটি টর্পেডোতে প্রায় ছয় হাজার অংশ থাকে

গ্রন্থটি কলিকাতা এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ব্যবহারিক প্রতিরক্ষাবিদ্যা পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে রচিত। বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি প্রথম বলে ধরা যেতে পারে। গ্রন্থটি স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং অস্ত্রবাহক সম্পর্কে সচিত্র এবং সহজ আলোচনার মাধ্যমে যেমন আয়ুধ বিজ্ঞানের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করাবে, তেমনি সাহায্য করবে মানচিত্র পাঠ, মানচিত্র তৈরী এবং মানচিত্র পরিবর্ধন করার পদ্ধতিগুলো বুঝতে। আবার বিগত দিনে ঘটে যাওয়া যুদ্ধের বিচার-বিশ্লেষণ কীভাবে করতে হয় তাও চিত্র সহযোগে আলোচিত হয়েছে। সহজ সুখপাঠ্য বাংলা ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটিতে প্রতিটি বিষয়ই প্রয়োজনীয় অথচ সরল রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কাজেই গ্রন্থটি কেবলমাত্র প্রতিরক্ষাবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষাবিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু সকলের চাহিদা এবং কৌতূহল মেটাবে।

অধ্যাপক সেনশর্মা সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। প্রতিরক্ষা, সমর শিক্ষার্থী বাহিনীতে দীর্ঘদিন গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন। ইংরাজী এবং বাংলাভাষায় প্রতিরক্ষাবিদ্যা বিষয়ের উপর কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৮০ সালে উদয়পুরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এ্যাকাডেমী অব সোস্যাল সায়েন্স এর পঞ্চম জাতীয় কংগ্রেসে প্রতিরক্ষাবিদ্যা বিভাগে সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিরক্ষাবিদ্যা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত।

ত্রিশ টাকা